মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

পল্লী-পুনর্গঠন

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত



গান্ধী স্মারক নিধি
বাংলা

নবজীবন ট্রাস্টের অনুমতিক্রমে প্রকাশিত

প্রকাশক : শ্রীশক্তিরঞ্জন বসু,
সম্পাদক, গান্ধী স্মারক নিধি (বাংলা),
১৪ রিভারসাইড রোড,
ব্যারাকপুর (২৪-পরগনা)

কলিকাতা-কেন্দ্র :
১২ডি শঙ্কর ঘোষ লেন,
কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৬১

দ্বিতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৬২

মুদ্রক : শ্রীপরেশচন্দ্র বসু
ব্রাহ্মমিশন প্রেস,
২১১।১ বিধান সরণী,
কলিকাতা-৬

প্রকাশকের নিবেদন

গান্ধীজীর 'Rebuilding Our Villages' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ 'পল্লী-পুনর্গঠন' প্রকাশিত হল। বইটিতে মহাত্মাজী গ্রাম-সংগঠনের বিভিন্ন দিক নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা এবং গ্রামগঠনের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তির দায়িত্ব ও কর্তব্য কী হওয়া উচিত তা নির্দেশ করেছেন। গান্ধীজীর এই সমস্ত রচনা প্রধানতঃ 'Young India' ও 'হরিজন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তারপর অনেক কাল গত হয়েছে। তা সত্ত্বেও এই রচনাগুলির মূল্য কিছুমাত্র কমে নি। তার কারণ, যে-সময়ে গ্রামকর্মীদের লক্ষ্য করে গান্ধীজী এ সব কথা বলেছিলেন তার পরে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় স্থিতির পরিবর্তন হয়েছে সত্য কথা, কিন্তু গ্রামের অবস্থার খুব বেশী একটা ইতর-বিশেষ হয়েছে বলে মনে হয় না। ভারতীয় গ্রামীণ জীবনের স্তর পঁচিশ-তিরিশ বছর আগে যেখানে ছিল, মোটামুটিভাবে বলতে গেলে এখনও প্রায় সেখানেই আছে। কাজেকাজেই তদানীন্তন গ্রামকর্মীদের প্রতি গান্ধীজীর উপদেশ-নির্দেশের যৌক্তিকতা আজিও কিছুমাত্র পরিম্লান হয় নি। রচনা-গুলির ছত্রে ছত্রে গান্ধীজীর দূরদর্শিতা ও ভূয়োজ্ঞানের প্রমাণ মিলবে। গান্ধীজীর যে-কোন বিষয়ের যে-কোন রচনা জাতি কর্তৃক সংরক্ষণীয়। তার উপর কোন রচনার প্রকৃতি যদি এমন হয় যে তা সমসাময়িক কালের পক্ষেও বিশেষভাবে প্রযোজ্য তবে তো তা আরও বেশীমাত্রায় প্রচারযোগ্য। গান্ধীজীর পল্লী-সংগঠন সম্পর্কিত রচনাগুলির যুগোপযোগিতা, আমাদের প্রকাশন-তালিকায় এই গ্রন্থটিকে অগ্রপ্রাধান্য দেবার অন্যতম কারণ।

আজ গ্রামজীবনের উন্নতির জন্য অনেক রকম চেষ্টা হচ্ছে। সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন সংস্থা গ্রামগঠনের কর্মে নিযুক্ত আছেন। তাঁদের সকলের লক্ষ্য ও কর্মপদ্ধতি এক না হলেও এ কথা কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না যে, তাবৎ গ্রামোন্নয়ন-প্রয়াসের পশ্চাতে গান্ধীজীর আদর্শবাদের ছায়া বিলম্বিত আছে। গান্ধীজীর গঠনমূলক কর্মের চিন্তাধারা জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে সংস্থা-নিরপেক্ষভাবে গ্রামকর্মী মাত্রের চিত্তকেই প্রভাবিত করছে। এই

পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর ও সকল স্তরের গ্রামকর্মীকে 'পল্লী-পুনর্গঠন' বইটি পড়তে অনুরোধ করি। সর্বোদয় কর্মীরা তো এ বই পড়বেনই—তাঁদের পক্ষে এই গ্রন্থ অপরিহার্য, গ্রামগঠনপ্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত সরকারী ও আধা-সরকারী কর্মীরাও এই বই পড়লে উপকৃত হবেন। এই বই গ্রামকর্মীদের বেদস্বরূপ বললেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা তাই আশা করব, সরকারী অথবা বেসরকারী যে সকল প্রতিষ্ঠান মুখ্যত: গ্রামের কাজে লিপ্ত আছেন তাঁরা এই বইটির প্রচারে বিশেষ সহায়তা করবেন এবং শুধু তাঁদের কর্মীদের কাছেই নয়, সাধারণ গ্রামবাসীর কাছেও বইটি পৌঁছে দেবেন।

গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে অনুবাদকের লিখিত "ভূদান যজ্ঞের ভূমিকা" নামক একটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হল। প্রবন্ধটিকে গ্রন্থের বক্তব্যের পরিপূরক বলা যায়। গ্রাম-স্বরাজের আদর্শে অনুপ্রাণিত ভূদান আন্দোলনের লক্ষ্য ও তাৎপর্য এতে বর্ণিত হয়েছে।

২রা অক্টোবর, ১৯৬১

শ্রীশক্তিরঞ্জন বসু

অনুবাদকের নিবেদন

অনুবাদ করার সময় আমি ডঃ ভারতন কুমারাপ্পা সম্পাদিত এই গ্রন্থের কিঞ্চিৎ পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করেছি। অষ্টম অধ্যায়ে "ভূমি-ব্যবস্থা ও অহিংসার আদর্শ" শীর্ষক লেখমালায় জমিদারী সমস্যা সম্বন্ধে গান্ধীজীর কয়েকটি রচনা বা রচনাংশ ছিল। কিন্তু কুমারাপ্পাজী যখন বইটির সম্পাদন করেন (১৯৫২ সন) তখন এ দেশের গ্রামে জমিদারদের সমস্যা থাকলেও ভারতের সর্বত্রই আজ এ প্রথার উচ্ছেদ হয়ে গেছে। অতএব রচনাগুলির অনুবাদ গ্রন্থে রাখার অর্থ হত বইটির অহেতুক কলেবরবৃদ্ধি। এই কারণে বঙ্গানুবাদের সময় ওগুলি আমি ছেড়ে দিয়েছি। আর বর্তমান ভারতে পল্লী-পুনর্গঠনের দিক থেকে গান্ধীশিষ্য বিনোবাজী প্রবর্তিত ভূদান আন্দোলন এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। সুতরাং ওই বিষয়ে আলোচনা না থাকলে বর্তমান অহিংস পন্থায় পল্লী-পুনর্গঠন সম্পর্কিত যে কোন গ্রন্থ অপূর্ণ থেকে যাবে বিবেচনা করে "ভূদান যজ্ঞের ভূমিকা" নামে আমার লেখা একটি প্রবন্ধ পরিশিষ্ট-গ হিসাবে এতে সন্নিবিষ্ট করেছি। প্রবন্ধটির প্রথম দুটি অধ্যায় ১৩৬৩ সালের ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের অগ্রণীতে প্রকাশিত হয়েছিল এবং তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় ১৩৬৫ সালের আষাঢ় মাসে শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত হয়। শেষ অধ্যায়টি নূতন। গ্রামসেবার কার্যে নিযুক্ত বাঙালী কর্মীদের সাহায্য হবে মনে করে এ বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর যে সব বই আছে তার একটি মোটামুটি তালিকা পরিশিষ্ট-ঘ হিসাবে দেওয়া হল।

শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

এই সংস্করণে "ভূদান যজ্ঞের ভূমিকা" (পরিশিষ্ট-গ) প্রবন্ধটির তথ্য ও পরিসংখ্যান অদ্যতন করে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া পরিশিষ্ট-ঘ টিও নূতন করে রচনা করা হয়েছে। পূর্ব সংস্করণের মত এটিও জনসমাদৃত হলে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বুঝব।

অনুবাদক

সূচীপত্র

পরিশিষ্ট

SOME IMPORTANT NAVAJIVAN PUBLICATIONS

		Rs. P.
Ashram Observances in Action	by M. K. Gandhi	1·00
Hind Swaraj	,, ,,	0·50
Sarvodaya	,, ,,	2·00
Truth is God	,, ,,	1·00
Mohan Mala	,, ,,	1 00
Delhi Diary	,, ,,	3·00
My Religion	,, ,,	2 00
Satyagraha in South Africa	,, ,,	3·00
Selections from Gandhi	, Prof. N. K Bose	2·00
Which Way Lies Hope	,, Richard B. Gregg	2·
All Men are Brothers	Unesco Publication	3·00

গান্ধী স্মারক নিধি (বাংলা)-র প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

আত্মকথা
গান্ধী-রচনা-সংকলন
মোহনমালা
সর্বোদয়
সত্যই ভগবান (২য় সংস্করণ)
নারী ও সামাজিক অবিচার (৩য় সং)
পঞ্চায়েত রাজ
উৎপাদক শ্রম
অছিবাদ
আমার সমাজবাদ
অহিংসার পথে বিশ্বশান্তি
গীতাবোধ (২য় সং)
মহাত্মা গান্ধী (জীবনী)
সর্বোদয় ও শাসনমুক্ত সমাজ
মহাত্মাজীর গঠনকর্ম-পদ্ধতি
গান্ধীজীর অর্থনৈতিক দর্শন
সর্বোদয়ের পথ
কর্মের সন্ধান

ইংরেজী গ্রন্থের সম্পাদকের ভূমিকা

দেশের বিভিন্ন অংশে গ্রামোন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণের কার্যক্রম আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজীর পল্লী-পুনর্গঠন সম্পর্কিত রচনাবলী সংক্ষিপ্ত আয়তনের ভিতর সংকলিত করা আবশ্যক বোধ হয়েছে।

সকলেই জানেন, গান্ধীজী নিজেকে গ্রামবাসী বলে বিবেচনা করতেন। এই জন্য তিনি গ্রামে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন এবং গ্রামবাসীদের প্রয়োজনপূর্তির জন্য কতকগুলি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। গ্রামবাসীদের শারীরিক আর্থিক সামাজিক এবং নৈতিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করে গেছেন। গ্রামে কি করতে হবে এবং কি করা অনুচিত—এ বিষয়ে তাঁর মনে সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও গান্ধীজী আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তি আর গ্রামবাসী জনসাধারণের মধ্যে সাধারণতঃ যে ব্যবধান থাকে, তা দূর করতে সমর্থ হয়েছিলেন। গ্রামবাসীদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদের চোখ দিয়ে তাদের সমস্যা সমূহ দেখার অসামান্য প্রতিভা তিনি অর্জন করেছিলেন।

তাছাড়া, আমাদের দেশের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য অনুসরণ করে তিনি চরিত্র-গঠন ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের প্রতি খুব গুরুত্ব আরোপ করতেন। আজ ভিন্ন পরিবেশের জন্য আমরা একমাত্র ভৌতিক সম্পদকেই বোধ হয় ওইরকম মূল্যবান মনে করছি। গান্ধীজী দেখতে পেয়েছিলেন যে, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ বিবর্জিত নিছক ভৌতিক লক্ষ্যের সাধনার কারণে এই পৃথিবী আত্মধ্বংসের অভিমুখে ছুটে চলেছে।

সুতরাং গ্রাম থেকে বুভুক্ষা ও দারিদ্র্য দূর করার ঐকান্তিক ইচ্ছা তাঁর পল্লী-পুনর্গঠন পরিকল্পনার লক্ষ্য রূপে থাকলেও এর পিছনে এক আধ্যাত্মিক বিচারধারাও সমভাবে ক্রিয়াশীল। অহিংসা, শান্তি, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং দীনতম ব্যক্তিটিরও স্বরাজ বা স্বাবলম্বন ও আত্মপ্রত্যয় এই হচ্ছে পল্লী-পুনর্গঠনের ব্যাপারে তাঁর অধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণের বুনিয়াদ। জগত মুখে এই সব আদর্শের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করলেও ক্রমশঃ যেন এর বিপরীত দিকেই চলেছে। হিংসা, যুদ্ধ, সামাজিক অবিচার, শোষণ ও দুর্বলের কণ্ঠরোধ, রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের নাগপাশ, জনসাধারণের এক বৃহৎ অংশকে স্বাধীনতার স্বাদ না দেওয়া, সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রযন্ত্র এবং স্বৈরতন্ত্রী একনায়কত্ব—এইসব দিকেই আজকের পৃথিবীর ঝোঁক। গান্ধীজী তাঁর অভ্রান্ত স্বচ্ছ দৃষ্টিতে

দেখতে পেয়েছিলেন যে, আমাদের ঘোষিত আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হলে জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনে সেই আদর্শের ভিত্তি স্থাপন করতে হবে। অতএব গান্ধীজীর পল্লী-পুনর্গঠন সম্পর্কিত দৃষ্টিকোণের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, গ্রামের জন্য পরিকল্পনা রচনা কালে তিনি কেবল গ্রামবাসীদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের কথাই ভাবেন নি, এর সঙ্গে সঙ্গে তিনি সকলের জন্য শান্তি, ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতার বুনিয়াদও রচনা করে গেছেন। এই কথাটি মনে না রাখলে আমরা তাঁকে একেবারেই বুঝতে পারব না বা তাঁর পরামর্শের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারব না। উদাহরণ-স্বরূপ খাদির কথা বলা যেতে পারে। সমালোচক যদি খাদিকে কেবল তাঁর ভৌতিক সমৃদ্ধির মানদণ্ডে না মেপে গান্ধীজীর ভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের মিলিত মানদণ্ডে পরিমাপ করেন তা হলে এর বিরুদ্ধে যে সব সমালোচনা হয়, তার অনেকগুলির হাত এড়ানো যেতে পারে।

গান্ধীজী গ্রামে কি করতে চেয়েছিলেন তার অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত রূপরেখা এই ক্ষুদ্র পুস্তকটিতে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা, সমাজ-সংস্কার, নারীকল্যাণ, খাদ্য এবং পশুপালন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা হয় অতি সংক্ষেপে সারা হয়েছে, আর না হয় একেবারে উল্লেখই করা হয় নি। এর কারণ হচ্ছে, নবজীবন ট্রাস্ট এই সব বিষয়ে গান্ধীজীর বিচারধারা সংকলিত করে স্বতন্ত্র পুস্তকের আকারে প্রকাশ করেছেন। (এই-জাতীয় যে সব পুস্তকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছে তার একটি পৃথক্ সূচী পরিশিষ্টে দেওয়া হল। অনুঃ) এই পুস্তকে কেবল পল্লী-পুনর্গঠন সম্পর্কিত প্রধান প্রধান বিষয়গুলির মোটামুটি রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। উৎসাহী পাঠককে এই সব বিষয়ের বিস্তারিত জ্ঞানের জন্য সংশ্লিষ্ট পুস্তকগুলি পাঠ করতে হবে। পক্ষান্তরে গ্রামের সাফাই ও গ্রামসেবককে প্রদত্ত উপদেশাবলী এই গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে দেওয়া হয়েছে। কারণ এ সম্বন্ধে পৃথক্ কোন বই নেই।

রচনাগুলির শিরোনামা অনেক ক্ষেত্রে মূলের সঙ্গে মিলবে না। বর্তমান সংকলনের প্রয়োজনীয়তা ও আলোচ্য বিষয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে এর পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। তবে মাঝে মাঝে সংক্ষিপ্ত করা ছাড়া ও বর্জিত অংশের জায়গায় কোন চিহ্ন দেওয়া থেকে বিরত থাকা ব্যতিরেকে মূল রচনা সমূহের কোনরকম অঙ্গহানি করা হয় নি।

ভারতন কুমারাপ্পা

নিরলস গঠনকর্মী

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ও

শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন সিংহ

শ্রীচরণেষু,

যাঁদের কাছে গ্রামসেবার প্রথম পাঠ পেয়েছিলাম।

১

গ্রামের মূল্য

দেশের গ্রামগুলির সেবা করার অর্থই হচ্ছে স্বরাজ। এ ভিন্ন আর সবই কল্পনা-বিলাস ছাড়া আর কিছু নয়।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২ -১২-১৯২৯

গ্রামগুলির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হলে ভারতবর্ষও নিশ্চিহ্ন হবে। এ দেশ তখন আর ভারত থাকবে না। জগতে এ দেশের যে বিশেষ অবদান রেখে যাবার কথা, তাও তখন শূন্যে বিলীন হয়ে যাবে।

হরিজন, ২৯-৮-১৯৩৬

ভারতের গ্রামসমূহ এ দেশেরই মত প্রাচীন। শহরগুলি বিদেশী আধিপত্যের পরিণাম। প্রাচীন গ্রামময় ভারত এবং নগরকেন্দ্রিক ভারত—এই দুয়ের মধ্যে আমাদের কোন একটিকে বেছে নিতে হবে। আজ শহরেরই কর্তৃত্ব চলেছে এবং শহরের শোষণের ফলে গ্রামগুলি তছনছ হয়ে ধ্বংসের পথে চলেছে। আমার খাদি মনোবৃত্তি আমাকে এই কথা বলে যে, শহরের এই আধিপত্যের অবসান ঘটলে নগরগুলি গ্রামের সেবা করবে। গ্রাম শোষণ করার অপর নাম হচ্ছে সুসংগঠিত হিংসাচার। স্বরাজ অহিংসার আধারে গড়ে উঠুক, এ যদি আমাদের কাম্য হয় তা হলে গ্রামগুলিকে যথোপযুক্ত মর্যাদা দিতে হবে।

হরিজন, ২০-১-১৯৪০

২

পল্লীসংস্কার (সাধারণ)

স্বরাজের আওতায় গ্রামসেবা

গ্রামসেবার জন্য যে সব নর নারী গ্রামে যাবেন তাঁরা গ্রামবাসীদের বলবেন যে, নিজের গ্রামকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা গ্রামবাসীদের কর্তব্য। স্বরাজ-সরকার তাদের জন্য এ কাজ করে দেবে, গ্রামবাসীদের এরকম আশা মনে পোষণ করলে চলবে না। পল্লীর শিল্প নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার ফলে আমাদের গ্রামগুলি ধ্বংসের মুখোমুখী এসে দাঁড়িয়েছে। পল্লীশিল্পের পুনরুজ্জীবনেই কেবল গ্রামের পুনরুত্থান সম্ভব। এই সব শিল্পের ভিতর চরকার স্থান সব-কিছুর কেন্দ্রে। আর সব সহজেই চরকার চতুর্দিকে নিজেদের স্থান করে নেবে। এইভাবে সকলেই শ্রমশিল্পের মর্যাদা বুঝবে এবং সকলেই যদি এইভাবে রাষ্ট্রের হিতার্থে কোন না কোন শিল্পে আত্মনিয়োগ করে তা হলে জনসাধারণ নিজেদের জন্য বহু লক্ষ টাকার সাশ্রয় করতে পারবে। আর এইভাবে প্রমাণ করা চলে যে, আত্মনির্ভরশীলতা এবং স্বাবলম্বনের নীতিকে কার্যকর করলে জনসাধারণ অন্য যে কোন ব্যবস্থার তুলনায় অল্প মাত্রায় কর দিয়েও অধিকতর পরিমাণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী হবে।

অহিংস স্বরাজে কেউ কারও শত্রু নয়। জাতি যাতে নিজ লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে তার জন্য সকলেই নিজ নিজ নির্ধারিত কর্তব্য করে চলে। এ ব্যবস্থায় সকলেই লিখতে পড়তে জানবে এবং প্রত্যহ তাদের জ্ঞান একটু একটু করে বেড়ে চলবে। অসুস্থতা ও রোগ একেবারে কমে যাবে। স্বরাজে পথের ভিখারী বলে কিছু থাকবে না। শ্রমিকরা

সর্বদাই খেটে খাবার সুযোগ পাবে। এই রকম সরকারের আওতায় জুয়া খেলা, মদ্যপান এবং অন্যান্য নৈতিক কদাচার অথবা শ্রেণী-বিদ্বেষের কোন স্থান নেই। ধনীরা সুবুদ্ধিচালিত হয়ে সমাজহিতার্থে তাদের ধনসম্পত্তির বিনিয়োগ করবে নিজেদের ঐহিক ভোগবিলাস বা জাঁকজমকের জন্য তারা টাকা পয়সার অপচয় করবে না। মুষ্টিমেয়-সংখ্যক ধনী ব্যয়বহুল সুসজ্জিত প্রসাদে থাকবে আর অধিকাংশ লোক আলো-হাওয়া-বিহীন ঘুপচি ঘরের মধ্যে কোনমতে মাথা গুঁজে পড়ে থাকবে—স্বরাজের আমলে এমন অবস্থা চলবে না। হিন্দু-মুসলমানের অনৈক্য, অস্পৃশ্যতা, উচ্চ-নীচের ভেদাভেদ—এ সবের স্থান এখানে নেই।

হরিজন, ২৫- ১৯৩৯

গ্রামীণ স্বরাজ

গ্রামীণ স্বরাজ বলতে আমি এক স্বরাট্ সাধারণতন্ত্র বুঝি। জীবন-যাত্রার পক্ষে অত্যাবশ্যক প্রয়োজন পূর্তির ব্যাপারে এই গ্রামীণ সাধারণতন্ত্র তার প্রতিবেশী গ্রামগুলির উপর নির্ভর করবে না; তবে অন্য যে সমস্ত ব্যাপারে পরস্পরাবলম্বন প্রয়োজন তার স্থান এতে থাকবে। অতএব প্রতিটি গ্রামবাসীর কর্তব্য হবে নিজেদের খাদ্যের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য এবং বস্ত্রের জন্য তুলার চাষ করা। গ্রামে পৃথক্ গোচারণভূমি থাকবে এবং বালক ও প্রাপ্তবয়স্ক সকলের উপযোগী মনোরঞ্জনের ও খেলাধূলার জন্য আলাদা জায়গাও থাকবে। এ সবের ব্যবস্থা করার পর জমি উদ্বৃত্ত থাকলে উপকারী অর্থকর শস্যের আবাদ করা যেতে পারে। তবে গাঁজা, তামাক, আফিঙ্ এবং এ-জাতীয় অন্যান্য ক্ষতিকর জিনিসের চাষ করা চলবে না। গ্রাম-বাসীদের নিজস্ব বিদ্যালয়, রঙ্গমঞ্চ ও সর্বসাধারণের ব্যবহারোপযোগী

সাধারণ ভবন থাকবে। গ্রামে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা থাকবে এবং এর ফলে পরিষ্কার জল পাবার ব্যাপারে নিশ্চয়তা মিলবে। পুষ্করিণী এবং ইঁদারা সুরক্ষিত করে এ কার্যে সফলতা লাভ সম্ভব। বুনিয়াদী পাঠ্যক্রমের অন্তিম পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা আবশ্যিক হবে। গ্রামের কার্যকলাপ যথাসম্ভব সমবায়ের ভিত্তিতে পরিচালনা করতে হবে। আজকের মত জাতিভেদ প্রথা বা অস্পৃশ্যতার অভিশাপ তখন থাকবে না। অহিংসা এবং এর কার্যকর রূপ সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ গ্রামীণ সমাজের শক্তির মূলাধার হবে। সকলকে বাধ্যতামূলকভাবে গ্রামরক্ষী বাহিনীতে কাজ করতে হবে। এর জন্য সকলের নামে একটি তালিকা থাকবে এবং ওই তালিকা দৃষ্টে পালা করে সকলে এ কাজ করবে। গ্রামের শাসনকার্য চালাবে পাঁচ জনের একটি পঞ্চায়েত এবং স্ত্রী-পুরুষনির্বিশেষে গ্রামের সকল প্রাপ্তবয়স্ক অধিবাসীর দ্বারা তাঁদের বাৎসরিক নির্বাচন হবে। পঞ্চায়েতের সদস্য নির্বাচনকারী এই সব গ্রামবাসীর ন্যূনতম যোগ্যতা নির্ধারণ করতে হবে। এই সব পঞ্চায়েতের হাতে যাবতীয় অধিকার ও কর্তৃত্ব থাকবে। অধুনা-প্রচলিত শাস্তিবিধির স্থান সেই সমাজে থাকবে না বলে এই পঞ্চায়েতই তাঁদের কার্যকালীন এক বৎসরের জন্য সম্মিলিত আইন সভা, বিচারক মণ্ডলী এবং ব্যবস্থাপক রূপে কাজ করবেন।

আজই যে কোন গ্রাম এইরকম সাধারণতন্ত্রে নিজেকে রূপান্তরিত করে নিতে পারে। গ্রামের সঙ্গে বর্তমান সরকারের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক কেবলমাত্র খাজনা আদায়ের সূত্রে। কাজেই পূর্বোক্ত লক্ষ্যের পরিপূর্তির পথে এই সরকার খুব একটা বাধা দেবে না। প্রতিবেশী গ্রামসমূহের সঙ্গে, এবং আদৌ যদি তখন কোন কেন্দ্রীয় শক্তি থাকে তবে সেই শক্তির সঙ্গে, এই রকম গ্রামের সম্পর্ক কী হবে—এ বিষয়ে আমি এখানে কোন আলোচনা করিনি। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে

গ্রামীণ সরকারের কাঠামোর একটা মোটামুটি আভাস দেওয়া। এই সমাজ-ব্যবস্থায় ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে ভিত্তি করে সত্যকার গণতন্ত্র গড়ে ওঠে। ব্যক্তি-মানবই তাঁর স্ব-রাজের নির্মাণকার। সে এবং তার সরকার অহিংসার নিয়ম দ্বারা চালিত হয়। সে এবং তার গ্রাম সমগ্র বিশ্বের আক্রমণাত্মক শক্তির প্রতিরোধ করতে সমর্থ। কারণ প্রতিটি গ্রাম এই বিধান দ্বারা পরিচালিত যে, গ্রামের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের এবং তার গ্রামের মর্যাদা রক্ষার্থে মৃত্যু বরণ করবে।

এখানে যে চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে তার মধ্যে মূলতঃ অসম্ভব এমন কিছু নেই। এরকম একটি গ্রাম গড়ে তুলতে সারা জীবন লেগে যেতে পারে। সত্যকার গণতন্ত্র এবং গ্রামীণ জীবনের প্রেমী যে কোন ব্যক্তি একটি গ্রামকে নিজের কর্মক্ষেত্র রূপে নির্বাচন করে তাকেই নিজের বিশ্ব বলে বিবেচনা করে সেখানে লেগে পড়ে থাকলে নিঃসন্দেহে সুফল পাবেন। একাধারে তাঁকে গ্রামের ঝাড়ুদার, কাটুনী, চৌকীদার, চিকিৎসক এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়ে কাজ শুরু করতে হবে। আর কেউ যদি প্রথম প্রথম তার ধারে কাছে না আসে তা হলে ঝাড়ুদার ও কাটুনীর কাজ করে তিনি আপাতত সন্তুষ্ট থাকবেন।

হরিজন, ২৬-৭-১৯৪২

গ্রামীণ একম্

আমার কল্পিত গ্রামীণ একম্ (unit) সর্বাপেক্ষা শক্তিশালীর মতই বলবান। এই গ্রামে এক হাজার লোকের বাস। এইরকম কোন একম্‌কে স্বাবলম্বনের আধারে সুসংগঠিত করলে চমৎকার ফল পাওয়া যাবে।

হরিজন, ৪-৮-১৯৪৬

গ্রামের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ

গ্রামবাসীরা এমন উঁচুদরের কারিগর হবে যে তাদের দ্বারা প্রস্তুত প্রতিটি পণ্য তৈরি মাত্র বাইরের বাজারে বিক্রি হয়ে যাবে। গ্রামগুলির পরিপূর্ণ বিকাশ হলে সেখানে তখন আর সুদক্ষ কারিগর ও উচ্চ শিল্পপ্রতিভা বিশিষ্ট অধিবাসীর কোন অভাব হবে না। গ্রামের নিজস্ব কবি, চারুশিল্পী, বাস্তুকার, ভাষাতত্ত্ববিদ্‌ এবং গবেষক কর্মী থাকবে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, মানুষের জীবনে এমন কোন কাম্য থাকবে না, যা গ্রামে লাভ করা না যাবে। আজ গ্রামগুলি গোময় স্তূপ বিশেষ। আগামী কাল সেগুলিকে ক্ষুদ্রায়তন স্বর্গোদ্যানে পরিণত করতে হবে। এখানকার বাসিন্দারা উঁচুদরের বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন হবে এবং কেউই তাদের প্রতারণা বা শোষণ করতে পারবে না।

দেশের গ্রামসমূহকে এইভাবে পুনর্গঠিত করার কাজ এই মুহূর্তেই আরম্ভ করতে হবে। আর এ কাজ সাময়িকভাবে করলে চলবে না, স্থায়িভাবে করতে হবে।

হস্তশিল্প, চারুকলা, স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ এবং শিক্ষা ইত্যাদি সব কিছুকে একটি মাত্র পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ রূপে গড়ে তুলতে হবে। নঈ তালিমের ভিতর পূর্বোক্ত কর্মসূচী-চতুষ্টয়ের সমন্বয় অত্যন্ত চমৎকারভাবে হয়েছে। মানবশিশুর মাতৃগর্ভে আবির্ভাব থেকে আরম্ভ করে তার মৃত্যু পর্যন্ত সমগ্র কালব্যাপী শিক্ষার পরিকল্পনা নঈ তালিমের ভিতর রয়েছে। আমি তাই গ্রামোন্নয়ন কার্যকে প্রথমাবধি পরস্পরসম্পর্করহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বিভক্ত করব না। আমার কর্মসূচীতে পূর্বোক্ত চারিটি বিষয়েরই সমন্বয় হবে। হস্তশিল্প এবং শ্রমশিল্পকে শিক্ষা থেকে পৃথক্‌ কোন কিছু রূপে বিবেচনা করার পরিবর্তে আমি বরং এদের শিক্ষার মাধ্যম মনে করব। অতএব এই পরিকল্পনায় নঈ তালিমকে সংযুক্ত করতে হবে।

হরিজন, ১০-১১-১৯৪৬

অর্থের স্থান

[শ্রীযুক্ত ঘনশ্যামদাস বিড়লার সঙ্গে আলোচনার অংশবিশেষ]

"অনেক টাকা তুলে আপনি কেন আপনার কাজ এক সুবিস্তৃত এলাকা জুড়ে করেন না ?"

"না, ঠিক যতটুকু দরকার তার চেয়ে বেশী টাকা তোলার নীতিতে আমি বিশ্বাস করি না।"

"কিন্তু আপনি যদি বিশটি বা অন্ততঃ দশটি আদর্শ গ্রাম তৈরি করতে পারতেন তা হলে কি ভাল হত না ?"

"কাজটা যদি এতই সহজ হয় তবে তুমি তোমার টাকা দিয়ে চেষ্টা করে দেখতে পার। আমি কিন্তু জানি যে, এ কাজ এত সোজা নয়। অর্থের যাদুদণ্ডের ছোঁয়া দিয়ে আদর্শ গ্রাম সৃষ্টি করা যায় না।"

হরিজন, ৩০-১১ ১৯৩৫

ডঃ মট ॥ ভারতবর্ষকে যদি টাকা দিতে হয়, তা হলে এ দেশের কোন ক্ষতি না করে কী ভাবে এ অর্থ বিবেচনার সহিত দেওয়া যায় ? টাকা দিলে কি কোন উপকার হবে ?

গান্ধীজী ॥ না। যখন টাকা কেবল দেওয়া হয়, তখন তার ফলে শুধু অপকারই হয়। প্রয়োজন হলে অর্থ উপার্জন করতে হয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এ দেশের মিশনারী সমাজের কাজের জন্য আমেরিকা ও ইংলণ্ড থেকে যে অর্থ এসেছে তা এ দেশের হিত অপেক্ষা অহিত করেছে বেশী। একই সঙ্গে ঈশ্বর ও কুবেরের পূজা করা চলে না। আমার আশঙ্কা যে, এ ক্ষেত্রে কুবেরকেই ভারতের সেবা করার জন্য পাঠানো হয়েছে ; ঈশ্বর পশ্চাতে পড়ে আছেন। এর পরিণাম এই হবে যে, একদিন না একদিন তিনি এর প্রতিফল দেবেন। কোন আমেরিকাবাসী আমাকে যদি বলেন যে, টাকা দিয়ে তিনি

আমাদের সেবা করবেন তা হলে তাঁকে আমি ভয় করব। আমি তাঁকে কেবল বলব, আপনারা আপনাদের দেশের ইঞ্জিনিয়ারদের তাঁদের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির দ্বারা এ দেশের সেবা করার জন্য পাঠান, টাকা রোজগার করার জন্য নয়। অভিজ্ঞতার ফলে আমার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, আধ্যাত্মিক ব্যাপারের সঙ্গে টাকার কোনই সম্বন্ধ নেই।

হরিজন, ২৬-১২-১৯৩৬

৩

গ্রামের সাফাই

গ্রাম পরিষ্কার রাখা

গ্রামের পুষ্করিণী আর কুয়াগুলি পরিষ্কার করা আর পরিষ্কার রাখা এবং গ্রামের গোবর গাদা সাফ করা—এই হবে গ্রামসেবকের কাজ। কর্মী যদি নিজের হাতে এ কাজ করা শুরু করেন এবং বেতনভুক্ ঝাড়ুদারের মত নিয়মিতভাবে সাফাইয়ের কাজ করতে থাকেন, সেই সঙ্গে গ্রমবাসীদের এ কথাও বুঝিয়ে দেন যে ভবিষ্যতে সাফাইয়ের যাবতীয় কাজ নিজেরাই করে নেবার জন্য এখন থেকে তাঁদের গ্রামসেবকের সঙ্গে কাজে লেগে পড়া উচিত, তা হলে এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যেতে পারে যে, আজ হোক কাল হোক গ্রামবাসীরা সেবকের সঙ্গে সহযোগিতা করবেই।

গ্রামের রাস্তা ও গলিগুলি থেকে সমস্ত রকমের আবর্জনা পরিষ্কার করে এই সব জঞ্জালের শ্রেণীবিভাগ করতে হবে। এর ভিতর এমন অনেক জিনিস পাওয়া যাবে যাকে সারে পরিণত করা যায়, এবং এমন অনেক জিনিস আছে যা মাটিতে পুঁতে ফেলা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এক শ্রেণীর জঞ্জালকে আবার সরাসরি সম্পদে রূপান্তরিত করা চলে। কুড়িয়ে পাওয়া প্রত্যেকটি হাড়ের টুকরা অতীব মূল্যবান কাঁচা মাল। এর থেকে প্রয়োজনীয় অনেক জিনিস তৈরি করা যায় অথবা একে গুঁড়িয়ে উৎকৃষ্ট সারে পরিণত করা যায়। ছেঁড়া ন্যাকড়া ও বাজে কাগজ দিয়ে ভাল কাগজ তৈরি হতে পারে।

বিষ্ঠা গ্রামের কৃষিক্ষেত্রের জন্য অতি মূল্যবান সারের কাজ করবে। বিষ্ঠাকে নিম্নবর্ণিত উপায়ে কাজে লাগানো যেতে পারে। মাটিতে বড়

জোর এক ফুট গর্ত খুঁড়ে তরলিত বা শুষ্ক বিষ্ঠার সঙ্গে শুকনো মাটি মিশিয়ে সেই গর্ত বোঝাই করতে হবে। ডাঃ পুরে তাঁর পল্লীস্বাস্থ্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত পুস্তকে বলেছেন যে, মলকে নয় থেকে বার ইঞ্চির বেশী গভীর গর্তে চাপা দেওয়া উচিত নয়। তাঁর মতে উপর থেকে চাপা দেওয়া শুকনো মাটির ভিতর সূক্ষ্ম জীবাণু বিদ্যমান এবং এই মাটির ভিতর সূর্যালোক ও বায়ু অতি সহজে অনুপ্রবেশ করতে পারে বলে ওইসব জীবাণু আলোক ও বায়ুর সহায়তায় এক সপ্তাহের মধ্যে এইভাবে মাটি চাপা দেওয়া মলকে উত্তমরূপে নরম ও সুগন্ধযুক্ত মাটিতে রূপান্তরিত করে দেয়। যে কোন গ্রামবাসী স্বয়ং এর পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। এর জন্য দুটি পদ্ধতির শরণ নেওয়া যেতে পারে। স্থায়ী পায়খানা তৈরি করে সেখানে মাটি বা লোহার বালতি রাখা চলতে পারে এবং প্রত্যহ এই বালতির মল পূর্বোক্ত প্রকারে বিশেষ ভাবে প্রস্তুত মাটির গর্তে ঢেলে দেওয়া চলতে পারে ; আর তা না হলে মাটিতেই ওই ভাবে গর্ত খুঁড়ে সেখানে মলত্যাগ করা যেতে পারে। মল চাপা দেবার জন্য গ্রামে সাধারণ জায়গা থাকতে পারে, অথবা কৃষক তার নিজস্ব কৃষিক্ষেত্রেও এরকম গর্ত তৈরি করতে পারে। তবে একমাত্র গ্রামবাসীদের সহায়তায় এ কাজ করা সম্ভব, আর নিতান্ত যদি এই সহযোগিতা লাভ সম্ভবপর না হয় তা হলে যে কোন উৎসাহী গ্রামবাসী স্বয়ং এই ভাবে মল সংগ্রহ করে নিজের জন্য তাকে সম্পদে রূপান্তরিত করতে পারেন। বর্তমানে লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের এইরকম উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সার প্রত্যহ নষ্ট হচ্ছে এবং এইভাবে যত্র তত্র মলত্যাগ করার জন্য গ্রামের বায়ু দূষিত হচ্ছে ও নানা রকম রোগ ছড়াচ্ছে।

গ্রামের পুষ্করিণীগুলির জল স্নান করা, কাপড় কাচা, পান এবং রন্ধন—সব রকম কাজের জন্যই নির্বিচারে ব্যবহার করা হয়। অনেক গ্রামের জলাশয়ে গবাদি পশুকেও স্নান করানো হয়। অনেক

সময় দেখা যায় যে, মহিষের পাল পুকুরের জলে গা ডুবিয়ে বসে আছে। তাজ্জব এই যে, গ্রামের জলাশয়গুলির এই রকম অপব্যবহার হওয়া সত্ত্বেও এ দেশের গ্রামগুলি এখনও মহামারীতে ধ্বংস হয়ে যায়নি। স্বাস্থ্যবিজ্ঞানী মাত্রেই একবাক্যে ঘোষণা করবেন যে, গ্রাম-বাসীরা যে সব রোগে ভুগে থাকে তার অনেকগুলির কারণ হচ্ছে গ্রামে বিশুদ্ধ জল সরবরাহের ব্যাপারে ঔদাসীন্য।

সবাই নিশ্চয় এ কথা স্বীকার করবেন যে, গ্রামীণ ভারতে পূর্বোক্ত কর্মসূচী রূপায়ণের ব্যবস্থা করা নিঃসন্দেহে এক অতীব গৌরবজনক ও শিক্ষামূলক সেবাকার্য। এর দ্বারা ভারতবর্ষের পীড়িত মানবতার অসীম উপকার হবে। এ কাজ করার পদ্ধতি সম্বন্ধে আমি যে বর্ণনা দিয়েছি তার থেকে এ কথা নিশ্চয় পরিষ্কার হয়েছে যে, এ কাজের জন্য যদি যথোপযুক্ত কর্মী পাওয়া যায় এবং তাঁরা যেরকম সহজ ভাবে ও গর্বভরা চিত্তে আজ কলম ও পেনসিল নিয়ে কাজ করেন ঠিক সেই-রকম ভাবেই যদি ঝাড়ু ও কোদাল হাতে নেন, তা হলে খরচের প্রশ্ন একরকম উঠবে না বললেই চলে। বড়জোর ঝাঁটা, ঝুড়ি, কোদাল, খন্তা, এবং কিছু জীবাণুনাশক ঔষধপত্র—এই কটি দ্রব্য কেনার মধ্যেই খরচ সীমাবদ্ধ থাকবে। শুকনো ছাই সম্ভবতঃ যে কোন রাসায়নিকের জীবাণুনাশক ঔষধের সমতুল্য। যাই হোক, আমরা মানবকল্যাণকামী রাসায়নিকদের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি, গ্রামের উন্নতির জন্য খুব সস্তা অথচ ফলপ্রদ জীবাণুনাশক ঔষধ কী হতে পারে তা যেন তাঁরা আমাদের বলে দেন।

হরিজন, ৮-২-১৯৩৫

সারের গর্ত

পাঞ্জাবের পল্লী-পুনর্গঠন বিভাগীয় কমিশনার শ্রীযুক্ত ব্রেনের সারের গর্ত সম্পর্কিত বুলেটিন থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করে গান্ধীজী মন্তব্য করেন :

এখানে যা বলা হয়েছে, তা সকলেরই সমর্থন লাভ করবে। আমি জানি যে, শ্রীযুক্ত ব্রেন যে ধরনের গর্তের কথা বলেছেন, সাধারণতঃ তা-ই সকলে করে থাকেন। তবে আমার মতে পূরে-কথিত উপর থেকে চাপা দেবার পদ্ধতি অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত এবং লাভদায়ক। এতে গর্ত খোঁড়ার খরচ কম হয় এবং ময়লা স্থানান্তরিত করার ব্যয় একান্ত এড়ানো না গেলেও নিশ্চয়ই হ্রাস করা যায়। এর সঙ্গে আর একটি লাভের কথা যোগ করতে হবে। পূরের পদ্ধতিতে মোটামুটি এক সপ্তাহের মধ্যে মল সারে রূপান্তরিত হয়। কারণ ভূপৃষ্ঠের ছয় থেকে নয় ইঞ্চির মধ্যে যে সব জীবাণু থাকে তাদের অস্তিত্ব এবং বায়ু ও সৌররশ্মির ক্রিয়া অত্যল্প কালের মধ্যে মলকে সুন্দর সারে পরিণত করে দেয়। মলমূত্রকে গভীর গর্তে চাপা দিলে এর সম্ভাবনা থাকে না।

তবে মল মূত্র ও আবর্জনা পরিষ্কার করার বিভিন্ন পদ্ধতির পার্থক্য কিন্তু এ প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে স্মরণীয় বিষয় নয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে সকল প্রকার ময়লাকে মাটি চাপা দেওয়া। এতে দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সাধিত হয়। এক দিকে এর ফলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে এবং অন্য দিকে এই সব সারের দ্বারা গ্রামের ফসল বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন গ্রামবাসীদের বৈষয়িক অবস্থার উন্নতি হয়। খেয়াল রাখতে হবে যে, মল মূত্র ছাড়া অন্যান্য প্রাকৃতিক আবর্জনাকে কিন্তু পৃথক্ ভাবে মাটি চাপা দিতে হবে। পল্লী-পুনর্গঠনের ব্যাপারে গ্রামের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দেওয়া নিঃসন্দেহেই প্রাথমিক পদক্ষেপ।

হরিজন, ১-৩-১৯৩৫

মলমূত্রের গর্ত সম্বন্ধে দু একটি কথা

জনৈক পত্রলেখক প্রশ্ন করেছেন ঃ

(১) এক ফুট গর্তে কোন জায়গায় মল মূত্র মাটি চাপা দেবার পর কত দিন গেলে আবার ওই গর্ত খুঁড়ে সেখানকার ময়লা সরানো যায়?

(২) সাধারণতঃ ধান বোনার পরই ক্ষেতে একবার চাষ দেওয়া হয়। তাই বোনার এক সপ্তাহ পূর্বে যদি ক্ষেতটিতে মল মাটি চাপা দেওয়া হয়ে থাকে তা হলে সেই ক্ষেতে লাঙ্গল চালানো মাত্রই কি মল বাইরে বেরিয়ে আসবে না? এবং এইভাবে হলচালক ও বলদের পা জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হবে না?

(১) পুরের পদ্ধতি অনুযায়ী যদি মলকে উপর-উপর মাটি চাপা দিয়ে রাখা হয় তা হলে খুব বেশী হলে এক পক্ষ কালের পর নিশ্চিন্ত হয়ে সেই ক্ষেতে বীজ বপন করা চলতে পারে। এক বছর বাদে আবার সেই মাটি দিয়ে মল চাপা দেওয়া চলতে পারে।

(২) মানুষ অথবা গবাদি পশুর পায়ে মল লেগে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ মল সম্পূর্ণভাবে রূপান্তরিত হয়ে সুন্দর সারে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত কোন কিছু বোনা চলে না বা বোনা উচিতও নয়। এইভাবে রূপান্তরিত মল বা সার যে কেউ বিনা দ্বিধায় নাড়াচাড়া করতে পারেন।

হরিজন, ১৩-৪-১৯৩৫

মলমূত্র সাফাই

জনৈক পল্লীসেবক কর্মীর প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী লিখেছিলেন ঃ

বর্ষাকালেও মলত্যাগের জন্য গ্রামবাসীদের এমন জায়গায় যাওয়া দরকার যেখানে মানুষজনের যাতায়াত নেই। তা ছাড়া মল মাটি দিয়ে ঢেকে দেওয়া উচিত। গ্রামবাসীদের ভ্রান্ত শিক্ষার জন্য এ কাজ অতীব

কঠিন প্রমাণিত হবে। সিন্দি নামক গ্রামে গ্রামবাসীদের আমরা এই কথা বোঝাবার চেষ্টা করছি যে, তারা যেন পথে ঘাটে মল মূত্র ত্যাগ না করে নিকটবর্তী মাঠে গিয়ে ওই কার্য করে এবং মলত্যাগের পর তার উপর যেন শুষ্ক মৃত্তিকা চাপা দেয়। দুই মাসের নিরন্তর প্রযত্ন এবং মিউনিসিপালিটীর সদস্য ও অপর সকলের সহযোগিতার ফলে এবার তাদের ভিতর পরিবর্তন এসেছে। এখন তারা সাধারণতঃ পথঘাট নোংরা করে না। তারা এখন মাঠে যায় এবং ওইসব জমির মালিকরাও এতে মত দিয়েছেন। কিন্তু একটি ব্যাপারে তাদের যুক্তি-হীন মনোবৃত্তির পরিবর্তন হয়নি—এখনও তারা মাটি দিয়ে মল চাপা দেয় না। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, "ও তো মেথরের কাজ। তা ছাড়া মলে মাটি চাপা দেওয়া তো দূরের কথা, ওর দিকে তাকানোই পাপ।" ওই রকম বিশ্বাসে তারা দীর্ঘকাল অভ্যস্ত হয়ে এসেছে, তাই কর্মীদের কর্মক্ষেত্র নিষ্কণ্টক নয়। বহু পরিশ্রমে তাঁদের ক্ষেত থেকে এই সব আগাছা দূর করে তার পর নূতন কৃষি করতে হবে। তবে আমি জানি যে, এই মহান্‌ আদর্শে আমাদের বিশ্বাস যদি দৃঢ় হয় এবং প্রতিদিন প্রত্যূষের সাফাই কার্যে যদি আমাদের অনন্য নিষ্ঠা থাকে, সর্বোপরি আমরা যদি গ্রামবাসীদের উপর বিরক্ত না হই, তা হলে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যেমন কুয়াশা দূর হয় তেমনি গ্রামবাসীদের কুসংস্কারও অদৃশ্য হয়ে যাবে। এক-আধ মাসের শিক্ষায় যুগ-যুগের দৃঢ়মূল অজ্ঞানতা দূর হয় না।

সিন্দিতে আমরা এবার বর্ষাগমের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। স্বভাবতই ক্ষেতের মালিকরা তাঁদের ফসল রক্ষা করতে চাইবেন। এখনকার মত তাঁরা কাউকে যথেচ্ছ ক্ষেতে যেতে দিতে পারেন না। তাঁদের আমরা এই প্রস্তাব দিয়েছি যে, তাঁরা যেন নিজ নিজ ক্ষেতের সীমাব কয়েক ফুট ছেড়ে এবার চাষবাস করেন। এইভাবে যে কয়েক ফুট জায়গায় এবার চাষ হবে না, সেটি মরশুমের শেষে চমৎকারভাবে উর্বর হয়ে

যাবে। এমন একটা সময় আসছে যখন ক্ষেতের মালিকরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে জনসাধারণকে তাঁদের ক্ষেত ব্যবহার করতে আমন্ত্রণ জানাবেন। ডাঃ ফাউলারের হিসাব মতে, নিয়মিতভাবে কোন ক্ষেতে কেউ মলত্যাগ করলে সেখানে বছরে দুই টাকা মূল্যের সার পড়ে। অবশ্য এই হিসাবের সার্থকতা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করা যেতে পারে। তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ক্ষেতে মল পড়লে তার পরিণাম খুব মঙ্গলজনক হয়।

কেউ অবশ্য এমন কথা বলেননি যে, মানুষের মল সোজাসুজি সার হিসাবে ফসলের ক্ষেতে দেওয়া চলতে পারে। আসল কথা হচ্ছে এই যে, মাটিতে মল পড়লে একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর তার উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়। মাটিতে মল পড়ার পর তার রূপান্তর হবার জন্য কিছুটা সময় দরকার এবং তার পরই সেই ক্ষেত কর্ষণযোগ্য হতে পারে। ক্ষেত কৃষির উপযুক্ত হয়েছে কিনা এ কথা জানার এক অভ্রান্ত পদ্ধতি আছে। যেখানে মল ঢাকা দেওয়া হয়েছে, একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর সেখানকার মাটি খুঁড়ুন। যদি দেখেন যে সে মাটিতে কোন দুর্গন্ধ নেই, মাটি একেবারে স্বাভাবিক এবং তাতে মলের চিহ্ন পর্যন্ত নেই, তা হলে ধরে নিতে হবে যে ওই ক্ষেত এখন বীজ বপনের উপযুক্ত। গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ আমি সব রকমের ফসলের জন্য এইভাবে মলের ব্যবহার করে আসছি এবং এ কাজে চমৎকার ফল লাভ করেছি।

হরিজন, ১১-৫-১৯৩৫

কম্পোস্ট সার

ব্যাপকভাবে কম্পোস্ট সারের প্রচলন করার প্রশ্ন নিয়ে বিবেচনা করার জন্য এ মাসে নূতন দিল্লীতে এক অখিল ভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। গ্রাম এবং শহরে এই পরিকল্পনা জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে কয়েকটি

গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব এখানে গৃহীত হয়। প্রস্তাবগুলি যদি কাগজেই না থেকে যায় তা হলে এগুলিকে নিঃসন্দেহে ভাল এবং মঙ্গলজনক বলতে হবে। আসল কথা হচ্ছে, সমগ্র দেশে এসব প্রস্তাবকে কার্যকর করা হবে কিনা। ভারতবর্ষের জনসাধারণ যদি স্বতঃপ্রণোদিতভাবে সহযোগিতা করে, তা হলে এ দেশ যে কেবল খাদ্যাভাব দূর করতে সমর্থ হবে তাই নয়, ভারতে প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপন্ন হতে পারে। এই জৈব সার সর্বদাই মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে, এর দ্বারা ভূমির কোন ক্ষতি হয় না। প্রত্যহ যে সব আবর্জনা জমা হয়, বুদ্ধি-বিবেচনা সহকারে তার কম্পোস্ট তৈরি করতে পারলে তা মাটির পক্ষে স্বর্ণ-সারের সমতুল্য হবে। এর ফলে দেশে লক্ষ লক্ষ টাকার সাশ্রয় হবে এবং শেষ পর্যন্ত খাদ্যশস্য ও ডাল ইত্যাদির উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া, এইভাবে আবর্জনার সদ্ব্যবহার হলে আমাদের পরিবেশও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে। আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কেবল ঐশী স্বভাবের তুল্যমূল্য নয়, এর ফলে স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হয়।

হরিজন, ২৮-১২-১৯৪৭

৪

গ্রামের স্বাস্থ্য

চিকিৎসা-ব্যবস্থার সীমা

অখিল ভারত গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘের কার্যকলাপ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে বহু কর্মীর কর্মসূচীতে রোগ-চিকিৎসায় সহায়তা দান একমাত্র না হলেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের স্থান গ্রহণ করেছে। গ্রামবাসীদের ভিতর এলোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী, আয়ুর্বেদীয় বা ইউনানী ঔষধের কোন একটি বা ক্ষেত্রবিশেষে সব কটিই বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। এই সব ঔষধের বিক্রেতারা কর্মীদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হলে বিনামূল্যে কিছু ঔষধ দিয়ে দিতে প্রস্তুত। কারণ এর দাম তাদের কাছে খুব বেশী নয়। আর তাঁদের মতে এই দানকার্যকে যদি একান্ত-ভাবে স্বার্থবুদ্ধির দৃষ্টি দিয়েও দেখা যায় তা হলেও তা লাভজনক বিবেচিত হবে। কারণ এতে তাঁদের ওষুধের গ্রাহক বেড়ে যাবে। এই-ভাবে গ্রামের হতভাগ্য রোগীরা শুভেচ্ছাচালিত অথচ ভ্রান্ত ধারণার অনুবর্তী বা অত্যুৎসাহী কর্মীর শিকারে পরিণত হয়। এই সব ওষুধের তিন চতুর্থাংশ কেবল অপ্রয়োজনীয়ই নয়, এগুলির ক্ষতিকারক প্রভাব সরাসরিভাবে সব সময় বোঝা না গেলেও পরোক্ষ ভাবে এ সব দেহের পক্ষে ক্ষতিকারক। যে ক্ষেত্রে এই সব ওষুধ রোগীর রোগের সাময়িক উপশম এনে দেয়, সেখানেও দেখা যাবে যে গ্রামের বাজারে নিঃসন্দেহে এর বিকল্প কিনতে পাওয়া যায়।

গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘ এইজন্য পূর্বোক্ত প্রকারের চিকিৎসা-সহায়তার কার্যক্রম সম্পূর্ণ বাদ দিচ্ছেন। স্বাস্থ্য ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠানের মুখ্য ভূমিকা শিক্ষামূলক। তবে উভয় কার্যক্রমই কি পরস্পরসম্পর্কিত

নয়? দেশের জনগণের কাছে স্বাস্থ্যের অর্থই কি সম্পদ নয়? তাদের বুদ্ধি নয়, তাদের দৈহিক ক্ষমতাই হচ্ছে সম্পদের প্রাথমিক সাধন। এইজন্য সঙ্ঘ গ্রামবাসীদের রোগ প্রতিরোধের পদ্ধতি শেখাবার প্রযত্ন করেন। সকলেই এ কথা ভালভাবে জানেন যে, লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর আহার্য আজ পুষ্টির দিক্ থেকে নিতান্ত অসন্তোষজনক। যেটুকু তারা খায়, তারও অপব্যবহার হয়। স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান নেই বললেই চলে। গ্রামের সাফাই ব্যবস্থা যতদূর সম্ভব খারাপ হতে হয়। সুতরাং এই সব ত্রুটীর সংশোধন হলে এবং জনসাধারণ স্বাস্থ্য-তত্ত্বের সাধারণ নিয়মগুলি পালন করলে অপর কোন চেষ্টা বা অতিরিক্ত অর্থব্যয় ছাড়াই গ্রামবাসীরা অধিকাংশ ব্যাধির হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে। *গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘ এইজন্য চিকিৎসালয় খোলার ব্যবস্থা* রাখেননি। গ্রামবাসীরা বিভিন্ন রোগের ওষুধ হিসাবে কোন্ কোন্ গ্রামীণ জিনিস ব্যবহার করতে পারে তার সম্বন্ধে গবেষণা চলছে। সতীশবাবু যে সব সস্তার চিকিৎসার * কথা বলেছেন সেগুলিকে এ লক্ষ্যাভিমুখী বলা যেতে পারে। সতীশবাবুর দ্বারা আবিষ্কৃত এই সব চিকিৎসা-পদ্ধতি অত্যন্ত সরল হলেও তার কার্যকারিতা অক্ষুন্ন রেখে ঔষধের সংখ্যা হ্রাসের জন্য সতীশবাবু আরও গবেষণা করে চলেছেন। বাজার-প্রচলিত ঔষধগুলি নিয়ে তিনি পরীক্ষা করছেন এবং ব্রিটিশ ফার্মাকোপীয়ার সম পর্যায়ের ওষুধের সঙ্গে তার তুলনা করে দেখছেন। সরল গ্রামবাসীদের রহস্যমণ্ডিত বটিকা ও জল ফুঁড়ে দেওয়ার হাত থেকে উদ্ধার করাই তাঁর এ কাজের লক্ষ্য।

হরিজন, ৫-৪-১৯৩৫

---

* শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রণীত 'গৃহ ও গ্রাম্য চিকিৎসা', ৪র্থ খণ্ড, খাদি প্রতিষ্ঠান, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২ কর্তৃক প্রকাশিত।

চিকিৎসা-সহায়তা

গ্রামসেবায় নিযুক্ত জনৈক কর্মী লিখেছেন—

> এক শত পরিবার বিশিষ্ট ছোট একটি গ্রামে আমি কাজ করছি। আপনি বলেছেন যে, ওষুধ দেবার কথা না ভেবে আগে গ্রামের সাফাই এবং স্বাস্থ্যরক্ষার কর্মসূচীর দিকে নজর দিতে হবে। কিন্তু কোন জ্বরাক্রান্ত গ্রামবাসী সাহায্যপ্রার্থী হলে কর্মীর কর্তব্য কি? এ যাবত আমি তাদের গ্রাম্য বাজারে মেলে এমন দেশী গাছ-গাছড়া ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়ে আসছি।

কর্মীর কাছে জ্বর, কোষ্ঠবদ্ধতা বা ওই-জাতীয় সাধারণ রোগের ব্যাপারে সাহায্যের অনুরোধ এলে নিঃসন্দেহেই কর্মী সাধ্যমত সহায়তা করবেন। নিশ্চিতভাবে রোগ নির্ণয় করতে পারলে গ্রামের বাজারে পাওয়া যায় এমন ওষুধ যে সর্বাপেক্ষা সস্তা ও কার্যকর হয়ে থাকে, এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই। যদি কোন ওষুধ মজুত রাখতেই হয়, তা হলে ক্যাস্টর অয়েল, কুইনাইন এবং গরম জলকে শীর্ষ স্থান দিতে হবে। ক্যাস্টর অয়েল অর্থাৎ রেড়ীর তেল প্রত্যেক জায়গাতেই পাওয়া যেতে পারে। 'সেন্না' পাতায়ও একই রকম কাজ পাওয়া যায়। তবে কুইনাইনের ব্যবহার করতে হবে ভেবে চিন্তে। সব রকম জ্বরে কুইনাইনের চিকিৎসা দরকার হয় না। সব জ্বর কুইনাইনে ভালও হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপবাস বা আহারের ব্যাপারে একটু সংযম করলেই জ্বর ভাল হয়ে যায়। ভাত বা আটা, ডাল ও দুধের বদলে ফলের রস, কিসমিস ভেজানো জল কিংবা টাটকা লেবুর রস বা তেঁতুল সংযোগে গরম গুড়জল পান করাকেই আমি আহার-সংযম বা প্রায়-উপবাস আখ্যা দিচ্ছি। গরম জল অত্যন্ত শক্তিশালী রোগনাশক পদার্থ। এর দ্বারা কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়, শরীরে ঘর্মসঞ্চার

হয় এবং তার ফলে জ্বর নেমে যায়। তা ছাড়া, গরম জল সর্বাপেক্ষা নিরাপদ ও সস্তা বীজাণুনাশক। গরম জল পান করতে হলে ফুটাবার পর চর্মের পক্ষে সহনযোগ্য না হওয়া পর্যন্ত তাকে ঠাণ্ডা হতে দিতে হয়। জল ফুটাবার মানে কিন্তু কেবল গরম করা নয়। জল ফোটা শুরু হলে টগবগ করে শব্দ হবে এবং ফুটন্ত জল বাষ্প হতে থাকবে।

রোগী-পরিচর্যার জন্য কি করা উচিত এ সম্বন্ধে কর্মীর নিশ্চিতভাবে কিছু জানা না থাকলে স্থানীয় কবিরাজকে এর পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া উচিত। আর ধারে কাছে যদি কবিরাজ না থাকেন, অথবা থাকলেও তাঁর উপর যদি নির্ভর করা না চলে, তা হলে নিকটস্থ কোন সেবা-মনোবৃত্তি সম্পন্ন ডাক্তারের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে।

তবে কর্মীরা স্বয়ং বুঝতে পারবেন যে, রোগ দূর করার সর্বাপেক্ষা কার্যকরী উপায় হচ্ছে সাফাইয়ের কাজে হাত দেওয়া। তাঁরা যেন স্মরণ রাখেন যে, প্রকৃতিই সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক। মানুষ যা নষ্ট করছে, প্রকৃতি তার সংস্কার করছে—এ কথা তাঁরা সুনিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন। মানুষ যখন ক্রমাগত প্রকৃতির স্বাভাবিক ধারাকে বাধা দিতে থাকে তখন মনে হয় প্রকৃতির বুঝি আর কোন ক্ষমতা নেই। তিনি তখন আরোগ্যের অতীত বস্তুকে ধ্বংস করবার জন্য তাঁর সর্বশেষ এবং অপ্রতিরোধ্য দূত মৃত্যুকে পাঠান এবং এইভাবে সৃষ্টি নব পরিধেয় পরিধান করে। তাই মানুষ বুঝতে পারুক আর না-ই পারুক, স্বাস্থ্যতত্ত্ব এবং সাফাইয়ের কাজে নিযুক্ত কর্মীরাই হচ্ছে মানুষের শ্রেষ্ঠ সহায়ক ও শ্রেষ্ঠ ভিষক্।

হরিজন, ১১-৫-১৯৩৫

রোগের চিকিৎসা

আমি যে সব গ্রামসেবা বা সমাজসেবা মূলক প্রতিষ্ঠানের কর্মবিবরণী পাই তার অনেকগুলির ভিতর চিকিৎসা-কার্যে সহায়তা দানের কর্মসূচী এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে থাকে। চিকিৎসা-কার্যে সহায়তা দানের এই কর্মসূচীর ধারা নিম্নরূপ হয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠানের কেউ একজন এই রকম ঔষধ বিতরণ করে থাকেন প্রচারিত হবার পর আশপাশের জনসাধারণ তাঁর কাছে ওষুধ নেবার জন্য সমবেত হয়। তিনি তাদের ওষুধ দেন। ঔষধদাতার এতে বিশেষ কোন হাঙ্গামা করতে হয় না। রোগ বা তাঁর উপসর্গ সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ কোন, এমনকি বিন্দুমাত্র জ্ঞান না থাকলেও চলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি পরিচিত ঔষধবিক্রেতাদের কাছ থেকে বিনা-মূল্যে ওইসব ঔষধ পেয়ে থাকেন। গভীর বিবেচনাশক্তি রহিত দাতাদের কাছ থেকে দান পাওয়া খুব একটা কঠিন কাজ নয়। আর্ত মানবতার সহায়তার্থে তাঁদের দানের উপযোগ হচ্ছে, এইটুকু জানতে পারলেই এই সব দাতার বিবেকবোধ পরিতৃপ্ত থাকে।

এই-জাতীয় সমাজসেবা আমার কাছে চরম আলস্যজনক, এমন-কি ক্ষেত্র বিশেষে দুরভিসন্ধিপূর্ণ বলে মনে হয়। তাকে যে ওষুধ দেওয়া হচ্ছে তা খাওয়া ছাড়া তার আর কিছুই করণীয় নেই—এই মনোভাব যখন রোগীর মনে সৃষ্টি করা হয়, তখনই বলতে হয় যে এই-জাতীয় সমাজসেবা অনিষ্ট সাধন করে। ঔষধ খাবার পরও রোগীর জ্ঞান তিলমাত্র বুদ্ধি পায় না, বরং বলতে হবে যে তার অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়। বিনা পয়সায় বা নামমাত্র অর্থব্যয়ে এমন একটি বড়ি বা মাত্রা খানেক তরল ওষুধ পাওয়া যাবে যার দ্বারা তার শরীরের গোলমাল সেরে যাবে—এই বোধ তাকে পুনর্বার অনিয়ম

বা অত্যাচার করতে প্রলুব্ধ করবে। আর বিনা ব্যয়ে এ-জাতীয় সাহায্য পাওয়ায় তার আত্মসম্মানবোধ কমে যাবে; কারণ আত্মমর্যাদা বিশিষ্ট ব্যক্তি বিনিময়ে কিছু না দিয়ে কোন কিছু গ্রহণ করেন না।

আর এক ধরনের চিকিৎসা-সহায়তা আছে, যা প্রশংসনীয়। এ সহায়তা তাঁরাই দিতে পারেন, যাঁরা রোগের গতি-প্রকৃতি জানেন। কিসের জন্য রোগীর দেহে বিশেষ এক ধরনের বিকার দেখা দিয়েছে তা তাঁরা রোগীকে জানাবেন এবং কি ভাবে এর হাত এড়ানো যায় সে সম্বন্ধেও রোগীকে উপদেশ দেবেন। এই সব সেবকেরা দিন রাতের খেয়াল না করে সেবা করে চলবেন। এই-জাতীয় বুদ্ধিযুক্ত সহায়তাকে স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষাপ্রদান-কার্য আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এর ফলে জনসাধারণ কি ভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হয় ও নিজ স্বাস্থ্য রক্ষা করতে হয় তার জ্ঞান অর্জন করে। তবে এ-জাতীয় সেবা কদাচিৎ পাওয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর্মবিবরণীতে চিকিৎসা-সহায়তার উল্লেখ করা এক-জাতীয় বিজ্ঞাপন। এর ফলে অন্যান্য কাজ করার জন্য চাঁদা পাওয়া সহজ হয়, আর হয়তো সেই সব অন্যান্য কাজ করার জন্য চিকিৎসা-সহায়তার মতই অতীব অল্প জ্ঞান ও প্রযত্নের প্রয়োজন পড়ে। অতএব শহর বা গ্রাম যে কোন অঞ্চলের সমাজ-কর্মীদের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, তাঁরা যেন এই সব চিকিৎসা করার কার্যক্রমকে নিতান্ত গৌণ সেবাকার্য জ্ঞান করেন। এই-জাতীয় সেবার উল্লেখ কর্মবিবরণীতে না থাকাই শ্রেয়।

কর্মীদের কর্তব্য হচ্ছে নিজ এলাকায় রোগের প্রসার বন্ধ করার ব্যবস্থা অবলম্বন করা। তাঁদের ঔষধ-ভাণ্ডার হবে যথাসম্ভব ক্ষুদ্র। গ্রামের বাজারে যে যে ঔষধপত্র পাওয়া যায় তা নিয়ে তাঁরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন, এগুলির গুণাগুণ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করবেন এবং যথা-সম্ভব এইগুলিকেই কাজে লাগাবেন। সিন্দিতে কাজ করে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তার সঙ্গে তখন তাঁরা সহমত হবেন। তাঁরা দেখবেন

যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গরম জল, সৌর কিরণ, পরিষ্কার লবণ এবং সোডা, কখনও কখনও ক্যাস্টর অয়েল বা কুইনাইনের প্রয়োগে ঈপ্সিত ফল লাভ হচ্ছে। প্রতিটি জটিল রোগীকে আমরা সরকারী হাসপাতালে পাঠানো একরকম বাধ্যতামূলক করে নিয়েছি। কৃষকরা দলে দলে মীরাবেনের কাছে সমবেত হয় এবং স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও রোগপ্রতিরোধ সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করে। নিছক কিছুটা ওষুধের গুঁড়ো বা মিক্শ্চার সেবনের পরিবর্তে তারা বরং এই ব্যবস্থা-প্রণালীকেই মেনে নিয়েছে।

হরিজন, ৯-১১-১৯৩৫

প্রাকৃতিক চিকিৎসা

পরের দিন সকাল থেকেই রোগী আসা আরম্ভ হল। প্রথম দিন প্রায় ত্রিশজন হাজির হয়েছিল। গান্ধীজী তাদের ছয়জনকে পরীক্ষা করে মোটামুটি একই রকম ব্যবস্থা-পত্র দিলেন। অবশ্য প্রতিটি রোগীর অবস্থার তারতম্য বিচার করে এই ব্যবস্থা-পত্রের ঈষৎ হেরফের করা হয়েছিল। এই ব্যবস্থা-পত্র হচ্ছে রামনাম, সূর্য-স্নান এবং কটি-স্নান (হিপ্ বাথ) এবং সহজ ও সংযত আহার। দুধ, ঘোল, ফল ও ফলের রস সেই আহার্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং প্রচুর পরিমাণে পরিষ্কার টাটকা জল পান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। গান্ধীজী মন্তব্য করলেন, "প্রাকৃতিক চিকিৎসা করার জন্য খুব একটা স্কুল-কলেজের বিদ্যা বা বেশী পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন নেই। বিশ্বজনীনতার সার হচ্ছে অনাড়ম্বরতা। লক্ষ লক্ষ লোকের যে জিনিসের প্রয়োজন, তার জন্য বিশেষ পাণ্ডিত্যের দরকার হয় না। অতি অল্পসংখ্যক লোকই পাণ্ডিত্যের পাঠ গ্রহণ করতে পারে এবং তাই এর দ্বারা কেবল বিত্তবানরাই লাভবান হন। অথচ ভারতের অধিষ্ঠান তার সাত লক্ষ গ্রামে। এই সব অপরিচিত ক্ষুদ্র দুর্গম এক একটি গ্রামের অধিবাসী-সংখ্যা বহু

ক্ষেত্রে কয়েক শতের অধিক নয় এবং অনেক সময় বিশ-পঞ্চাশটি বাসিন্দা নিয়েই এক একটি গ্রামের পত্তন হয়। ওইরকম একটি গ্রামে গিয়ে বসবাস করার ইচ্ছা আমার মনে জাগে। এই হচ্ছে সত্যকার ভারত—আমার ভারত। এবং এই ভারতবর্ষের জন্যই আমার প্রাণধারণ করা। উচ্চশিক্ষিত চিকিৎসক এবং প্রয়োজনীয় শতবিধ সাজসরঞ্জামপূর্ণ হাসপাতালের সুযোগ ওইসব দীনদরিদ্র ব্যক্তিদের আওতার মধ্যে আনা অসম্ভব ব্যাপার। সাধারণ প্রাকৃতিক চিকিৎসা এবং রামনামই তাদের একমাত্র আশা-ভরসা।"

গ্রামবাসীদের সতর্ক করে দিয়ে তিনি বললেন যে, তাঁরা যেন জেনে রাখেন যে তিনি বড়ই কঠোর মনিব। তিনি যদি গ্রামবাসীদের মধ্যে থাকেন তো সে ক্ষেত্রে নিজেকে বা তাঁদের কাউকে তিনি রেহাই দেবেন না। তিনি তাঁদের ঘরে যাবেন, তাঁদের পথঘাট, নালা-নর্দমা পাকশালা, পায়খানা—সব কিছু খুঁটিয়ে দেখবেন। ধুলা বা আবর্জনা তিনি মোটেই বরদাস্ত করবেন না।

হরিজন, ৭-৪-১৯৪৬

আমি বিশ্বাস করি যে, ব্যক্তিগত পারিবারিক এবং সার্বজনীন সাফাইয়ের বিধিবিধান সমূহ যদি যথাযথভাবে পালন করা হয় এবং আহার্য ও ব্যায়ামের প্রতি যদি যথোপযুক্ত দৃষ্টি দেওয়া হয় তা হলে কোন রকম রোগে পড়ার সম্ভাবনা নেই। যেখানে আন্তরিক ও বাহ্য উভয়বিধ পবিত্রতা পরিপূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান, সেখানে অসুস্থতা অসম্ভব হয়ে পড়ে। গ্রামবাসীরা যদি শুধু এইটুকু উপলব্ধি করেন তা হলে ডাক্তার, হাকিম বা কবিরাজ কারও প্রয়োজন ঘটবে না।

প্রাকৃতিক চিকিৎসার জন্য আদর্শ জীবনযাত্রা প্রণালী আবশ্যক। আর এর জন্য নগর ও গ্রামগুলিতে আদর্শ জীবনযাত্রার পরিবেশ থাকা

চাই। তবে ভগবানের নামজপ প্রাকৃতিক চিকিৎসার মধ্যবিন্দু স্বরূপ। একে কেন্দ্র করেই প্রাকৃতিক চিকিৎসা-পদ্ধতি আবর্তিত হয়।

হরিজন, ২৬-৫-১৯৪৬

প্রাকৃতিক চিকিৎসার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা সর্বাপেক্ষা সরল ও স্বল্পব্যয়যুক্ত হবে। গ্রামগুলিতে এইরকম চিকিৎসা-ব্যবস্থা প্রচলন এ কাজের লক্ষ্য। গ্রামবাসীরা যেন এর জন্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম ও অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করতে পারে। তবে কোন জিনিস নেহাৎ গ্রামে পাওয়া না গেলে বাইরে থেকে তা সংগ্রহ করতে হবে। প্রাকৃতিক চিকিৎসার অবশ্যই এক অর্থ জীবন সম্বন্ধে উন্নততর দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা। এ কথার মানে আর কিছু নয়, স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়মানুযায়ী জীবনচর্যার নিয়ন্ত্রণ। হাসপাতাল থেকে পয়সা দিয়ে বা বিনামূল্যে ঔষধ নেবার মত সহজ ব্যাপার এটা নয়। যিনি হাসপাতালের দাতব্য চিকিৎসার শরণ নেন তিনি পরের দাক্ষিণ্য স্বীকার করেন। কিন্তু প্রাকৃতিক চিকিৎসার অধীন রোগীকে কারও কাছে হাত পাততে হয় না। আত্মনির্ভরতা আত্মমর্যাদাবৃদ্ধিকারক। দেহের ভিতর যে সব বিষ জমেছে তা দূর করে তিনি নিজেকে সারিয়ে তোলেন এবং যাতে আর ভবিষ্যতে রোগাক্রান্ত না হন তার জন্য প্রতি-ষেধাত্মক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

উপযুক্ত এবং সুষম আহার্যের প্রয়োজন খুব বেশী। দেশের গ্রামগুলি আজ আমাদেরই মত দেউলিয়া। গ্রামে যথেষ্ট শাক-সব্জী, ফল এবং দুগ্ধ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা প্রাকৃতিক চিকিৎসা পরিকল্পনার এক অপরিহার্য অঙ্গ। এ কার্যে যে সময় ব্যয় হবে তাকে অপচয় জ্ঞান করা অনুচিত। এর পরিণামে প্রতিটি গ্রাম এবং অবশেষে সমগ্র ভারতের উপকার সাধিত হবে।

হরিজন, ২-৬-১৯৪৬

গ্রামের জন্য আমি যে প্রাকৃতিক চিকিৎসা প্রয়োজনীয় বলে মনে করি তা গ্রামে লব্ধ সামগ্রীর দ্বারা গ্রামবাসীদের সেবা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। উদাহরণ স্বরূপ বলব যে, তাদের জন্য আমার বিদ্যুৎ শক্তি বা বরফের প্রয়োজন নেই। এ কাজ কেবল আমার মত গ্রামীণ মনোবৃত্তি সম্পন্ন ব্যক্তিরাই গ্রহণ করতে পারে।

হরিজন, ১১-৮-১৯৪৬

একটি প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বললেন—আমার প্রাকৃতিক চিকিৎসা কেবল গ্রামবাসীদের এবং গ্রামগুলির জন্য। তাই এতে অনুবীক্ষণ যন্ত্র, রঞ্জন রশ্মি জাতীয় জিনিসের স্থান নেই। আর এতে কুইনাইন, এমিটিন, পেনিসিলিন ইত্যাদি ওষুধের প্রয়োজনও হবে না। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষা এবং সুস্থ জীবনযাত্রা পদ্ধতির অনুশীলনই এ ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর এই-ই যথেষ্ট বিবেচিত হওয়া উচিত। প্রত্যেকে যদি এই কাজে সুদক্ষ হয়ে ওঠে তা হলে আদৌ কোন রোগ দেখা দেবে না। আর রোগ নিরাময়ের জন্য যাবতীয় প্রাকৃতিক বিধান পালন করার পরও যদি দৈবাৎ রোগাক্রমণ হয় তা হলে সে ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ ঔষধ হচ্ছে রামনাম।

কিন্তু রামনাম জপের দ্বারা নিরাময়ের এই পদ্ধতি চক্ষের পলকে বিশ্বজনীন হতে পারে না। রোগীকে রামনামের শক্তি সম্বন্ধে বিশ্বাসী করাবার জন্য চিকিৎসককে স্বয়ং এই বিশ্বাসের জীবন্ত প্রতীক হতে হবে। আর এই ফাঁকে প্রকৃতির পঞ্চভূতের কাছ থেকে যতটুকু পাওয়া সম্ভব তা গ্রহণ ও ব্যবহার করতে হবে। ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম অর্থাৎ মাটি জল আগুন বায়ু এবং আকাশ—এইগুলি প্রকৃতির পঞ্চভূত। আমার মতে এই-ই হচ্ছে প্রাকৃতিক চিকিৎসার সীমা। অতএব উরুলীকাঞ্চনে আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা গ্রামবাসীদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যসঙ্গত জীবনযাত্রা-পদ্ধতি শেখানো এবং

পূর্বোক্ত পঞ্চভূতের যথোচিত প্রয়োগে রোগীদের সুস্থ করার প্রয়াসের মধ্যেই সীমিত। প্রয়োজন হলে রোগ নিরাময়ের শক্তি বিশিষ্ট গ্রাম্য গাছ-গাছড়া ব্যবহার করা যেতে পারে। অবশ্য পুষ্টিকর এবং সুষম আহার্য প্রাকৃতিক চিকিৎসার অপরিহার্য অঙ্গ।

হরিজন, ১১-৮-১৯৪৬

স্বাস্থ্যরক্ষার বিধিবিধান

শ্রীব্রিজলাল নেহেরু আমারই মত বাতিকগ্রস্ত। সম্প্রতি তিনি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কোন একটি মন্তব্যের সমর্থন করে সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দিয়েছেন। "আমাদের রোগ-ব্যাধির অনেকটাই নিজেদের দোষ সঞ্জাত"—স্বাস্থ্যমন্ত্রীর মন্তব্যটি এই। কিন্তু শ্রীনেহেরু বিবৃতির সঙ্গে সঙ্গে এও বলেছেন যে, এই দোষের নিরাকরণের জন্য কোন সরকারী ব্যবস্থা আছে বলে তাঁর জানা নেই। তিনি আরও বলছেন, "এ যাবৎ আমাদের প্রত্যেকটি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর মনোযোগ কেবল হাসপাতাল, স্বাস্থ্যাবাস, ক্লিনিক, ঔষধালয় ইত্যাদি রোগ-চিকিৎসা-কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠার মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। যথার্থ জীবনযাত্রা-পদ্ধতি কি এবং কি ভাবে তার আচরণ করা যায় এই শিক্ষা দেশবাসীকে দিয়ে রোগের প্রতিষেধাত্মক ব্যবস্থা অবলম্বন করার কার্যে নিরত কোন প্রতিষ্ঠান সরকার কর্তৃক স্থাপিত হয়নি।"

এর পর তিনি প্রস্তাব করছেন, "রোগের চিকিৎসা-ব্যবস্থা থেকে পৃথক্ এক স্বাস্থ্য সংবর্ধন বিভাগ খোলা দরকার। এই বিভাগের কাজে সহায়তা করার জন্য বিশেষজ্ঞ এবং সাধারণ মানুষ উভয় শ্রেণীর নাগরিকদের দ্বারা গঠিত একটি উপদেষ্টা পরিষদ্ থাকা উচিত।

উপদেষ্টা পরিষদে উভয় শ্রেণীর নাগরিকদের রাখার প্রস্তাব জেনেশুনেই করা হয়েছে। এর ফলে বিশেষজ্ঞরা জনসাধারণের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে এবং যে সব অসুবিধা ও সীমাবদ্ধতার ভিতর সাধারণ মানুষকে বাস করতে হয় তার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে তাঁদের পরিকল্পনা ইত্যাদি রচনা করার সুবিধা পাবেন।”

এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়টির জন্য আমার এই সমধর্মী বন্ধুটি একটি পৃথক্ বিভাগ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করছেন কেন? এ পুরাতন আমলের ফ্যাশান। সে সময় খরচের উপর খরচ বাড়িয়ে নিজেদের এবং সরলবুদ্ধি জনসাধারণকে বোকা বোঝানো হত যে, যত ব্যয় বাড়ানো যাবে ততই উপকার বৃদ্ধি। আমি বরং চাই যে, স্বাস্থ্যমন্ত্রী তাঁর অধীনস্থ চিকিৎসকবৃন্দ এবং অন্যান্য কর্মচারীদের এই কথা বুঝিয়ে দিন যে, যে-জনসাধারণের সেবার জন্য তাঁদের বেতন দেওয়া হয় তাদের সুস্থ ও নীরোগ রাখাই তাঁদের প্রাথমিক কর্তব্য।

এই লক্ষ্যাভিমুখী প্রারম্ভিক পদক্ষেপ হিসাবে শ্রীনেহেরু প্রস্তাব করেছেন—“ভারতের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সঠিক জীবনযাত্রা-পদ্ধতি এবং স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম সম্বন্ধীয় একটি পুস্তক লিখিত হওয়া উচিত। জনসাধারণের মনে আস্থার সৃষ্টির জন্য ভারত সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক এই পুস্তকটি প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন।···ভারতীয় চিকিৎসক সঙ্ঘের উপর এই পুস্তকটি লেখার দায়িত্ব অর্পণ করা যেতে পারে এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ের ভিতর তাঁদের এ কাজ শেষ করতে বলা হবে। আমাদের দেশের চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার কলেজগুলিতে রোগের চিকিৎসার পরিবর্তে স্বাস্থ্যরক্ষার পদ্ধতির উপর জোর দিলে অত্যন্ত সুফল পাওয়া যাবে মনে হয়।”

প্রত্যুত, প্রতিটি স্কুল কলেজে স্বাস্থ্যরক্ষার বিধানাবলী শিক্ষা দেওয়া বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। শ্রীব্রিজলাল নেহেরু প্রস্তাবিত পুস্তক প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে একটি বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

স্বাস্থ্যরক্ষার অজুহাতে বিভিন্ন রকমের টিকা দেবার অত্যুগ্র আগ্রহে যাতে নূতন করে রোগের প্রবর্তন না করা হয়, প্রস্তাবিত পুস্তকের গ্রন্থকারদের সে বিষয়ে অবহিত থাকার জন্য পরামর্শ দেওয়া হবে বলে আমি আশা করি।

হরিজন, ২৮-১২-১৯৪৭

৫

গ্রামবাসীর খাদ্য

কাঁচা শাকসব্জী

খাদ্যতত্ত্ব ও খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন সংক্রান্ত যে-কোন আধুনিক পাঠ্য পুস্তক খুলে দেখলে দেখা যাবে যে, প্রতিবার আহারের সময় অন্ততঃ কয়েকটি কাঁচা শাকসব্জী খাবার জন্য সকলেই অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে পরামর্শ দিয়েছেন। অবশ্য বলা বাহুল্য যে, খাবার পূর্বে এগুলিকে বার বার ভালভাবে ধুয়ে নিতে হবে, যাতে এতে কোনরকম ময়লা বা ধুলাবালি না লেগে থাকে। যে কোন গ্রামেই এরকম শাকসব্জী পাওয়া যায়, কেবল সেগুলি তুলে আনবার অপেক্ষা। অথচ আমরা ভাবি যে, কাঁচা শাকসব্জী খাওয়া বুঝি শহরের বিলাসিতা। ভারতের অধিকাংশ গ্রামের অধিবাসীরা ডাল রুটি বা ডাল ভাত খেয়ে থাকেন। এর সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ লঙ্কা থাকে, যাতে শরীরের ক্ষতি হয়। খাদ্য সংস্কারের দ্বারা যেহেতু গ্রামগুলির আর্থিক পুনর্গঠন কার্যের সূত্রপাত করা হয়েছে সেই কারণে গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার হয় এমন খাদ্য খুঁজে বার করতে হবে। এ খাদ্য স্বল্পতমব্যয়সাপেক্ষ এবং অনাড়ম্বর হওয়া প্রয়োজন। খাদ্যতালিকায় দুই চার পদ কাঁচা শাকসব্জী যোগ করলে বর্তমানে গ্রামবাসীরা যে সব রোগ ভোগ করে তার অনেকগুলির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে। গ্রামবাসীদের আহার্যে ভিটামিনের স্বল্পতা আছে; এর অনেকখানিই কাঁচা শাকসব্জী দ্বারা পূর্ণ হওয়া সম্ভব। দিল্লীতে আমাকে জনৈক বিখ্যাত ইংরেজ চিকিৎসক বলেছেন যে, কাঁচা শাকসব্জীর উপযুক্ত ব্যবহার হলে খাদ্য সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত ধারণায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সংসাধিত হবে এবং দুধের দ্বারা আজ আমরা

যে পুষ্টি আহরণ করি তার অনেকটা এই কাঁচা শাকসব্জীর ব্যবহারে পাওয়া যাবে। তবে তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, ভারতে আজ ঘাস-পাতার মধ্যে যেসব শতবিধ শাকসব্জী অজ্ঞাত ও অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে তাদের ভিতর কতটা পুষ্টির ক্ষমতা আছে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং গবেষণা প্রয়োজন।

হরিজন, ১°-২-১৯৩৫

গ্রামসেবকদের সঙ্গে আলোচনা

আজকের আহার্য তালিকা আমিই ভেবেচিন্তে এবং বিশেষতঃ গ্রামসেবকদের প্রয়োজনের কথা স্মরণে রেখে স্থির করেছিলাম। কাজেই এ সম্বন্ধে আপনাদের আমি বিস্তারিতভাবে জানাতে চাই। আপনাদের খাদ্য পুষ্টিগুণসম্পন্ন হবার সঙ্গে সঙ্গে যেন গড়পড়তা সাধারণ গ্রামবাসীর আয়ের সীমার মধ্যে হয়—এই আমি চেয়েছিলাম। আমরা এখানে স্থির করেছি যে, আট ঘণ্টা পরিশ্রমের ন্যূনতম পারিশ্রমিক অন্ততঃ তিন আনা হওয়া উচিত। সাধারণ গ্রামবাসীর আয়ের কথা বিবেচনা করার সময় এই কথাটিও তাই খেয়াল রাখতে হয়েছিল।

আজ আমরা ৯৮ জন খেয়েছি এবং এ বাবদ মোট ৯৫৶৩ পাই অর্থাৎ প্রত্যেকের জন্য ছয় পয়সার সামান্য কিছু বেশী খরচ হয়েছে। এবার এর বিস্তারিত হিসাব দিচ্ছি :

			টাকা	আনা	পাই
আটা	১৮	সের	১	৮	০
টমাটো	৬	”	০	১১	৩
গুড়	২	”	০	৬	৩
কুমড়া	১২	”	০	৭	৬
তিসি তেল	৩	”	১	২	০

			টাকা	আনা	পাই
দুধ	১২½	সের	৩	১৩	০
সয়াবিন	২	„	০	৬	০
নারিকেল	৪	টি	০	৪	০
কয়েৎ বেল	১৬	„	০	২	০
নুন ও তেঁতুল			০	২	৩
জ্বালানী			১	০	০
		মোট	৯	১৪	৩

বিনোবা আমাকে এই পরামর্শ দিয়েছিল যে, তোমাদের জন্য রুটির ব্যবস্থা করার প্রয়োজন নেই। প্রত্যহ সকালে তোমরা যে গমের জাউ খাও তাই দিলে অনেক ঝামেলার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে। আমি ভাবলাম, না, তোমরা এখন যুবক এবং ভগবান তোমাদের মজবুত দাঁত দিয়েছেন। তোমাদের তাই ভাল করে সেঁকা কড়া ভাখরী দেওয়া উচিত। ভাখরী যে-কেউ তৈরি করতে পারে এবং তা যত্র তত্র নিয়ে যাওয়া চলে। এ ছাড়া ভাখরী কয়েক দিন রেখে খাওয়া যায়। ভাখরীর আটা মাখার আগে তাতে তিসি তেলের ময়ান দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে ভাখরী নরম মুচমুচে হয়েছে। তার পর রোজ কিছু কাঁচা শাকপাতা আর তরকারী খাওয়া উচিত বলে আমরা আজ টমাটো এবং দুই রকমের চাটনী খেয়েছি। একটি চাটনী কয়েৎ বেলের। এ অঞ্চলে এ ফল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় চাটনীটি আমাদের বাগানের শাক দিয়ে তৈরি হয়েছিল। কয়েৎ বেল বিরেচক এবং বলবর্ধক হিসাবে সুপরিচিত, এর সঙ্গে গুড় মিলিয়ে চমৎকার চাটনী তৈরি হয়েছিল। অপর চাটনীকে সুস্বাদু করার জন্য শাকের সঙ্গে নারিকেল, তেঁতুল ও নুন মেশানো হয়েছিল। খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণে ভিটামিন পাবার জন্য প্রত্যহ কোন না কোন

রূপে কিছু কাঁচা শাকসব্জী খাওয়া প্রয়োজন। আমরা যে তরকারী আজ খেয়েছি তা অতীব সস্তা এবং দেশের গ্রামগুলিতে এই সব তরি-তরকারী প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। চাটনীতে তেঁতুল দেওয়া সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলব। লোকসমাজে তেঁতুলের প্রতি কথঞ্চিৎ বিমুখতা থাকা সত্ত্বেও দেখা গেছে যে, তেঁতুল পুষ্টিকারক এবং রক্ত-শোধক। জনৈক আশ্রমবাসী একবার ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিল। তাকে প্রচুর মাত্রায় তেঁতুলের জল দিয়ে বেশ উপকার পাওয়া গিয়েছিল। কোষ্ঠবদ্ধতায় ভুগছে এমন কয়েকটি রোগীর উপরও এর ফল ভাল হয়েছে।

দুধ আমাদের খাদ্যের এক অপরিহার্য অঙ্গ। তোমাদের আজ এক পোয়া করে দুধ দেওয়া হয়েছিল; তবে লক্ষ্য করে থাকবে যে তোমাদের ঘি দিই নি। এতে কোন হানি হয় নি, তা তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পারছ। ভাল ঘি পাওয়া সম্বন্ধে যেখানে সন্দেহ আছে সেখানে খারাপ ঘি খাওয়া কেন? তবে যত অল্পই হোক না কেন রোজ কিছু না কিছু দুধ বা ঘোল খাওয়া দরকার। চিকিৎসকদের মতে এর দ্বারা উদ্ভিজ্জ স্নেহপদার্থ এবং আমিষ পরিপাক করার সহায়তা হয়। তাই কোন রকম ক্ষতির আশঙ্কা না করেই তোমরা ঘি বাদ দিতে পার।

তোমাদের দুটি অন্যতম প্রধান কর্তব্যের মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে গ্রাম-বাসীদের জন্য সুষম খাদ্যের ব্যবস্থা করা এবং নিজেরা স্বয়ং এই রকম খাদ্যে সন্তুষ্ট থাকা। দেশের কিছু সংখ্যক লোক তাদের আহার্যকে অপ্রয়োজনীয় বস্তু দিয়ে অহেতুক ভারাক্রান্ত করে তোলে এবং অধিকাংশ লোকের আহার্যে ভিটামিনের যথেষ্ট অভাব। তাদের মধ্যে সঠিক খাদ্যবস্তুর প্রবর্তন করতে হবে। তোমাদের স্বয়ং গোপালন শিখতে হবে, তার পর এই বিদ্যা গ্রামবাসীদের শেখাতে হবে। বড়ই লজ্জার কথা যে, ভারতের অনেক গ্রামে দুধ পাওয়া যায় না। তোমাদের

দ্বিতীয় মুখ্য কর্তব্য হচ্ছে সাফাই এবং এ কাজ নিঃসন্দেহেই কঠিন। তবে তোমরা যদি সঠিক খাদ্য প্রবর্তন এবং নিজেদের গ্রামের সাফাইয়ের মান মোটামুটি উন্নত করতে পার তা হলে বলতে হবে যে, মানবদেহকে তোমরা দেব-দেউলের উপযুক্ত করে তুলেছ এবং দৈনন্দিন কার্যকলাপের জন্যও সে দেহ একটি কর্মকুশল হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে।

হরিজন, ১-১১-১৯৩৫

৬

গ্রামের শিক্ষা-ব্যবস্থা

মনে যতই সদিচ্ছা থাকুক না কেন, ইংরেজ শিক্ষকরা কিছুতেই ইংলণ্ড এবং ভারতের প্রয়োজনীয়তার পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন না। ওঁদের দেশে স্কুলের জন্য যেসব ইমারত দরকার হয় আমাদের দেশের জলবায়ুতে তার কোন আবশ্যকতা নেই। আর মুখ্যতঃ নাগরিক পরিবেশে প্রতিপালিত ইংরেজ শিশুর জন্য যে ধরনের শিক্ষা প্রয়োজন, আমাদের প্রধানতঃ গ্রামীণ পরিবেশে প্রতিপালিত শিশুদের জন্য সেরকম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নেই।

আমাদের শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করার সময় তাদের হাতে স্লেট, পেনসিল বা বইপত্র না দিলেও চলবে। গ্রামের যে সব সরল যন্ত্রপাতি তারা অবাধে এবং লাভজনকভাবে চালাতে পারবে তা-ই তাদের প্রয়োজন। এর তাৎপর্য হচ্ছে শিক্ষা-পদ্ধতিতে বিপ্লব। কিন্তু এই বিপ্লব ছাড়া অপর কিছু শিক্ষাকে স্কুলে যাবার বয়সের প্রতিটি শিশুর কাছে সহজলভ্য করতে পারবে না।

এ কথা আজ সকলেই স্বীকার করেন যে, সরকারী বিদ্যালয়-গুলিতে পড়া, লেখা এবং গণিতের যে প্রাথমিক জ্ঞান দেওয়া হয়, পরবর্তী জীবনে শিশুর তা বিশেষ কাজে লাগে না। চর্চার অভাবে এর অধিকাংশই তারা বছর খানেকের মধ্যে ভুলে যায়। তাদের গ্রাম্য পরিবেশে এর কোন দরকার পড়ে না।

কিন্তু শিশুদের পরিবেশের কথা বিবেচনা করে তাদের জন্য যদি কোন বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায় তা হলে তারা যে কেবল তাদের শিক্ষা খাতে ব্যয়িত অর্থ পরিশোধ করতে পারবে তাই নয়, পরবর্তী জীবনেও তাদের ওই শিক্ষা কাজে লাগবে। আমার ধারণা

যে, কোন স্কুল যদি কাতাই ও বুনাইয়ের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং তার সঙ্গে সংলগ্ন এক খণ্ড কার্পাস চাষের জমি যদি থাকে তবে সে বিত্থালয় সম্পূর্ণভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে।

আমি যে পরিকল্পনার কথা বলছি তাতে সাহিত্যশিক্ষাকে বর্জনীয় জ্ঞান করা হয় নি। পড়তে, লিখতে এবং সাধারণ গণিত না জানলে কোনরকম প্রাথমিক পাঠ্যক্রমকে সম্পূর্ণ বলা চলে না। তবে পড়া ও লেখার পাট আসবে এ পর্যায়ের শেষ বৎসরে, যখন ছেলে মেয়েরা সঠিকভাবে অক্ষরজ্ঞান পাবার পক্ষে সর্বাধিক মাত্রায় প্রস্তুত হয়ে উঠবে। হস্তলিপি একটি চারুকলা। চিত্রশিল্পী যেমন যথাযথভাবে তার পট অঙ্কন করেন, ছাত্রদেরও তেমনি শুদ্ধভাবে প্রতিটি অক্ষর লিখতে হবে। ছেলেমেয়েদের প্রথমে প্রাথমিক চিত্রাঙ্কনবিত্থা শিক্ষা দিলে এ সম্ভবপর হবে। এইভাবে দিনের অধিকাংশ সময় বৃত্তিমূলক শিক্ষা পাবার সঙ্গে সঙ্গে তারা প্রাথমিক ইতিহাস ভূগোল এবং গণিতের সম্বন্ধে মৌখিক জ্ঞান প্রাপ্ত হবে। এ ছাড়া তারা সদাচার শিখবে, প্রত্যক্ষ সাফাই বিজ্ঞান এবং স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধীয় পাঠ গ্রহণ করবে এবং পরে এই সব নিজেদের ঘরে প্রবর্তন করে তারা নীরব বিপ্লবীতে পরিণত হবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১১-৭-১৯২৯

৭

কুটির শিল্প এবং কৃষি

বস্ত্র

আজ যেমন প্রতিটি গ্রাম নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য উৎপাদন করে নেয় তেমনি বস্ত্রের ব্যাপারেও প্রতিটি গ্রাম নিজেদের জন্য সূতা কেটে কাপড় বুনে নেবে—এইটিই নিঃসন্দেহে আদর্শ হওয়া উচিত। প্রয়োজনীয় যাবতীয় খাদ্যশস্য উৎপন্ন করার চেয়ে সূতা কেটে কাপড় বুনে নেওয়া গ্রামের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ কার্য। গ্রামে সহজেই আবশ্যক পরিমাণে তুলা মজুত করে রাখা যায় এবং বিশেষ কোন রকম অসুবিধা ছাড়াই কাতাই বুনাইয়ের ব্যবস্থা করা যায়।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১১-৮-১৯২৯

আমাদের যাবতীয় সার্বজনীন সহযোগী জীবনের ভিত্তি হচ্ছে চরখা। চরখা ব্যতিরেকে কোনরকম স্থায়ী সার্বজনীন জীবন গঠন করা অসম্ভব। এই হচ্ছে একমাত্র দৃষ্টিগোচর বন্ধন যা আমাদেরকে দেশের দীনতম ব্যক্তিটির সঙ্গে সমসূত্রে আবদ্ধ করে এবং এইভাবে তার মনে আশার সৃষ্টি করে। এর সঙ্গে আমরা অনেক কিছু যোগ করতে পারি এবং আমাদের তা যোগ করা উচিতও। তবে অভিজ্ঞ রাজমিস্ত্রী যেমন উপরের দেওয়াল গাঁথার পূর্বে বুনিয়াদ মজবুত কিনা সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে নেয় আমাদেরও তেমনি সর্বপ্রথম চরখার ব্যাপারে আঁটঘাট বেঁধে পরবর্তী কাজে নামতে হবে। আর উপরের গাঁথুনি যতই বিশাল হবে নীচের ভিতও সেই অনুপাতে গভীর ও সুদৃঢ় হওয়া দরকার। সুতরাং এ দেশে সুফল লাভ করতে হলে সূতা কাটাকে সার্বজনীন করতে হবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৪-৯-১৯২৪

কৃষির দ্বারা যথেষ্ট উপার্জন না হবার দরুন এবং অনেক সময় বেকার থাকার জন্য যে সব গ্রামের অধিবাসী নিত্য অভাবপীড়িত, একমাত্র সেই সব গ্রামেই মজুরীর বিনিময়ে সুতা কাটা প্রবর্তন করা যেতে পারে।

তবে দারিদ্র্য বা সচ্ছলতার কথা বিচার না করেই প্রতিটি গ্রামে প্রত্যেকের নিজের প্রয়োজনের জন্য সুতা কাটার প্রচলন করতে হবে। সেই সব ক্ষেত্রে গ্রামবাসীদের যে সাহায্য দিতে হবে তা নিম্নরূপ ধারণ করবে। তাদের তুলার বীজ ছাড়ানো, ধুনাই বা কাতাই যার যা প্রয়োজন শিক্ষা দিতে হবে এবং ক্রয়মূল্যে তাদের তুলা ও চরখার সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করতে হবে। এ ছাড়া তাদের সুতা প্রচলিত দরে বুনিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২-৫-১৯২৯

চরখা

চরখা আমার কাছে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। জনসাধারণের যেটুকু স্বাধীনতা ছিল তাও তারা চরখার বিলুপ্তির পর খুইয়েছে। চরখা ছিল গ্রামের কৃষির পরিপূরক এবং গ্রামবাসীদের মর্যাদার কারণ। স্বামীহীনার সুহৃদ্ এবং সান্ত্বনা ছিল এই চরখা। চরখা গ্রামবাসীকে অলস হতে দিত না। কারণ সুতা কাটার সঙ্গে তুলার বীজ ছাড়ানো, ধুনাই, টানা দেওয়া, পাই করা, সুতা রঙানো এবং বুনাই ইত্যাদি আগেপিছের বহুবিধ ক্রিয়া সংশ্লিষ্ট রয়েছে। এই সব কাজের জন্য আবার গ্রামের ছুতার মিস্ত্রী এবং কামার কর্মরত থাকত। চরখার কারণে ভারতের সাত লাখ গ্রাম স্বরাট্ ছিল। চরখার বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তেল ঘানী ইত্যাদি অন্যান্য গ্রামীণ উদ্যোগও বিনষ্ট হয়ে গেল। এইসব শিল্পোদ্যোগের পরিবর্তে অপর কোন শিল্পের

প্রবর্তন হল না। এইভাবে গ্রামের বিভিন্ন বৃত্তি ও তৎসঞ্জাত সৃজনশীল প্রতিভা গ্রাম থেকে বিদায় নিল এবং এইসব শিল্পের দ্বারা গ্রামে যেটুকু অর্থাগম হচ্ছিল তাও বন্ধ হয়ে গেল।

সুতরাং গ্রামবাসীদের যদি আবার আত্মস্থ হতে হয় তা হলে স্বভাবতঃই চরখা এবং তৎসংশ্লিষ্ট আর সব কিছুর পুনঃপ্রবর্তন করতে হবে।

বুদ্ধিমান স্বার্থত্যাগী ও স্বদেশভক্ত ভারতবাসীদের এক বাহিনী ব্যতিরেকে চরখার এই পুনঃপ্রবর্তন এক অসম্ভব কার্য। এই বাহিনীর লোকদের গ্রামে গিয়ে একাগ্রচিত্তে চরখার বাণী প্রচার করতে হবে ও গ্রামবাসীদের নিষ্প্রভ চক্ষে আশার দ্যুতি ফুটিয়ে তুলতে হবে। এ হচ্ছে এক মহতী সমবায় প্রচেষ্টা ও জনশিক্ষার যথার্থ উদ্যোগ। চরখার প্রতিটি আবর্তন যেমন ধীরে ধীরে অথচ নিশ্চিতভাবে জীবনদায়িনী শক্তির আলোড়ন সৃষ্টি করে, পূর্বোক্ত কর্মসূচীও তেমনি এক নীরব অথচ সুনিশ্চিত বিপ্লবের দ্যোতক।

বিশ বছরের চরখার কাজের অভিজ্ঞতা আজ আমাকে পূর্বোক্ত যুক্তির অভ্রান্ততা সম্বন্ধে দৃঢ়বিশ্বাসী করেছে। গরীব মুসলমান এবং হিন্দু উভয়কেই চরখা প্রায় সমভাবে সেবা করেছে। কোনরকম হৈ চৈ আড়ম্বর আর ঢাকঢোল না পিটিয়েই চরখার দ্বারা এইসব দরিদ্র গ্রামীণ কারিগরদের হাতে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা তুলে দেওয়া হয়েছে।

সেই জন্যই আমি দ্বিধাহীন চিত্তে বলে থাকি যে, চরখা আমাদের সকল ধর্মবিশ্বাসের জনগণকে স্বরাজ অভিমুখে নিয়ে যাবে। চরখা গ্রামকে তার ন্যায়সঙ্গত স্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে এবং উচ্চ-নীচের ভেদাভেদ ঘুচায়।

হরিজন, ১৩-৪-১৯

গ্রামোদ্যোগ

আমি কংগ্রেসের গ্রামোদ্যোগ সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের রচনাকারী এবং এই প্রস্তাবকে কার্যকর করার জন্য যে সঙ্ঘ গঠিত হচ্ছে তার একমাত্র পথপ্রদর্শক। অতএব এইসব গ্রামীণ শিল্প সম্বন্ধে আমার ধারণা সমূহ জনসাধারণের কাছে সাধ্যমত ব্যাখ্যা করা আমার কর্তব্য বলে মনে হচ্ছে।

হরিজন-যাত্রার সময় আমি যখন মালাবারে পরিভ্রমণ করছিলাম, তখন থেকেই আমার মনে এইরকম এক সঙ্ঘ গড়ার কল্পনা দানা বাঁধে। জনৈক খাদি কর্মীর সঙ্গে ইতস্ততঃ আলোচনা করতে করতে আমার মনে এই ধারণা হয় যে, নিষ্ঠুর ও অবিবেচকের মত শহরবাসীরা গ্রামীণ জনতার কাছ থেকে এতাবৎ যা কেড়ে নিয়েছেন তা তাদের পুনরায় প্রত্যর্পণ করার উদ্দেশ্যে সততার সঙ্গে প্রয়াস করার জন্য এই-জাতীয় একটি প্রতিষ্ঠানের অতীব প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

এ কথা দেশের অল্প লোকই আজ জানেন যে, দেশের কৃষিক্ষেত্রগুলি ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরায় বিভক্ত হবার ফলে কৃষিকর্ম আজ মোটেই লাভদায়ক পেশা নয়। গ্রামবাসীরা প্রাণস্পন্দনহীন জীবন অতিবাহিত করে। উপবাস তাদের জীবনে নিত্যকার ব্যাপার। তারা ঋণভারে জর্জরিত। ধার না দিয়ে উপায় নেই বলেই মহাজন নতুন ঋণ দিয়ে থাকে। কারণ তা না হলে পুরাতন কর্জও আর উশুল না হবার আশঙ্কা। গ্রামের এই ঋণদান প্রথা সবরকম অনুসন্ধান কার্যকে বিফল করে দেয়। পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অনুসন্ধান করা সত্ত্বেও এসম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অগভীর।

গ্রামোদ্যোগ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার অর্থ হচ্ছে ভারতের সাত লক্ষ গ্রামের মৃত্যু।

দৈনিক পত্রিকা সমূহে আমার প্রস্তাবের যে প্রতিকূল সমালোচন

প্রকাশিত হয়েছে তা আমি দেখেছি। আমাকে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, মানুষের উদ্ভাবনী বুদ্ধি যে প্রাকৃতিক শক্তিকে করায়ত্ত করেছে আমি যেন তার প্রয়োগ দ্বারা গ্রামবাসীদের উদ্ধার করার কথা চিন্তা করি। সমালোচকদের বক্তব্য হচ্ছে যে, প্রগতিশীল পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির মত আমাদেরও জল, বায়ু, খনিজ তৈল এবং বৈদ্যুতিক শক্তি পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করা উচিত। তাঁরা বলেন যে, প্রকৃতির এই গোপন শক্তি অধিগত করার জন্য প্রতিটি আমেরিকাবাসীর হাতে আজ তেত্রিশটি কৃতদাস এসে গেছে।

আমি আজ দৃঢ়ভাবেই বলব যে, ভারতে ওই পদ্ধতির প্রবর্তনের ফলে প্রত্যেকে তেত্রিশটি কৃতদাসের মালিক হবে না, এর পরিণামে এ দেশবাসী তেত্রিশগুণ দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ হবে।

প্রয়োজনীয় কাজ করার জন্য লোক কম থাকলে যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া ভাল। কিন্তু ভারতের মত দেশে, যেখানে কর্মের তুলনায় কর্মী বেশী, সেখানে যন্ত্রীকরণ করা অন্যায়। কয়েক বর্গ গজ জমিতে চাষ দেবার জন্য লাঙ্গলের দরকার হয় না। দেশের লক্ষ লক্ষ নিরন্ন জনসাধারণের জন্য কিভাবে অবকাশের ব্যবস্থা করা যেতে পারে এ আমাদের সমস্যা নয়। তাদের কর্মহীন সময়কে কেমন করে কাজে লাগানো যায় এই হল সমস্যা। বছরে গড়ে ছয় মাস তাদের এইভাবে নিষ্ক্রিয় থাকতে হয়। প্রতিটি কলকারখানা গ্রামবাসীদের পক্ষে বিপদ্ স্বরূপ—এ কথাটা অদ্ভুত শোনালেও নিছক সত্য। সঠিক পরিসংখ্যান দিতে না পারলেও মোটামুটি হিসাবে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কলকারখানায় নিযুক্ত একজন শ্রমিক সমবৃত্তি অবলম্বনকারী গ্রামের অন্ততঃ দশ জন শ্রমিকের কাজ করে। অর্থাৎ একজন কলে নিযুক্ত শ্রমিক গ্রামে থাকতে আগে সে যা রোজগার করত তার চেয়ে এখন অনেক বেশী রোজগার করে এবং এইভাবে দশজন গ্রামের সাথীকে বঞ্চিত করে। এইভাবে সুতা কাটা এবং বস্ত্র বয়নের কল গ্রামবাসীদের

জীবিকার এক অন্যতম প্রধান উপায় নষ্ট করে দিয়েছে। এর উত্তরে এ কথা বলে লাভ নেই যে, কলের কাপড় সস্তা ও ভাল জাতের হয়। হয় কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। কেন না, কলের কারণে যখন হাজার হাজার কাটুনী ও তাঁতী কর্মচ্যুত হয় তখন সবচেয়ে সস্তা কলের কাপড়ও গ্রামে উৎপন্ন সর্বাপেক্ষা দামী খাদির চেয়ে মহার্ঘ। কয়লা খনির যে সব শ্রমিক কর্মস্থলেই কয়লা ব্যবহার করার জন্য পায় তাদের কাছে কয়লা ব্যয়বহুল নয়। তেমনি যে সব গ্রামবাসী নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদি স্বয়ং উৎপন্ন করে নেবে তাদের কাছে খাদি বহুমূল্য নয়। কলের কাপড় তো কেবল গ্রামবাসীদের বেকার করে, কিন্তু চাল বা আটা ইত্যাদির কল সহস্র সহস্র দরিদ্র নারী শ্রমিকদের কর্মচ্যুত করার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জাতির স্বাস্থ্য নষ্ট করে। যে দেশের লোক আমিষাশী বা যাদের আমিষ আহার গ্রহণ করার মত সঙ্গতি আছে, এসব ময়দা বা কলে ছাঁটা চাল হয়তো তাদের খুব ক্ষতি করবে না। কিন্তু ভারতের মত যে দেশের লক্ষ লক্ষ অধিবাসী ইচ্ছা থাকলেও অর্থাভাবে মাছ মাংস খেতে পায় না, তাদের জাঁতায় পেশা আটা এবং ঢেঁকি-ছাঁটা চালের পুষ্টিকর খাদ্যপ্রাণ থেকে বঞ্চিত করা পাপ। কলের ময়দা ও চালের বিপদ সম্বন্ধে জনসাধারণকে শিক্ষা দেবার জন্য চিকিৎসক সমাজ ও অন্যান্যদের সম্মিলিতভাবে কাজ করার দিন এসে গেছে।

কতকগুলি জাজ্বল্যমান সত্যের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি এই কথা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছি যে, গ্রামবাসীদের কাজ দেবার উপায় অধিকতর যন্ত্রীকরণ নয়। এ যাবত গ্রামবাসীরা যে সব শিল্প ও বৃত্তি অবলম্বন করে এসেছে তার পুনরুদ্ধার দ্বারাই আমাদের অভীষ্ট পূর্ণ হবে।

আমার মতে তাই অখিল ভারত গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘের কাজ হবে প্রচলিত শিল্পগুলিকে উৎসাহ দান এবং প্রয়োজন ও সম্ভবপর হলে ক্ষেত্র-

বিশেষে মৃত বা মৃতকল্প গ্রাম্য শিল্পের পুনরুজ্জীবন সাধন। এ কাজ করতে হবে গ্রামীণ পদ্ধতিতে অর্থাৎ যুগ যুগ ধরে যে ভাবে গ্রামবাসীরা নিজেদের ঘরে থেকে এইসব কাজ করে এসেছে সেই ভাবে এর নব জন্মদান করতে হবে। তুলার বীজ ছাড়ানো, ধুনাই, চরখায় সুতা কাটা এবং তাঁতে কাপড় বোনার ক্ষেত্রে যেমন সম্প্রতি কার্যকুশলতার উন্নতি সাধন করা হয়েছে, অন্যান্য গ্রামীণ শিল্পের ক্ষেত্রেও তেমনি প্রভূত উন্নতি করা যেতে পারে।

এ পরিকল্পনায় আপত্তি করে জনৈক সমালোচক বলেছেন যে, প্রাচীন কালের এই পদ্ধতি নেহাৎ ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং তাই এর ফলে সামূহিক বা সমবায়মূলক জীবনধারা বিকশিত হতে পারে না। এ দৃষ্টিভঙ্গী আমার কাছে অত্যন্ত অযৌক্তিক মনে হয়। গ্রামবাসীরা নিজ নিজ কুটিরে বসে পণ্য উৎপাদন করলেও সেগুলিকে একত্রিত করে বিক্রয় করা যেতে পারে। এর লাভ সকলের মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে বিভাজন করা যেতে পারে। নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী মিলিত ব্যবস্থাপনার অধীনে গ্রামবাসীরা কাজ করতে পারেন। সাধারণ ভাণ্ডার থেকে কাঁচা মাল সরবরাহ করা যেতে পারে। একবার সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টার ইচ্ছা জাগ্রত হলে নিঃসন্দেহে শ্রমবিভাজন, সময়সংক্ষেপ এবং কর্মদক্ষতা ইত্যাদির ব্যাপারে পারস্পরিক সহযোগিতার যথেষ্ট ক্ষেত্র পাওয়া যাবে। পাঁচ হাজারেরও অধিক গ্রামে অখিল ভারত চরখা সঙ্ঘ আজ এ কাজ করছে।

তবে গ্রাম্য সৌর মণ্ডলের সূর্য হচ্ছে খাদি। অন্যান্য কুটির শিল্প হচ্ছে এর গ্রহ-উপগ্রহের মত। উত্তাপ ও জীবনী শক্তিদায়ী সূর্যের মত খাদি এই সব কুটির শিল্পকে সঞ্জীবিত করে এবং এরাও প্রতিদানে খাদিকে সহায়তা প্রদান করে। তাই খাদি ছাড়া অন্যান্য শিল্পের সমৃদ্ধি অসম্ভব। এদিকে আমার গত সফরের সময় আমি বুঝতে পারলাম যে, অন্যান্য কুটির শিল্পের পুনরুজ্জীবন ব্যতিরেকে খাদিও আর অগ্রসর

হতে পারছে না। কারণ গ্রামের কর্মহীনতার সময়কে লাভজনকভাবে কাজে লাগাতে হলে গ্রামীণ জীবনের সকল স্তরকে স্পর্শ করতে হবে। চরখা সঙ্ঘ ও গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘের কাজও এই।

আমি জানি যে, এক শ্রেণীর লোক খাদিকে অর্থনৈতিক দৃষ্টি থেকে মোটেই লাভজনক মনে করেন না। খাদিকে আমি গ্রামীণ কর্মসূচীর কেন্দ্রবিন্দু বলে উল্লেখ করায় আশা করি তাঁরা ভয় পাবেন না। খাদি এবং অন্যান্য কুটির শিল্পের পারস্পরিক সম্বন্ধের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ না করলে আমার মনের চিত্র অসম্পূর্ণ থেকে যেত। তবে এ বিষয়ে যাঁরা সহমত নন তাঁরা কেবল অপরাপর কুটির শিল্পের প্রতি তাঁদের কর্মপ্রচেষ্টাকে কেন্দ্রিত করতে পারেন।

হরিজন, ১৬-১১-১৯৩৪

গ্রামোদ্যোগ পরিকল্পনা

গ্রামোদ্যোগ পরিকল্পনার পিছনে এই বিচারধারা ক্রিয়াশীল যে, আমাদের নিত্যব্যবহার্য পণ্য সমূহের সরবরাহের ব্যাপারে আমরা গ্রামের উপর নির্ভরশীল হব এবং যদি বোঝা যায় যে কোন পণ্যের চাহিদা আপাতত গ্রাম থেকে পূর্ণ হবার সম্ভাবনা নেই, তা হলে দেখতে হবে যে একটু পরিশ্রম ও সংগঠন করলে সেটি গ্রামে উৎপাদন করা যায় কি না। এর লাভ-লোকসান খতিয়ে দেখার সময় আমাদের সুবিধা নয়, গ্রামবাসীর সুবিধাই আমাদের বিচার্য বিষয় হবে। হতে পারে যে শুরুতে আমরা প্রচলিত দামের চেয়ে একটু বেশী দিয়েও অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট মাল পাব। তবে আমরা যদি আমাদের প্রয়োজনীয় পণ্য সমূহের সরবরাহকারীদের সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত হই এবং তারা যাতে তাদের কাজে আরও দক্ষতা অর্জন করতে পারে তার জন্য

যত্নবান হই এবং এতদুদ্দেশ্যে তাদের সাহায্য করি, তা হলে ক্রমশঃ অবস্থার উন্নতি হবে।

হরিজন, ২৩-১১-১৯৩৪

শ্রম সাশ্রয় করার পদ্ধতি চাই না কেন ?

জনৈক পত্রলেখক ঢেঁকি ও জাঁতার বিরোধিতা করে লিখেছিলেন। তাঁকে উত্তরদান প্রসঙ্গে গান্ধীজী মন্তব্য করেন ঃ

নিছক ঢেঁকি বা জাঁতার প্রতি পক্ষপাতের জন্য আমি ওই পুরাতন পদ্ধতির সমর্থক নই। যে সব লক্ষ লক্ষ গ্রামবাসী আজ বেকার তাদের কাজ দেবার অন্য কোন উপায় নেই বলেই আমি পুরাতন পদ্ধতির পুনঃপ্রবর্তনের সমর্থক। আমার মতে এই প্রচণ্ড আর্থিক দুর্গতির সমাধান না হলে গ্রামোন্নয়ন অসম্ভব ব্যাপার। এই জন্য গ্রামবাসীদের কর্মহীন সময়কে কাজে লাগানোর জন্য তাদের উদ্বুদ্ধ করাই একটি দৃঢ়মূল উন্নয়ন কার্য।

হরিজন, ৩০-১১-১৯৩৪

গ্রামোদ্যোগ কেন ?

আমাদের ঘর-গৃহস্থালীর নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যসমূহের মধ্যে এমন কিছু আছে বলে মনে হয় না যা কিনা গ্রামবাসীরা পূর্বে উৎপাদন করে নি এবং আজ উৎপাদন করতে পারে না। নিজেদের মনে একটু পরিবর্তন সংসাধন করে আমরা যদি গ্রামবাসীদের প্রতি নজর দিতে আরম্ভ করি তা হলে অবিলম্বেই আমরা তাদের ঘরে লক্ষ লক্ষ টাকা পৌঁছে দিতে পারব। আজ কিন্তু আমরা একরকম বিন্দু-মাত্র প্রতিদান না দিয়ে গ্রামবাসীদের শোষণ করে চলেছি। এই

শোচনীয় ঘটনার অগ্রগতি রোধ করার দিন এসে গেছে। আমার কাছে অস্পৃশ্যতা নিবারণ আন্দোলনের অর্থ তথাকথিত অচ্ছুৎদের পাংক্তেয় করার প্রচেষ্টার চেয়েও অধিকতর মাত্রায় গভীর অর্থব্যঞ্জক। আজ গ্রামবাসীরা শহরবাসীর চোখে অস্পৃশ্য। কোন শহরবাসী গ্রামবাসীদের জানে না বা চেনে না, সে তাদের সঙ্গে থাকবে না এবং যদি বা কোন কারণে তাকে গ্রামে থাকতে হয় তা হলে সে সেখানে শহরের জীবনযাত্রা পদ্ধতির প্রবর্তন করবে। যদি আমরা ত্রিশ কোটি লোকের বসবাস করার মত শহর গড়তে পারি তা হলেই মাত্র এ অবস্থা সহনীয় হতে পারে। গ্রামোদ্যোগের পুনঃপ্রবর্তন করে বাধ্যতামূলক বেকারত্ব জনিত ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের অগ্রগতি রোধ করার পরিকল্পনার তুলনায় ত্রিশ কোটি লোকের এক নগর বসানোর ব্যবস্থা নিঃসন্দেহেই অধিকতর অসম্ভব ব্যাপার।

হরিজন, ৩০-১১-১৯৩৪

গ্রামীণ পণ্য ব্যবহার করুন

[একটি বক্তৃতা থেকে]

গ্রামবাসীদের প্রতি এক ভীষণ অবিচার করার দোষে আমরা দোষী। গ্রামের লুপ্ত শিল্প ও চারুকলা পুনঃপ্রবর্তনে উৎসাহিত করে এবং তৈরী মালের কাটতি সম্পর্কে তাদের নিশ্চয়তা দিয়েই কেবল আমরা এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি। ঈশ্বরের মত ধৈর্যবান্ আর ক্ষমাশীল আর কেউ না থাকলেও তাঁর ধৈর্য ও ক্ষমারও একটা সীমা আছে। গ্রামবাসীদের প্রতি আমাদের কর্তব্যে অবহেলা করলে আমরা নিজেদের ধ্বংস নিজেরাই ডেকে আনব। এ কর্তব্য মোটেই কঠোর নয়, বরং অত্যন্ত সহজ। আমাদের গ্রামীণ মনোভাবাপন্ন হতে হবে এবং ব্যক্তিগত বা ঘর-গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে

এই গ্রামীণ মনোভাব দ্বারা চালিত হতে হবে। আর এতে খুব একটা ব্যয়বাহুল্যের আশঙ্কাও নেই। এমন কিছু-সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক প্রয়োজন, যারা নিকটবর্তী গ্রামগুলিতে গিয়ে সেখানকার কারিগরদের আশ্বাস দেবেন। আশ্বাস দেবেন এই মর্মে যে, তাঁদের দ্বারা উৎপাদিত সব কিছু অবিলম্বে নিকটস্থ নগর বা শহরে বিক্রি হবে। এ এমন একটি কাজ যা জাতি ধম বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি নরনারী করতে পারেন। এতে রাজনৈতিক দল বা মত ও পথের পার্থক্য কোন বাধা স্বরূপ হবার কথা নয়। আমাদের দেশের যথার্থ অর্থব্যবস্থার সঙ্গে এই কর্মসূচীর পূর্ণমাত্রায় সঙ্গতি বিদ্যমান।

হরিজন, ১-৩-১৯

গ্রাম শোষণমুক্ত হবে

[একটি আলোচনা থেকে]

গ্রামের শোষণ বন্ধ হলেই কেবল তার পুনরুদ্ধার সম্ভবপর। ব্যাপকভাবে যন্ত্রশিল্পের প্রবর্তন হলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং বাজারের সমস্যা দেখা দেবে এবং তার পরিণাম স্বরূপ স্বভাবতঃই প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্ন ভাবে গ্রামের শোষণ শুরু হয়ে যাবে। আমাদের তাই স্বাবলম্বী ও স্বরাট্‌ গ্রাম গড়ে তোলার জন্য যত্নশীল হতে হবে এবং এই সব গ্রামে প্রধানতঃ নিজ নিজ ব্যবহারের জন্য পণ্য উৎপন্ন হবে। কুটির শিল্পের এই চারিত্রধর্ম বজায় রেখে গ্রামবাসীরা তাদের সঙ্গতি ও ক্ষমতা অনুসারে যত আধুনিক যন্ত্রপাতিই নির্মাণ ও ব্যবহার করুক না কেন আমার তাতে আপত্তি নেই। শুধু এইটুকু দেখতে হবে যে, এই সব কলকব্জা যেন অপরকে শোষণ করার জন্য ব্যবহৃত না হয়।

হরিজন, ২৯-৮-১৯৩৬

অন্যান্য শক্তি ব্যবহার সম্বন্ধে

প্রশ্ন। গুজরাটের হাজার হাজার গ্রামে কলের জাঁতা চলে। এর এঞ্জিন জলাশয়ের কাছে নিয়ে গেলে সহজেই তার দ্বারা নদী, পুষ্করিণী এবং কূয়া থেকে সেচের জন্য জল তোলা যায়। সরকারকে প্রভাবিত করে বা ওইসব আটাকলের মালিকদের রাজী করিয়ে তাঁদের জাঁতা চালাবার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রয়োজনীয় কাজ করিয়ে নেওয়া যায় না কি?

উত্তর। হাজার হাজার গ্রামে শস্য পেষাই করার জন্য কলের জাঁতা থাকা আমি আমাদের অসহায় অবস্থার প্রতীক বলে বিবেচনা করি। এই সব আটাকল বা তাদের এঞ্জিনগুলির প্রত্যেকটিই তো আর ভারতবর্ষে প্রস্তুত নয়। আমার কেমন যেন মনে হয়, প্রশ্নকারী ঠিক সংবাদ পরিবেশন করেন নি। গুজরাটের তো নয়ই, এমনকি সমস্ত ভারতের আটাকলের মোট সংখ্যা হাজার হাজার হবে কিনা সন্দেহ। তবে আমার অনুমান যদি মিথ্যা হয় তা হলে বলতে হবে যে, আমাদের দেশবাসী কী প্রচণ্ড রকম আলস্যের কবলে পড়েছে এ ঘটনা তারই নিদর্শন। আর গ্রামে ব্যাপকভাবে ওই সব কল-কব্জা বসানো লোভের লক্ষণও বটে। এইভাবে গরীবদের মেরে কি কারও নিজের পকেট ভারী করা উচিত? ওইরকম প্রতিটি আটাকল হাজার হাজার হাতে চালানো জাঁতাকে বেকার করে দেয়। এর ফলে অসংখ্য কুলবধূ উপার্জনবিহীন হয়ে পড়ে এবং জাঁতা প্রস্তুতকারক কারিগররাও বৃত্তিচ্যুত হয়। এখানেই এর শেষ নয়, এ পদ্ধতি সংক্রামক ব্যাধির মত অন্যান্য কুটির শিল্পকেও আক্রমণ করবে। আর কুটির শিল্পের অধোগতির অর্থ শিল্পকলারও অবক্ষয়। এর দ্বারা যদি পুরাতনের বদলে নূতন শিল্পের প্রবর্তন হত তা হলে আপত্তির কিছু ছিল না। কিন্তু তা তো হচ্ছে না। যে সব হাজার হাজার গ্রামে কলের জাঁতা চলছে,

সেখান থেকে জাঁতা ঘোরাবার সুমধুর প্রভাতী সঙ্গীত বিদায় নিয়েছে।

এবার প্রধান বক্তব্যে আসা যাক। বর্তমানে এই সব শক্তিচালিত এঞ্জিনের অপব্যবহার হচ্ছে বলে মনে করলেও আমাকে বলতেই হবে যে, এখন এই সব এঞ্জিন দিয়ে যে কাজ করানো হচ্ছে তা ছাড়া এগুলি দিয়ে যদি নদী, পুকুর বা কুয়া থেকে সেচের জল তোলা যায় তা হলে কৃতকর্মের অন্ততঃ আংশিক প্রায়শ্চিত্ত হবে। পত্রলেখক এর জন্য সরকারী সহায়তার কথা বলছেন, কিন্তু তা কি একেবারে অপরিহার্য? এঞ্জিনের মালিকরা কি স্বেচ্ছায় এই কল্যাণকর এবং প্রয়োজনীয় কাজের জন্য তাঁদের এঞ্জিন দেবেন না? আমরা কি এতই পক্ষাঘাত-গ্রস্ত হয়ে পড়েছি যে সরকার বাধ্য না করলে আমরা কোন কিছু করতেই প্রস্তুত নই? যাই হোক, আমার সুদৃঢ় অভিমত এই যে, জনসাধারণের সম্মুখে যে ভয়াবহ ভবিষ্যতের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তার কবল থেকে তাদের রক্ষা করার জন্য অবিলম্বে যাবতীয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন দ্বারা দেশের সর্বপ্রকার শক্তির সদ্ব্যবহার করতে হবে।

হরিজন, ১০-৩-১৯৪৬

৮

ভূমি-ব্যবস্থা ও অহিংসার আদর্শ

সমবণ্টন

সমবণ্টনের প্রকৃত তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, প্রতিটি ব্যক্তির স্বাভাবিক প্রয়োজন মেটাবার মত সঙ্গতি তার করায়ত্ত করতে হবে। তার চেয়ে বেশী কারও কাছে থাকবে না। উদাহরণ স্বরূপ, কারও পরিপাক শক্তি যদি দুর্বল হয় এবং তার ক্ষুধা নিবারণের জন্য যদি আধ পোয়া আটা দরকার হয় তা হলে তার এবং যার আধসের আটার রুটিতে ক্ষিদে মেটে উভয়েরই নিজ নিজ প্রয়োজনপূর্তির ব্যবস্থা থাকা চাই। এই আদর্শকে কার্যকর করার জন্য সমগ্র সমাজ-ব্যবস্থারই পুনর্গঠন করা প্রয়োজন। অহিংসা যে সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তি সে সমাজ অন্য কোন আদর্শ গ্রহণ করতে পারে না। আমরা হয়তো কোন দিনই অন্তিম লক্ষ্যে উপনীত হতে পারব না; কিন্তু এই আদর্শকে হৃদয়ে সদা-জাগ্রত রেখে এর পরিপূর্তির জন্য অবিরাম চেষ্টা করতে হবে। আমরা যতটা এই আদর্শের সমীপবর্তী হব, সমাজে ততটা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেখা দেবে এবং অহিংস সমাজ গঠন করার ব্যাপারে ততটাই আমরা সফল হব।

অপরের জন্য অপেক্ষা না করে যে কোন ব্যক্তির পক্ষে এই রকম জীবনধারা গ্রহণ করা খুবই সম্ভব। আর, একজন ব্যক্তি যদি বিশেষ বিশেষ আচরণবিধি পালন করতে পারে তা হলে ব্যক্তি-গোষ্ঠীর পক্ষেও তার অনুসরণ করা সম্ভবপর। আমি দৃঢ়তা সহকারে এই কথা বলতে চাই যে, সঠিক পন্থা গ্রহণ করার জন্য কেউ যেন অপরের অপেক্ষায় বসে না থাকে। লক্ষ্য পরিপূর্ণভাবে আয়ত্ত করা সম্ভব নয় এই রকম ধারণা মানুষের মনে এলে সে সাধারণতঃ সেই লক্ষ্যাভিমুখে চলা আরম্ভ করতে দ্বিধা বোধ করে। এ-জাতীয় মনোভাব বস্তুতঃ প্রগতির পরিপন্থী।

এবার দেখা যাক অহিংস পন্থায় কি ভাবে সমবণ্টন করা যায়। এর প্রথম ধাপ হচ্ছে এই, যিনি এই আদর্শকে তাঁর অস্তিত্বের অঙ্গীভূত করেছেন তাঁকে প্রথমে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের পরিবর্তন সাধন করতে হবে। ভারতের দারিদ্র্যের কথা স্মরণ করে তিনি তাঁর প্রয়োজনগুলিকে যথাসম্ভব সংকুচিত করবেন। তাঁর অর্থোপার্জনের সঙ্গে অসাধুতার কোন সম্পর্ক থাকবে না। ফাটকাবাজীর ইচ্ছা পরিত্যাগ করতে হবে। তাঁর বাসস্থান এই নূতন জীবনদর্শনের অনুকূল হবে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আত্মসংযমের অভিব্যক্তি প্রকট হবে। নিজের জীবনে সম্ভাব্য সকল প্রকার পরিবর্তন সংসাধন করার পরই তিনি তাঁর প্রতিবেশী এবং বন্ধুবর্গের কাছে এর প্রচার করার অধিকারী হবেন।

প্রত্যুত, এই সমবণ্টনের নীতির মূলে রয়েছে অছিবাদের আদর্শ। ধনীদের নিজেকে অতিরিক্ত অর্থের অছিতে রূপান্তরিত করতে হবে। কারণ এই নীতি অনুযায়ী কারও কাছে তার প্রতিবেশীর চেয়ে একটি টাকাও বেশী থাকা উচিত নয়। এ আদর্শ রূপায়ণের উপায় কি? উপায়টি কি অহিংস হবে, না, ধনীদের কাছ থেকে তাদের ধনসম্পদ কেড়ে নিয়ে আদর্শটিকে রূপায়িত করে তুলতে হবে? শেষোক্ত পন্থা গ্রহণ করলে স্বভাবতঃই হিংসার আশ্রয় নিতে হবে। আর এইরকম হিংস্র আচরণে সমাজের কোন কল্যাণ হতে পারে না। সমাজ এর ফলে আরও দরিদ্র হয়ে পড়বে; কারণ সমাজ এমন একজন লোকের শক্তির উপযোগ থেকে বঞ্চিত হবে যে সম্পদ সঞ্চয় করতে জানে। এইজন্য অহিংস পন্থা নিঃসন্দেহেই শ্রেষ্ঠতর পন্থা। ধনীর কাছে তাঁর সম্পদ রেখে দেওয়া হবে। তবে এ থেকে তিনি ততটুকুই ব্যবহার করবেন, যা তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রয়োজন এবং বাদবাকী তিনি অছিস্বরূপ সমাজের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। অবশ্য এ ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয়েছে যে অছি সৎ হবেন।

যে মুহূর্ত থেকে মানুষ নিজেকে সমাজের সেবক জ্ঞান করে এবং যখন সে সমাজের জন্য উপার্জন ক'রে সমাজ কল্যাণার্থ তা ব্যয় করে, তখন তার অর্থোপার্জন পদ্ধতিতে পবিত্রতা অনুপ্রবেশ করে এবং তার প্রচেষ্টায় অহিংসা মূর্ত হয়। আর মানুষের হৃদয় এইরকম জীবনযাত্রা-প্রণালীর অভিমুখে মোড় নিলে সমাজে কোনরূপ তিক্ততা ছাড়াই এক শান্তিময় বিপ্লব সংসাধিত হবে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, ইতিহাসে কি কোনকালে মনুষ্যস্বভাবের এরকম পরিবর্তনের উদাহরণ পাওয়া যায়? নিঃসন্দেহেই ব্যক্তি-মানবের ভিতর এ-জাতীয় পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। সমগ্র সমাজের ক্ষেত্রে এই নীতি সফল হয়েছে, এরকম দাবি হয়তো করা সম্ভব নাও হতে পারে। কিন্তু এ কথার অর্থ হচ্ছে এই যে, এ যাবত অহিংসার এমন ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা কখনও হয় নি। যে ভাবেই হোক আমাদের মনে এই ভ্রান্ত বিশ্বাস শিকড় গেড়ে বসে গেছে যে, অহিংসা প্রধানতঃ ব্যক্তি-মানবের অস্ত্র এবং সেইজন্য ব্যক্তির ক্ষেত্রেই এর প্রয়োগ গণ্ডীবদ্ধ রাখতে হবে। কিন্তু যথার্থ ব্যাপার তা নয়। অহিংসা নিঃসন্দেহেই সমাজের গুণ। এই সত্য জনসাধারণের মনে দৃঢ়সংবদ্ধ করবার জন্যই আমার প্রচেষ্টা এবং পরীক্ষা। আজকের এই বিবিধ প্রকারের বিস্ময়ের যুগে কেউ নিশ্চয় এমন কথা বলবেন না যে, কোন বিচারধারা বা পরিকল্পনা নূতন হবার জন্যই অপদার্থ। তাছাড়া একটা কাজ দুরূহ বলেই অসাধ্য এমন কথা এ যুগের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে খাপ খায় না। যে সব কথা স্বপ্নেও চিন্তা করা যায় না তাও আজ প্রত্যহ ঘটছে, অসম্ভব নিত্য সম্ভব হচ্ছে। আজকাল হিংসার ক্ষেত্রে যে সব বিস্ময়কর আবিষ্কার হচ্ছে তা দেখে আমরা প্রতিনিয়ত হতচকিত হচ্ছি। আমি কিন্তু বিশ্বাস করি যে, অহিংসার ক্ষেত্রে এর তুলনায় বহুগুণ অধিক অচিন্তনীয় তথা আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব আবিষ্কারের সম্ভাবনা বিদ্যমান। ধর্মের ইতিহাস এই রকম

বিস্ময়কর উদাহরণে পরিপূর্ণ। সমাজ থেকে ধর্মের মূলোচ্ছেদের প্রচেষ্টা-বুনো হাঁসের পিছনে দৌড়ানোর মত অনর্থক প্রয়াস। আর এ-জাতীয় প্রচেষ্টা সফল হবার অর্থ হচ্ছে সমাজের বিনষ্টি। প্রতি যুগেই অন্ধবিশ্বাস, কুপ্রথা এবং অন্যবিধ অপূর্ণতার সৃষ্টি হয়ে ধর্মকে সাময়িকভাবে কলুষিত করে। এরকম ঘটনা আসে আবার চলেও যায়। কিন্তু ধর্ম অক্ষয় অব্যয় হয়ে থাকে। কারণ মোটামুটি বিচারে সমগ্র বিশ্ব-চরাচরের অস্তিত্ব ধর্ম দ্বারা বিধৃত। ধর্মের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা হচ্ছে ঐশ্বরিক বিধানের প্রতি আনুগত্য। ঈশ্বর ও তাঁর বিধান সম-অর্থদ্যোতক শব্দ। অতএব ঈশ্বরের তাৎপর্য হচ্ছে এক অপরিবর্তনীয় জীবন্ত বিধান। কেউ অবশ্য সত্য সত্যই তাঁকে খুঁজে পায় নি। কিন্তু অবতার ও পয়গম্বররা তাঁদের তপস্যার প্রভাবে মানবসমাজকে এই শাশ্বত বিধানের অস্পষ্ট আভাস দিতে পেরেছেন।

তবে আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও যদি ধনীরা সত্যকার অর্থে দরিদ্রদের অভিভাবক বা অছি না হন এবং দরিদ্ররা যদি ক্রমশঃ অধিকতর মাত্রায় নিষ্পিষ্ট হয়ে ক্ষুধার তাড়নায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তা হলে কী করণীয়? এই সমস্যার সমাধান আবিষ্কার করতে গিয়ে আমার অহিংস অসহযোগ এবং আইন-অমান্যকেই ন্যায়োচিত ও অভ্রান্ত পন্থা বলে মনে হয়েছে। দরিদ্রদের সহযোগিতা ব্যতিরেকে ধনীরা সমাজে ধন সংগ্রহ করতে পারে না। শুরু থেকে মানুষ হিংসার সঙ্গে পরিচিত; কারণ এই শক্তি সে নিজ পশু-প্রকৃতির কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। চতুষ্পদ (পশু) থেকে যখন সে দ্বিপদের (মানুষ) পর্যায়ে উন্নীত হল তখনই কেবল তার ভিতর অহিংসার শক্তির উপলব্ধি জাগ্রত হওয়ার সূচনা দেখা দিল। ধীর কিন্তু নিশ্চিত গতিতে তার ভিতর এই বোধ বিকশিত হয়েছে। দরিদ্রদের ভিতর একবার এই জ্ঞান অনুপ্রবেশ করে পরিব্যাপ্তি লাভ করলে

তারা সত্যকার বলশালী হয়ে উঠবে এবং অসাম্যের যে প্রচণ্ড পীড়ন তাদের বুভুক্ষার দ্বারপ্রান্তে নিয়ে এসেছে তার হাত থেকে নিজেদের মুক্ত করার অহিংস পদ্ধতি তারা শিখে যাবে।

হরিজন, ২৫-৮-১৯৪০

অহিংস পন্থা

অশুদ্ধ পন্থার পরিণাম হচ্ছে অশুদ্ধ লক্ষ্য। এই জন্য রাজা ও প্রজার মধ্যে সাম্য আনয়ন করার জন্য রাজার গলা কাটার কর্মসূচী গ্রহণযোগ্য নয়, আর এই গলা কাটার পন্থায় শ্রমিক ও মালিকের মধ্যেও সমানতা আসবে না। অসত্যের মাধ্যমে সত্যে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। একমাত্র সত্যাচরণ দ্বারাই সত্যে উপনীত হওয়া সম্ভব। অহিংসা ও সত্য কি দুই পৃথক্ সত্তা? এর উত্তরে দৃঢ়ভাবে 'না' বলা হবে। অহিংসা সত্যের মধ্যেই নিহিত এবং সত্যও অহিংসার অঙ্গীভূত। আর এইজন্যই বলা হয়ে থাকে যে, এরা একই মুদ্রার দুই পিঠ। এর একটি অপরটি থেকে অভিন্ন। মুদ্রাটিকে যে কোন দিক থেকে দেখা যেতে পারে। এক দিকে রাষ্ট্রীয় প্রতীক এবং অপর দিকে অন্য কিছু লেখা থাকলেও মুদ্রার মূল্য সর্ব্বদাই অপরিবর্তিত থাকে। পরিপূর্ণ পবিত্রতা ব্যতিরেকে এই মহৎ অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে না। দেহ বা মনে অপবিত্রতার প্রশ্রয় দিলে নিজের ভিতর অসত্য ও হিংসা জন্ম লাভ করে।

সুতরাং কেবল সত্যাশ্রয়ী, অহিংস ও শুদ্ধাত্মা সমাজবাদীরাই ভারতবর্ষ এবং সমগ্র বিশ্বে সমাজবাদী সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হবেন।

হরিজন, ১৩-৭-১৯৪৭

অহিংস অর্থব্যবস্থা

খুঁটিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে, যত কম মাত্রাতেই হোক না কেন, মানুষের যে কোন কার্যকলাপ এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের পিছনে কিছু-না-কিছু হিংসার অস্তিত্ব বিদ্যমান। এমন কি অল্পাধিক হিংসা ব্যতিরেকে জীবনধারণ ক্রিয়াই অসম্ভব হয়ে পড়ে। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হচ্ছে এর পরিধি যথাসম্ভব সংকুচিত করা। প্রত্যুত 'অহিংসা' এই নেতিবাচক শব্দটির তাঁৎপর্যই হচ্ছে, জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ যে হিংসা, তাকে পরিহার করার প্রচেষ্টা। অহিংসায় বিশ্বাসী ব্যক্তি এইজন্য এমন পেশা গ্রহণ করবেন যাতে হিংসার সম্ভাবনা ন্যূনতম। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, অহিংসায় বিশ্বাসী কোন ব্যক্তি কশাইয়ের বৃত্তি গ্রহণ করেছেন এমন কথা কল্পনা করা যায় না। মাংসাহারী অহিংস হতে পারে না এমন কথা বলা হচ্ছে না; তবে অহিংসায় বিশ্বাসী আমিষাশী শিকার করতে যাবেন না এবং তিনি যুদ্ধ বা যুদ্ধের প্রস্তুতিকার্যে অংশ গ্রহণ করবেন না।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, এমন অনেক কার্যকলাপ এবং পেশা আছে যার সঙ্গে হিংসার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ এবং অহিংসায় বিশ্বাসীকে এ সব বর্জন করতে হবে। কিন্তু কৃষি ব্যতিরেকে জীবন ধারণ করা অসম্ভব, অথচ এর জন্য কিছু না কিছু হিংসা করতেই হয়। অতএব আমাদের সম্মুখে বিচার্য প্রশ্ন হচ্ছে, এই পেশা কি হিংসাভিত্তিক? তবে সব কাজকর্মের মধ্যেই হিংসার অস্তিত্ব আছে বলে আমরা কেবল এই হিংসার পরিমাণ যথাসম্ভব হ্রাস করার প্রয়াসই করতে পারি। অহিংসায় আন্তরিক বিশ্বাস না থাকলে এ করা যায় না। এমন একজন মানুষের উদাহরণ নেওয়া যাক, যিনি কোন প্রত্যক্ষ হিংসা করেন না এবং নিজ শ্রমার্জিত অন্ন গ্রহণ করেন। তবে তাঁর মনে সর্বদাই অপরের সম্পদ্ ও সমৃদ্ধির কারণে ঈর্ষা ও অসূয়া বিদ্যমান।

এ রকম লোককে অহিংস বলা চলবে না। সুতরাং অহিংস উপজীবিকা বলা হ'বে তাকেই, যা মৌলিক বিচারে হিংসা রহিত এবং যার দরুন অপরকে শোষণ বা ঈর্ষা করতে হয় না।

কোন ঐতিহাসিক সাক্ষ্যপ্রমাণ পেশ করতে না পারলেও আমি বিশ্বাস করি যে, ভারতবর্ষে এমন এক সময় ছিল যখন গ্রামীণ অর্থ-ব্যবস্থা এই রকম অহিংস পেশার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল। মানুষের অধিকার নয়, তার কর্তব্যের উপরই ছিল এর বুনিয়াদ। এই-জাতীয় বৃত্তিতে আত্মনিয়োগকারী ব্যক্তিদের জীবিকা নির্বাহ হয়ে যেত; কিন্তু তাদের পরিশ্রম মূলতঃ সমাজকল্যাণে নিয়োজিত হত। ছুতার মিস্ত্রি গ্রামের কৃষকের প্রয়োজন মেটাত, এর বিনিময়ে তাকে নগদ অর্থ না দিয়ে কৃষিজাত পণ্য দেবার প্রথা ছিল। এ ব্যবস্থাতেও অন্যায়ের সম্ভাবনা থাকতে পারে। তবে তার পরিমাণ একেবারেই অল্প। প্রায় ষাট বৎসর পূর্বেকার কাথিয়াওয়াড়ের জীবনযাত্রার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমি এ উক্তি করছি। আজকের অনুপাতে সে সময়কার লোকেদের চক্ষে অধিকতর ঔজ্জ্বল্য ও তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অধিকতর প্রাণচাঞ্চল্য ছিল। তখনকার ওই জীবনযাত্রা অচেতন অহিংসা আশ্রিত ছিল।

এই সব পেশা ও শিল্পোদ্যোগের মূলাধার ছিল শরীরশ্রম এবং তখনকার দিনে কোন বৃহদাকার যন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল না। কারণ মানুষ যখন নিজের হাতে চাষ করার মত জমি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে তখন আর কাউকে শোষণ করার অবকাশ থাকে না। আর কুটির-শিল্পের সঙ্গেও শোষণ ও দাসত্বের সম্পর্ক নেই। বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্প কয়েক জনের হাতে সম্পদ একত্রিত করে এবং তারা তার পর বাদ-বাকী আর সকলের উপর প্রভুত্ব করে। মালিকবর্গ তাঁদের শ্রমিকদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের প্রয়াস করলেও পূর্বোক্ত প্রথা শোষণ-আধারিত এবং শোষণ হিংসার নামান্তর মাত্র।

এমন একটা সময় ছিল যখন সমাজ শোষণের উপর নয়, ন্যায়-বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ কথা বলার তাৎপর্য এই যে, সত্য ও অহিংসা সে সময় মাত্র মুষ্টিমেয় ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ পুণ্যকার্য ছিল না। সমগ্র সমাজ এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হত। পুণ্যকার্য যদি বিশিষ্ট পরিস্থিতিতে বা স্বল্প কয়েকজন দ্বারাই কেবল আচরিত হয়, আমি তা হলে তার কোন সদর্থ খুঁজে পাই না।

হরিজন, ১-৯-১৯৪০

৯

গ্রামীণ পরিবহণ ব্যবস্থা

গ্রাম্য শকটের সপক্ষে

বরোদার শ্রীঈশ্বরভাই আমিন আমার কাছে পশুশক্তি বনাম যন্ত্রশক্তি সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ রচনা পাঠিয়েছেন। তার থেকে সংশ্লিষ্ট অংশ নিম্নে উদ্ধরণ করা হচ্ছেঃ

> কৃষিকার্য বা স্বল্প দূরের পথ অতিক্রম করার ব্যাপারে যন্ত্রশক্তির তুলনায় পশুশক্তি ব্যয়বহুল নয় এবং তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পশু-শক্তি যন্ত্রশক্তির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। তবে আজ-কালকার প্রবণতা হচ্ছে পশুশক্তি বর্জন করে যন্ত্রশক্তি গ্রহণ করা।
>
> গো-শকটের উদাহরণ নিন। এতে গাড়ীর জন্য ১০০ টাকা এবং এক জোড়া বলদের জন্য ২০০ টাকা লাগে। গ্রামের বন্ধুর বালুকাকীর্ণ পথে গড়ে ষোল মণ বোঝা নিয়ে কোন গরুর গাড়ী দিনে অন্ততঃ পনের মাইল চলতে পারে। এর জন্য দৈনিক বলদের খোরাকী বার আনা, গাড়োয়ানের মজুরী ছয় আনা এবং গাড়ীর ক্ষয়ক্ষতি স্বরূপ চার আনা, অর্থাৎ সর্ব সমেত এক টাকা ছয় আনা খরচ পড়বে। এক টন মাল বহন করার ক্ষমতা যুক্ত কোন মোটর লরীর পনের মাইল পথ যেতে অন্ততঃ এক গ্যালন পেট্রোল, কিছুটা মবিল তেল, মোটা রকমের সংরক্ষণ ও মেরামতী ব্যয় এবং উচ্চ বেতনের ড্রাইভার প্রয়োজন। পনের মাইল যেতে লরীটির পেট্রোল ও মবিল বাবদ এক টাকা আট আনা খরচ হবে। দৈনিক আট ঘণ্টা করে কাজ করলে লরীটির পিছনে প্রত্যহ ছয় টাকা সংরক্ষণ ব্যয় হবে বলে যদি ধরা যায় তা হলে পনের মাইল চলার জন্য এ বাবদ বার আনা পড়বে। এ ছাড়া ড্রাইভার, ক্লিনার এবং মাল বোঝাই ও খালাস করার লোকদের মজুরী বাবদ আট আনা

লাগবে। অতএব এই বাবদ মোট দুই টাকা বার আনা খরচ হবে এবং এতে দুই গাড়ী মাল আঁটায় এ ক্ষেত্রেও গাড়ী পিছু এক টাকা ছয় আনা খরচ পড়বে। একটি গো-শকট প্রত্যহ সাত আট-বার সারের গাদা থেকে আধ মাইল দূরবর্তী ক্ষেতে সার বয়ে নিয়ে ফেলতে পারে। এর জন্য এক টাকা ছয় আনার উপর সার বোঝাই ও খালি করার কাজে গাড়োয়ানের একজন সহায়কের বেতন ছয় আনা অতিরিক্ত লাগবে। মোটর লরীকে দিয়ে এ কাজ করালে তার ব্যয়ও কোনক্রমে কম পড়বে না। মোটর লরী পাকা রাস্তায় দীর্ঘ পথ একটানা মাল নিয়ে গেলেই কেবল গো-শকটের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। এই ক্ষেত্রে গরুর গাড়ীকে অত্যন্ত মন্থর-গতি ও ব্যয়বহুল মনে হবে। আর পশুদের একটানা অনেক দূর নিয়ে যাওয়া উচিতও নয়; কারণ এতে তাদের স্বাস্থ্য ও কর্মশক্তির উপর খুবই চাপ পড়ে। গো-শকটকে অবশ্য একটানা দিবারাত্র দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে দেখা যায়, রেলওয়ে স্টেশন থেকে দূর দূর গ্রামাঞ্চলে মাল পরিবহণের জন্য গো-শকটকে মোটর লরীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করতে হয়। তবে এই সব গাড়ীর বলদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। কারণ মালিকের রোজগার অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় বলদের খোরাকও কম হয়ে থাকে। মালপত্র বা যাত্রীর দ্রুত পরিবহণ যে ক্ষেত্রে কাম্য, সেখানে গো-শকটের পক্ষে ধীর গতিই একমাত্র বাধা। গ্রামবাসীদের অবসর সময়ে কোন আয় হয় না এবং দ্রুতগামী মোটরে চড়ে সময় বাঁচাবার কোন অর্থও তাদের কাছে নেই। কাজেই স্বল্প দূরের পথ তারা পদব্রজে যাবে এবং অধিক দূরত্বের জন্য গোযান ব্যবহার করবে। কৃষক যদি তার নিজের গো-শকটে ভ্রমণ করে তা হলে তার নগদ কোন ব্যয় হয় না, নিজের ক্ষেত্রজাত শস্য বলদকে খাইয়ে পরিবহণ কার্য চালিয়ে নেয়। কৃষকের কাছে তার কৃষিজাত ঘাস ও শস্য পেট্রোল স্বরূপ, গরুর গাড়ীটি তার মোটর লরী এবং বলদই তার ঘাসকে শক্তিতে রূপান্তরিত করার এঞ্জিন। প্রচলিত যন্ত্র ঘাস খাবে না, বা কৃষির পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সারও দেবে না। কৃষকের কাছে

গো-শকট থাকার অর্থ ছুতার মিস্ত্রী ও কামারের কাজ পাওয়া। আর গাভী পালনের অর্থ একটি হাইড্রোজেনেশন মেশিন থাকা। উদ্ভিজ্জ তৈল এর দ্বারা জমাট মাখন ও ঘিয়ে রূপান্তরিত হয়। এ ছাড়া গাভী তার বলদ উৎপাদক যন্ত্রও বটে। এই ভাবে গাভীর দ্বারা তার দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

মোটর লরীর আক্রমণ সফল হতে পারে আবার নাও হতে পারে। তবে বুদ্ধিমান কর্মীরা যদি এ সমস্যার সর্বাঙ্গীণ বিচার করে গ্রামবাসীদের সৎপরামর্শ দেন তবে তা বুদ্ধিমত্তার কাজ হবে। ঈশ্বরভাইয়ের রচনাটি তাবৎ গ্রামসেবকদের এতদভিমুখী চিন্তার খোরাক জোগাবে বলে আশা করা যায়।

হরিজন, ৩-৭-১৯৩৭

মোটর গাড়ী বনাম গোযান

আগস্ট মাসের গ্রামোদ্যোগ পত্রিকায় গ্রামের দৃষ্টিকোণ থেকে মোটর গাড়ী ও গোযানের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নে ওই পত্রিকার যুক্তিসমূহের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ দেওয়া হল:

জেলা বোর্ড বা ওই-জাতীয় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন মূলক প্রতিষ্ঠান গ্রামে কাজ করার জন্য কিছু অর্থ ব্যয় করতে আগ্রহান্বিত হলে সেই অর্থ কি গ্রামে বিভিন্ন প্রকারের প্রচারমূলক কর্মসূচী পরিচালনার জন্য মোটর গাড়ী ক্রয় করার উদ্দেশ্যে ব্যয় করা চলতে পারে? উপরি-উক্ত প্রশ্ন আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয়েছে। প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে, এই সব প্রতিষ্ঠান যে গ্রামের প্রতি তাদের কর্তব্য উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছে এবং বর্তমানে শহর ও গ্রাম এবং শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের ভিতর যে ভেদাভেদ

বিদ্যমান তা দূরীকরণের জন্য আগ্রহ প্রদর্শন করছে, এ এক শুভ-লক্ষণ। এখন কথা হচ্ছে, একই রাত্রে একাধিক গ্রাম পরিদর্শন-কারী মোটর গাড়ী দ্বারা কি এই আদর্শ সাধনের কাজ ত্বরান্বিত হবে?

আমরা যখন টাকা পয়সা খরচ করি এবং বিশেষতঃ সে ব্যয় যখন একান্তভাবে গ্রামবাসীদের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে তখন এটা দেখা অত্যন্ত প্রয়োজন সেই টাকা যেন গ্রামবাসীদের কাছে আবার ফিরে যায়। জেলা ও লোকাল বোর্ডের টাকা আসে জনসাধারণের কাছ থেকে এবং তাই তাদের তরফ থেকে যা কেনা হবে তার টাকা যেন আবার জনগণের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে, গ্রামবাসীদের কাছ থেকে খাজনা ও কর রূপে সংগৃহীত অর্থ যদি সেই এলাকার বাইরে চলে যায় তবে নিঃসন্দেহে তার পরিণামে এ এলাকার জনসাধারণ দরিদ্র হয়ে পড়বে এবং তার তাৎপর্যই এই যে, জেলা ও লোকাল বোর্ডের অর্থকোষ ক্ষীণকায় হতে থাকবে।

গ্রামে কাজ করার জন্য লোকাল বোর্ড হাজার কয়েক টাকার বেশী বরাদ্দ করতে পারে না। অতএব বোর্ডের তরফ থেকে যদি একটি মাত্র মোটর ভ্যান ক্রয় করার পরিকল্পনা হয় তবে তার অর্থ অবিলম্বে ৫০০০ টাকা ওই এলাকার বাইরে চলে যাবে। এ ছাড়া টায়ার ও অন্যান্য অংশ কেনার জন্য মাঝে মাঝে বেশ কিছু ব্যয় করতে হবে এবং দৈনিক পেট্রোল খরচ তো আছেই। এর সব কিছুই বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয় এবং এর দাম মেটা-বার জন্য এই এলাকা থেকে বহু অর্থ বাইরে পাঠাতে হবে। এইসব ব্যয়ের আপাতদৃশ্যমাণ লক্ষ্য পল্লী-উন্নয়ন হলেও মাঝে মাঝে কৃষি, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, মাদক বর্জন, শিশু পালন এবং এই-জাতীয় অন্যান্য বিষয়ের বক্তৃতা অথবা রেডিও-গ্রামোফোনের সঙ্গীত ইত্যাদি শোনার জন্য গ্রামবাসীদের এই বিপুল ব্যয় বরদাস্ত করতে হবে। অথচ তাকে ও তার পরিবারকে মাসিক দুই টাকায় জীবন নির্বাহ করতে হয়। গ্রামবাসীদের আসলে চাই লাভজনক বৃত্তি বা পেশা।

বহিরাগত পণ্য ক্রয় করে আমরা অতি সত্বর তাদের জীবিকা হরণ করি এবং তারপর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তাদেরই ব্যয়ে বক্তৃতা, ম্যাজিক লণ্ঠনের প্রদর্শনী ও বাক্সবন্দী গানের উপহার দিয়ে তাদের খুব উপকার করছি ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করি। এর চেয়ে অবাস্তব আর কি হতে পারে?

মোটর ভ্যানের পরিবর্তে বহুনিন্দিত গো-শকট ব্যবহৃত হলে কি অবস্থা হয় এবার তার তুলনামূলক পর্যালোচনা করে দেখুন। এর ফলে খুব একটা হৈ চৈ বা হট্টগোল হবে না অথবা বিশ্বের কাছে এই বলে ঢাক পিটোবার সুযোগ পাওয়া যাবে না যে, গ্রামের জন্য একটা বিস্ময়কর কিছু করা হচ্ছে। তবে বৃথা আস্ফালন বা ঢাক পিটোনোর পরিবর্তে নিঃসন্দেহে সত্যকার গঠনমূলক কাজ করাই যদি লক্ষ্য হয় তবে আমরা বলব যে, গরুর গাড়ী দ্বারা অপেক্ষাকৃত ভাল কাজ হবে। মোটর লরী দূরতম গ্রামে পৌঁছুতে পারে না; গো-শকট তা পারে। এর মূল্য একটি মোটর ভ্যানের দামের এক ভগ্নাংশ মাত্র। সুতরাং প্রয়োজন হলে একাধিক গো-গাড়ী ক্রয় করা যেতে পারে এবং এইভাবে জেলার একাধিক গ্রামগোষ্ঠীতে কাজ করা যাবে। এই বাবদ ব্যয়িত অর্থ গ্রামের ছুতার, কামার বা গাড়োয়ান পাবে। এর একটি পয়সাও জেলার বাইরে যাবে না। গাড়ীটির চাকা, ধুরা এবং চাকার পাখি ইত্যাদি বিজ্ঞানসম্মত ভাবে তৈরী করালে ওইটিই এক প্রদর্শনীয় বস্তু হবে। এসব বাবদ যা ব্যয় হবে সেই অর্থ গ্রামের বাইরে যাবার পরিবর্তে গ্রামেই অর্থাগম হবে। গতিই যে-কাজের একমাত্র বিবেচ্য বিষয়, সেখানে মোটর গাড়ীর প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু গ্রামের মঙ্গল বিধানার্থ প্রচারকার্য সম্বন্ধে এ-জাতীয় কিছু দাবি করা চলে না। পক্ষান্তরে এ ক্ষেত্রে ধীর অথচ দৃঢ় কর্ম-প্রণালীরই সমধিক সার্থকতা। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে না বেড়িয়ে প্রত্যেকটি গ্রামে কিছু কিছু সময় অতিবাহিত করা বেশী লাভজনক। এই ভাবেই কেবল জনগণের জীবন ও তার সমস্যাবলীর সম্যক্ উপলব্ধি সম্ভব এবং ওই সব সমস্যার

সমাধানার্থ গৃহীত কর্মপরিকল্পনা এইভাবেই অধিক কার্যকর হতে পারে।

অতএব পল্লীসেবা ও মোটর ভ্যান একযোগে চলতে পারে না —এ কথা বোঝা যাচ্ছে। আজকের প্রয়োজন নিয়মিত গঠনমূলক কর্মপ্রচেষ্টার; বিদ্যুৎগতি ও শূন্যগর্ভ আড়ম্বরের কোন মূল্য নেই এখন। লোকাল বোর্ড বা অন্য যে সব সার্বজনীন প্রতিষ্ঠান সত্য-সত্যই গ্রামের কল্যাণের জন্য আগ্রহান্বিত, একমাত্র গ্রামজ পণ্য ব্যবহার করে তাঁদের আমরা এ কাজের সূত্রপাত করতে বলব। যেসব কারণের জন্য গ্রামে দ্রুতগতিতে বেকারত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে তা তাঁদের অনুধাবন করতে হবে এবং একে একে ওই সব কারণ দূর করার কাজে তাঁদের শক্তি নিয়োগ করতে হবে। গ্রামজীবনের প্রতিটি বিভাগে যখন ব্যাপক ও সুচিন্তিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন তখন রাতারাতি পল্লী-উন্নয়নের অসম্ভাব্য পরিকল্পনার পিছনে অর্থ বিনিয়োগ করা সর্বসাধারণের টাকা পয়সার অপচয় করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আশা করি যাঁরা গ্রামোন্নয়নের ব্যাপারে আগ্রহশীল তাঁরা গো-শকটের সপক্ষে উপস্থাপিত এই সুনিপুণ যুক্তি সমূহ স্মরণ রাখবেন। গ্রামের কল্যাণার্থ যে প্রতিষ্ঠানের জন্ম, সে প্রতিষ্ঠানের দ্বারা গ্রামীণ ব্যবস্থা ধ্বংস করা এক নিষ্ঠুর ব্যাপার হবে।

হরিজন, ১৬-৯-১৯৩৯

গ্রামের পশুধন

সমস্ত দেশের গ্রামাঞ্চলে বলদই পরিবহণ কার্যের প্রধান সহায় এবং সিমলার মত স্থানেও এর ব্যতিক্রম হয় নি। রেলে বা মোটরে করে অবশ্য সিমলা যাওয়া যায়; কিন্তু পার্বত্য পথের সর্বত্র আমি

পরিপূর্ণভাবে বোঝাই করা গাড়ীর জোয়াল কাঁধে বলদকে উপর-নীচ করতে দেখেছি। মনে হয় এই পরিবহণ ব্যবস্থা আমাদের জীবন ও সভ্যতার অপরিহার্য অঙ্গ। আমাদের চারুশিল্প-আধারিত সভ্যতাকে বজায় রাখতে হলে দেশের বলদগুলিকেও রক্ষা করতে হবে।

কার পশুধন সব চেয়ে ভাল তা আপনাদের খুঁজে বার করতে হবে এবং দেখতে হবে কি করে তিনি তাঁর পশুকে ওই রকম ভাল রাখেন। কার গরু সব চেয়ে বেশী দুধ দেয় এবং কি ভাবে তিনি গরুর সেবাযত্ন করেন, কি কি খেতে দেন, তাও আপনাদের দেখতে হবে। গ্রামের মধ্যে সেরা বলদ ও গরুর জন্য আপনারা কোন রকম পুরস্কার দেবার ব্যবস্থাও করতে পারেন। আদর্শ গৃহপালিত পশু ব্যতিরেকে আদর্শ গ্রাম হতে পারে না।

হরিজন, ১২-৯-১৯৪০

১০

গ্রামীণ স্বায়ত্ত-শাসন

পঞ্চায়েত

পঞ্চায়েত শব্দটিতে প্রাচীনত্বের আভাস আছে, আর শব্দটি চমৎকারও বটে। এর আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে গ্রামের পাঁচজন নির্বাচিত প্রতিনিধি-পরিষদ্। এই প্রথায় ভারতবর্ষের অসংখ্য গ্রাম্য সাধারণ-তন্ত্র পরিচালিত হয়ে এসেছে। কিন্তু ইংরেজ সরকার তাদের রাজস্ব উশুল করার নিখুঁত অথচ নির্মম পদ্ধতির চাপে পুরাকালের এই গ্রাম্য সাধারণতন্ত্রগুলিকে একরকম চুরমার করে দিয়েছে। গ্রাম্য সাধারণ-তন্ত্রগুলি রাজস্ব আদায়ের এই প্রচণ্ড চাপ সহ্য করতে পারে নি। কংগ্রেসকর্মীরা এখন গ্রামের বয়োবৃদ্ধদের দেওয়ানী ও ফৌজদারী অধিকার দিয়ে এই প্রথাকে পুনরুজ্জীবিত করার একটা মোটামুটি চেষ্টা করছেন। এ প্রয়াসের সূত্রপাত হয় ১৯২১ সনে। তখন তা সফল হয় নি। আবার নূতন করে চেষ্টা আরম্ভ হয়েছে। তবে সুন্দর ও বিধিবদ্ধ ভাবে—বিজ্ঞানসম্মতভাবে কথাটা না হয় না-ই প্রয়োগ করলাম—এ কাজে হাত না দিলে এবারকার প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হতে বাধ্য।

নৈনিতালে আমি খবর পেলাম যে, উত্তর প্রদেশের কোন কোন জায়গায় এমন কি নারীধর্ষণের মত ফৌজদারী মামলাও এইসব তথা-কথিত পঞ্চায়েতের হাতে বিচারের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। অজ্ঞ বা পক্ষপাত দোষে দুষ্ট পঞ্চায়েত কোন কোন ক্ষেত্রে কী অদ্ভুত ধরনের রায় দিয়েছে তার কথাও আমার কানে এসেছে। এ সব যদি সত্য হয় তা হলে অত্যন্ত খারাপ বলতে হবে। ত্রুটীপূর্ণ পঞ্চায়েত নিজের ভারে নিজেই চাপা পড়ে মরবে। সুতরাং গ্রামসেবকদের পরিচালনার জন্য আমি নিম্নলিখিত নিয়মাবলীর সুপারিশ করছি :

১) প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে কোন পঞ্চায়েত গড়া হবে না।

২) পঞ্চায়েতের নির্বাচনের জন্য ঢোল-শহরৎ দ্বারা প্রচার করে যে বিশেষ জনসভা আহ্বান করা হবে তাতে পঞ্চায়েতের সদস্যদের নির্বাচিত হতে হবে।

৩) তহশিল কমিটী এই পঞ্চায়েতকে সুপারিশ করবে।

৪) এ সব পঞ্চায়েতের কোন ফৌজদারী অধিকার থাকবে না।

৫) এই পঞ্চায়েত দেওয়ানী মোকদ্দমা বিচারের ভার নেবে—অবশ্য বিবদমান পক্ষ সমূহ যদি চায় কেবল তা হলেই।

৬) পঞ্চায়েতে কোন মোকদ্দমা দিতে কাউকে বাধ্য করা চলবে না।

৭) জরিমানা করার কোন অধিকার পঞ্চায়েতের থাকবে না। এর দেওয়ানী রায়ের পিছনে কেবল নৈতিক শক্তির বল থাকবে। কঠোর নিরপেক্ষতা ও সংশ্লিষ্ট পক্ষদের আনুগত্য হবে এর বৈশিষ্ট্য।

৮) আপাতত সামাজিক বা অপর কোন ধরনের বয়কটের কথা চিন্তা করা হবে না।

৯) প্রত্যেকটি পঞ্চায়েতকে নিম্নলিখিত কাজগুলি করতে হবে:

ক) গ্রামের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা; খ) গ্রাম সাফাই; গ) গ্রামবাসীর চিকিৎসা; ঘ) গ্রামের পুকুর ও কুয়া পরিষ্কার রাখা; ঙ) তথাকথিত অস্পৃশ্যদের উন্নতি বিধান ও তাদের নিত্যকার অভাব-অভিযোগের নিরাকরণ।

১০) নির্বাচিত হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে কোন পঞ্চায়েত যদি উপযুক্ত কারণ ছাড়া পূর্বোক্ত কাজগুলি হাতে নিতে না পারে বা অপর কোন কারণে গ্রামের লোকের সদ্ভাব হারায় কিংবা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর বিবেচনামতে কোন কারণে নিন্দার্হ বলে প্রতিপন্ন হয়,

তা হলে সেই পঞ্চায়েত ভেঙে দিয়ে তার স্থলে নূতন পঞ্চায়েতের নির্বাচন করতে হবে।

প্রথমাবস্থায় পঞ্চায়েতকে জরিমানা বা সামাজিক বয়কট করার অধিকার না দেওয়া খুবই দরকার। গ্রামে অজ্ঞ ও অসৎ ব্যক্তিদের হাতে সামাজিক বয়কট এক বিপজ্জনক অস্ত্র হয়ে উঠতে দেখা গেছে। আর জরিমানা করার অধিকারের ফলেও নানাবিধ অসাধুতা দেখা দিতে পারে এবং অবশেষে পঞ্চায়েতের মূল আদর্শই ভ্রষ্ট হয়ে যেতে পারে। যেখানকার পঞ্চায়েত সত্যসত্যই জনপ্রিয় ও পূর্বোক্ত ধরনের গঠনমূলক কাজ করে নিজেদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করে, সেখানে দেখা যাবে যে পঞ্চায়েতের নৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তির জন্যই লোকে এর কর্তৃত্ব ও বিচার মেনে নেবে। আর সত্যি কথা বলতে কি, এই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তৃত্ব যা মানুষের অধিগত হতে পারে, আর এই কর্তৃত্ব থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যায় না।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৮-৫-১৯৩১

আউন্ধের গ্রামীণ গণতন্ত্র

ক্ষুদ্রায়তন আউন্ধকে কে না চেনে? আয়তন ও আয়ের দিক থেকে আউন্ধ ক্ষুদ্র রাজ্য, কিন্তু আউন্ধের রাজা অযাচিতভাবে তত্রস্থ জনসাধারণকে পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার দেওয়ায় আউন্ধ মহান্ ও বিখ্যাত হয়ে গেছে। ওই রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী আপ্পাসাহেব পন্থ এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্বন্ধে নয় পৃষ্ঠার একটি মনোজ্ঞ পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন। পুস্তিকাটি থেকে নিম্নলিখিত অংশ তুলে দেওয়া হচ্ছে:

> নূতন সংবিধানের আধার হচ্ছে গ্রামীণ গণতন্ত্র। গ্রামের প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি পাঁচজন সদস্য বিশিষ্ট একটি পঞ্চায়েতের

নির্বাচন করেন। পঞ্চায়েতের এই সদস্যরা সর্বসম্মতিক্রমে নিজেদের ভিতর একজনকে সভাপতি রূপে নির্বাচন করেন। আর পঞ্চায়েতের সদস্যদের মধ্যে এ. বিষয়ে মতভেদ হলে গ্রামের প্রত্যেকটি প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি এঁদের মধ্য থেকে কাউকে সভাপতি পদের জন্য নির্বাচন করেন।

এইরূপে বিধিবদ্ধভাবে নির্বাচিত পঞ্চায়েত-সভাপতিদের নিয়ে কোন এক এলাকার তালুক-পঞ্চায়েতের সৃষ্টি হয়। তালুক-পঞ্চায়েত যে টাকা পয়সা পায় তা কি ভাবে খরচ করা হবে এটা স্থির হয় তালুক পঞ্চায়েতের সভায়। তালুক থেকে যত রাজস্ব আদায় হয়, প্রায় তার অর্ধেক এই সব তালুক পঞ্চায়েতকে দেওয়া হয়। গ্রাম তার নিজস্ব বাজেট তৈরি করে তাদের পঞ্চায়েতের সভাপতির মারফত তালুক-পঞ্চায়েতে দাখিল করে। তালুক-পঞ্চায়েতে এর আলোচনা হয়, তারপর সেই আলোচনার ভিত্তিতে সমগ্র তালুকের বাজেট তৈরী হয়। গ্রামবাসীরা যে অর্থ পান তা নিজেদের অভিরুচি অনুসারে ব্যয় করতে পারেন। এখনও পর্যন্ত অবশ্য শিক্ষা ও পথঘাট নির্মাণ ও নদী নালা বাঁধার কার্যই অর্থব্যয়ের দৃষ্টি থেকে প্রধান স্থান লাভ করেছে।

ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যরা কেবল যে কেন্দ্রীয় সরকারের কার্য-কলাপ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল তাই নয়, তারা গ্রামের দৈনন্দিন কাজকর্মের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং তালুক-পঞ্চায়েতের সভায় যোগদান করে তাঁরা অন্যান্য গ্রামের খবরাখবরও পেয়ে থাকেন। পরিষদ সদস্যদের এই ভাবে দিনে প্রায় বার ঘণ্টা কর্মব্যস্ত থাকতে হয়। বিশেষ কোন দলের হয়ে বিশেষ কোন দাবি নিয়ে পরিষদের সদস্যপদপ্রার্থী রূপে দাঁড়ানোর ও নির্বাচিত হবার পর পর-বর্তী নির্বাচন পর্যন্ত সে সব ব্যাপার ভুলে থাকলে তাঁর চলে না। তাঁকে সর্বদা গ্রামবাসীদের সম্মুখীন হতে হয়। সংবিধানে গ্রাম-বাসীদের এই অধিকার দেওয়া আছে যে, তাঁরা উচিত বোধ করলে কোন সদস্যকে পদত্যাগে বাধ্য করতে পারবেন। ভোটদাতাদের চার-পঞ্চমাংশের ইচ্ছা হলে পঞ্চায়েতের নূতন নির্বাচন করতে হবে।

গ্রামের বিচার-ব্যবস্থা পঞ্চায়েতের হাতে। মোকদ্দমার শুনানীর জন্য গ্রামবাসীদের আর খরচ করে গ্রামের বাইরে মহকুমা শহরে যেতে হয় না। পঞ্চায়েত ঘটনাস্থলেই মামলার বিচার করে। কৃষক তার সাক্ষীদের গ্রামের ভিতরই পেয়ে যায়। যেসব মামলা জটিল ধরনের এবং যার মধ্যে আইনের সূক্ষ্ম বিধিবিধান থাকে তার বিচারের ব্যাপারে গ্রাম পঞ্চায়েতকে সাহায্য করার জন্য একজন সাব-জজ গ্রামে যান। সাব-জজ মহোদয় পঞ্চায়েতকে কেবল তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান দ্বারাই সাহায্য করেন না, তিনি অজ্ঞ কৃষকদের তাদের আইনসঙ্গত অধিকার রক্ষায় বুদ্ধি-পরামর্শ দেন। নচেৎ গ্রামের কায়েমীস্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তি ও গুণ্ডারা তাদের ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করতে পারে।

তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, আউন্ধের ন্যায় বিচার স্বল্প ব্যয়ে দ্রুত পাওয়া যায় এবং সেইজন্য তা অতীব কার্যকর হয়। শুধু দুটি তালুকের পঞ্চায়েত ১৯০টি ফৌজদারী ও দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার করেছে। শতকরা ৭৫টি দেওয়ানী এবং ৫০টি ফৌজদারী মামলায় উকিল নিযুক্ত করার প্রয়োজন ঘটে নি। আর সাক্ষীরা অকুস্থলে ছিল বলে তাদের জন্যও কিছু খরচ হয় নি। এই ভাবে সময় এবং অর্থ দুইয়েরই সাশ্রয় হয়েছে। অধিকাংশ মামলার নিষ্পত্তি প্রথম শুনানীতেই হয়ে গেছে। মামলার শুনানীর সময় গ্রামের সকলে হাজির থাকেন। সেইজন্য মামলাতে কদাচিৎ কেউ মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকে; কারণ মিথ্যা বললেই ধরা পড়ার সম্ভাবনা। এই সব কারণে অনেক মামলা আদালতের বাইরে আপোষে রফা হয়ে যায়। এই পদ্ধতিতে ন্যায়বিচার সম্পাদন করাটাই এক উঁচুদরের প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা বলতে হবে।

৭২টি গ্রামে ৮৮টি পাঠশালা আছে। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার দেবার পর তাদের ভিতর শতকরা ৩৫ জন শিক্ষা পেয়েছে। বুনিয়াদী শিক্ষা বা শরীরচর্চা কোনটিই অবহেলা করা হয় নি।

এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভাল দিকটি দেখিয়েই আপ্পাসাহেব ক্ষান্ত হন নি, এর অসুবিধার কথাও তাঁর নজর এড়ায় নি। আমি এগুলিকে হিসাবের মধ্যে ধরছি না। কারণ এই-জাতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এমন সব বাধা-বিপত্তি দেখা দিয়েই থাকে। জনসাধারণের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মনে যদি বিশ্বাস থাকে তা হলে নিশ্চয় তাঁরা এ সব জয় করতে পারবেন।

হরিজন, ১১-৮-১৯৪০

স্বাধীনতা

স্বাধীনতার অর্থ ভারতের জনগণের অধীনতা-বন্ধন-মুক্তি। আজ যাঁরা তাঁদের শাসন করছে, কেবল তাঁরা স্বাধীন হলে এ লক্ষ্য সাধিত হবে না। শাসকরা তাঁদের পদানত জনসাধারণের ইচ্ছার উপর নির্ভর করবেন। সুতরাং তাঁদের জনসাধারণের সেবক, জনসাধারণের ইচ্ছাপূরণকারী হতে হবে।

স্বাধীনতার সূত্রপাত হবে নিচে থেকে। এতদনুযায়ী প্রতিটি গ্রাম পূর্ণক্ষমতাবিশিষ্ট এক একটি সাধারণতন্ত্র বা পঞ্চায়েত হবে। তা হলে বোঝা যাচ্ছে যে, প্রতিটি গ্রামকে আত্মনির্ভর হতে হবে। নিজেদের কাজকর্ম নিজেরাই করে নেবার ব্যাপারে তাঁদের এতটা প্রস্তুতি রাখতে হবে যে প্রয়োজন হলে তাঁরা যেন সমগ্র বিশ্বের আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করতে পারেন। বাইরে থেকে যে কোন রকমের আক্রমণই হোক না কেন, তার প্রতিরোধ, এমনকি সে প্রচেষ্টায় প্রাণ বিসর্জন দেবার জন্য গ্রামকে শিক্ষা দিতে হবে। সুতরাং শেষ অবধি ব্যক্তিই হল এসবের একম্। তবে এর অর্থ এই নয় যে, প্রতিবেশী বা পৃথিবার অপর কারও কাছ থেকে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত সাহায্য নেওয়া হবে না, অথবা তাদের উপর কোন ব্যাপারেই নির্ভর করা হবে না।

পারস্পরিক আদান-প্রদানের অবাধ লেনদেন চলবে। স্বভাবতঃই এই রকম সমাজের সাংস্কৃতিক মান অত্যন্ত উচ্চ। এ সমাজের প্রতিটি নরনারী নিজেদের চাহিদা কি তা জানে এবং তার চেয়েও বড় কথা, অপরে অনুরূপ শ্রম দ্বারা যা পায় না তা কারও চাওয়া উচিত নয়—এ কথাও তাদের কাছে বিদিত।

এই সমাজকে সত্য ও অহিংসার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে আর আমার মতে ঈশ্বরে জীবন্ত বিশ্বাস ছাড়া এ সম্ভব নয়। ঈশ্বর বলতে আমি এক স্বয়ম্ভু, সর্বব্যাপী সর্বজ্ঞ চৈতন্যশক্তিকে বুঝাতে চাইছি। এমন এক শক্তি, যার সঙ্গে বিশ্বের তাবৎ শক্তি দৃঢ়সংবদ্ধ এবং যা কারও উপর নির্ভরশীল নয়। পৃথিবীর সকল শক্তির অস্তিত্ব ও ক্রিয়াকলাপ বিলুপ্ত হয়ে গেলেও এই শক্তি যথাপূর্ব ক্রিয়াশীল থাকবে। এইরূপ সর্বত্রব্যাপী জীবন্ত আলোকের প্রতি বিশ্বাস ব্যতিরেকে আমার জীবনের কোন অর্থ আছে বলে মনে করতে পারি না।

অসংখ্য গ্রাম দ্বারা নির্মিত এই কাঠামো নিয়তপরিবর্ধনশীল গ্রাম-গোষ্ঠী নিয়ে রচিত হবে। কাঠামোটির ঝোঁক থাকবে ব্যাপ্তির দিকে, ঊর্ধ্বমুখে নয়। জীবন এখানে পিরামিডের মত হবে না, যার চূড়া দাঁড়িয়ে থাকে তলদেশের শক্তিতে। এ হবে এক সামুদ্রিক বেষ্টনীর মত, যার কেন্দ্র হবে প্রতিটি ব্যক্তি। এই সব ব্যক্তি গ্রামের জন্য এবং এই গ্রামগুলি গ্রামগোষ্ঠীর জন্য আত্মত্যাগে সর্বদাই প্রস্তুত থাকবে। ব্যক্তিসমষ্টি দ্বারা গঠিত এই কাঠামো অবশেষে এইভাবে একটি মাত্র সত্তায় পরিণত হবে। উদ্ধত হয়ে এরা কখনও অপরের উপর চড়াও হবে না বরং মহাসাগর রূপ গ্রামগোষ্ঠীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হওয়ায় তারা সর্বদাই বিনয়ী হবে।

সুতরাং সর্ববহিঃস্থ বেষ্টনী-রেখা আভ্যন্তরীণ বেষ্টনীকে চূর্ণ করার জন্য তার শক্তি প্রয়োগ করবে না, বরং ভিতরের মণ্ডলীগুলিতে শক্তি সঞ্চার করবে এবং নিজেও তাদের কাছ থেকে শক্তি পাবে। আমাকে

হয়তো শ্লেষভরে বলা হবে যে, এ সবই অবাস্তব কল্পনা, সুতরাং এ নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। কোন মানুষের পক্ষে ইউ-ক্লিডের সংজ্ঞার্থ অনুযায়ী বিন্দু অঙ্কন করা সম্ভব না হলেও এর মূল্য অপরিসীম। এইভাবে আমি যে চিত্রের চিত্রণ করেছি, মনুষ্য জাতির অস্তিত্বের জন্য তারও একটা নিজস্ব মূল্য আছে। পরিপূর্ণভাবে একে সাকার করা সম্ভব না হলেও ভারতবর্ষ যেন এই চিত্রকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্যই জীবন ধারণ করে। আদর্শের মোটামুটি সমীপবর্তী হবার পূর্বে কী আমরা চাই তার সম্বন্ধে একটা সম্যক্ ধারণা থাকা প্রয়োজন। ভারতের প্রতিটি গ্রামে যদি কোন দিন এক-একটি সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হয় তা হলে আমি যে চিত্র উপস্থাপিত করেছি তার যথার্থতা সপ্রমাণ হবে। আমার কল্পনার এই আদর্শ স্থিতিতে সর্বনিম্নের মানুষটি সর্বোচ্চ ব্যক্তির সমান হবে, এক কথায় বলতে গেলে এখানে কেউ বড় বা কেউ ছোট থাকবে না।

এই চিত্রে সকল ধর্মের পরিপূর্ণ মর্যাদা থাকবে এবং তাদের সমান স্থান হবে। আমরা সকলে এক বিরাট মহীরুহের পত্রগুচ্ছ। এই বৃক্ষের শিকড় মৃত্তিকা-গর্ভে বহুদূর চলে গেছে বলে এর কাণ্ডকে উৎপাটিত করা অসম্ভব। প্রবল ঝঞ্ঝাও একে স্থানচ্যুত করতে অপারগ।

আমার এই আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থায় এমন কোন যন্ত্রের স্থান নেই যা মানুষকে বেকার করে দেয় এবং অল্প কয়েকজনের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রিত করে। সুসংস্কৃত মানব পরিবারে শ্রমের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। মানুষের সাহায্যকারী প্রতিটি যন্ত্রকে উপযুক্ত স্থান দেওয়া হবে। তবে আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, কোন্ কোন্ যন্ত্র এই ভাবে মানুষকে সাহায্য করতে পারবে আমি ধীরভাবে বসে এখনও তার কোন তালিকা তৈরি করে উঠতে পারি নি।

হরিজন, ২৮-৭-১৯৪৬

পঞ্চায়েত প্রসঙ্গে

শনিবারের সান্ধ্য প্রার্থনা-সভা সামলকা নামক গ্রামে হল। ওই গ্রামে একটি পঞ্চায়েত ঘর তৈরী হয়েছিল। পঞ্চায়েত ঘর তৈরী করার জন্য গান্ধীজী গ্রামবাসীদের প্রশংসা করলেন। তবে তিনি এ কথাও বললেন যে, পঞ্চায়েতের কাজকর্ম না করলে তাদের এই চেষ্টা সময় ও শ্রমশক্তির অপচয় বলে গণ্য হবে। পুরাকালে চীন ও অন্যান্য দেশ থেকে বহু বিশিষ্ট পরিব্রাজক ভারতবর্ষে আসতেন। জ্ঞানের সন্ধানে তাঁরা বহু কষ্ট স্বীকার করে এ দেশে এসেছিলেন। তাঁরা এই বিবরণ রেখে গেছেন যে, ভারতবর্ষে চুরি অজ্ঞাত ছিল এবং এ দেশবাসী সৎ ও পরিশ্রমী ছিল। সে সময় ঘরের দরজায় তালা লাগানোর প্রয়োজন হত না। আজকের মত তখন এত অসংখ্য জাতির অস্তিত্ব ছিল না। এই সততা ও শ্রমনিষ্ঠা পঞ্চায়েতে ফিরিয়ে আনতে হবে। এক বৎসর পর তিনি যদি আবার ওই গ্রামের অধিবাসীদের প্রশ্ন করেন তা হলে তাঁরা কি বলতে পারবেন যে, তাঁদের পূর্ব বৎসরের ইতিহাস অকলঙ্কিত? তাঁরা কি গৌরবভরে এ কথা ঘোষণা করতে পারবেন যে, পঞ্চায়েত ছাড়া তাঁরা অপর কোন আদালতের শরণ নেন নি? পঞ্চায়েত যদি বিবাদ-বিসম্বাদের নিষ্পত্তি করতে চায় তা হলে বিবাদ এড়ানোর শিক্ষা গ্রামবাসীদের দেওয়াও পঞ্চায়েতের কর্তব্য। এর ফলে কোনরকম অর্থব্যয় ব্যতিরেকে দ্রুত ন্যায়বিচার লাভের নিশ্চয়তা পাওয়া যাবে। আর তাই পুলিশ বা সৈন্যবাহিনীরও প্রয়োজন পড়বে না।

পঞ্চায়েতকে এর পর গ্রামের পশুর উন্নতির কাজ হাতে নিতে হবে। গোরুর দুধের পরিমাণ ক্রমশঃ যেন বাড়তে থাকে। যত্ন না নেওয়ার জন্য আমাদের পশুগুলি ভূমির উপর ভার স্বরূপ হয়ে পড়েছে। গো-বধের জন্য মুসলমানদের দোষ দেওয়া নিতান্ত অজ্ঞতার

পরিচায়ক। গান্ধীজীর মতে হিন্দুরাই গোরুর প্রতি দুর্ব্যহার ক'রে তিলে তিলে গো-জাতির বিনাশ করছে। সরাসরি মেরে ফেলার চেয়ে উৎপীড়ন করে ধীরে ধীরে মারা অনেক বেশী বীভৎস ব্যাপার। গ্রামে খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধিও পঞ্চায়েতের অন্যতম কর্তব্য হওয়া উচিত। জমিতে উপযুক্ত সার দিলে এ হওয়া সম্ভব। পশু পক্ষী এবং মানুষের মলমূত্রকে আবর্জনার সঙ্গে মিলিয়ে মুল্যবান সারে রূপান্তরিত করা যায়। এই সারে জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়। এ ছাড়া গ্রামের সাফাই ও গ্রামবাসীদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপরও নজর দিতে হবে। গ্রামবাসীদের শরীর ও মন দুইই যেন শুদ্ধ হয়।

গান্ধীজী আশা করেন যে, তাঁদের গ্রামে কোন চলচ্চিত্র গৃহ তৈরী হবে না। অনেকে বলে থাকেন যে, চলচ্চিত্র জনশিক্ষার এক শক্তিশালী বাহন। ভবিষ্যতে হয়তো এ কথা সত্য বলে প্রমাণিত হতে পারে; কিন্তু এই মুহূর্তে চলচ্চিত্র দেশের কী ক্ষতি করছে তা তিনি দেখতেই পাচ্ছেন। গ্রামের লোক অনেক দেশী খেলাধুলা জানেন। গ্রাম থেকে নেশা-ভাঙের বদভ্যাস চলে যাওয়া উচিত। আর তাঁদের গ্রামে এখনও যদি অস্পৃশ্যতার কোন চিহ্ন থেকে থাকে তাও তাঁরা দূর করবেন বলে গান্ধীজী আশা করেন। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, পার্শী ও খ্রীষ্টানরা যেন ভাইয়ের মত থাকেন। তিনি যে সব কথা বললেন তা যদি গ্রামবাসীরা করে দেখাতে পারেন তা হলে সত্যিকার স্বাধীনতা মূর্ত হয়ে উঠবে এবং ভারতবর্ষের সকল প্রান্ত থেকে মানুষ তাদের আদর্শ গ্রাম দেখতে ও তার থেকে প্রেরণা লাভ করতে আসবে।

হরিজন, ৪-১-১৯৪৮

পঞ্চায়েত রাজ

ভারতের সত্যকার গণতন্ত্রের একম্ হচ্ছে গ্রাম। একটি গ্রামও যদি পঞ্চায়েত রাজ বা সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তা হলে কারও তাকে বাধা দেবার ক্ষমতা নেই। জনা বিশেক লোক কেন্দ্রে বসে সত্যকার গণতন্ত্রকে রূপ দান করতে পারেন না। নিচে থেকে প্রতিটি গ্রামের জনসাধারণকে দিয়ে একে মূর্ত করে তুলতে হবে।

হরিজন, ১৮-১-১৯৪৮

১১

গ্রামের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা

শান্তি সেনা

কিছু দিন পূর্বে আমি শান্তি সেনার সংগঠন করার কথা বলেছিলাম। এর সদস্যরা দাঙ্গা, বিশেষতঃ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, নিবারণের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করবে। আমার মনে এই পরিকল্পনা ছিল যে, এই ধরনের শান্তি সেনাবাহিনী প্রতিষ্ঠিত হলে পুলিশ, এমনকি সৈন্য বাহিনারও আর প্রয়োজন থাকবে না। এ কথা খুব উচ্চাশার পরিচায়ক মনে হতে পারে। এর পরিপূর্তি সম্ভব নাও হতে পারে। তবে কংগ্রেসকে যদি তার অহিংস সংগ্রামে জয়ী হতে হয় তবে এই-জাতীয় পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ উপায়ে সামলানোর ক্ষমতা তাকে গড়ে তুলতে হবে।

তা হলে এবার দেখা যাক যে প্রস্তাবিত শান্তি সেনার সদস্যদের কি কি গুণ থাকা দরকার।

(১) অহিংসায় তাঁর জীবন্ত বিশ্বাস থাকা চাই। ঈশ্বরের উপর পরিপূর্ণ আস্থা ছাড়া এ সম্ভব নয়। ভগবানের কৃপা এবং শান্তি ছাড়া কোন অহিংস ব্যক্তি কিছুই করতে পারেন না। ঈশ্বরানুগ্রহ ব্যতিরেকে তিনি ক্রোধ, ভয় এবং প্রতিহিংসাবৃত্তিশূন্য হয়ে মরতেও পারবেন না। ঈশ্বর সকলের হৃদয়ে বিরাজমান এবং তাই তাঁর উপস্থিতিতে ভয়ের কোন কারণ নেই—এই বিশ্বাস থেকে পূর্বোক্ত সাহসের জন্ম হয়। ঈশ্বরের সর্বব্যাপী অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানের অর্থ হচ্ছে তথাকথিত বিরোধী পক্ষ বা গুণ্ডাদের জীবনকেও সম্মান করা। মানুষের ভিতরকার পশু-স্বভাব যখন প্রবল হয়ে ওঠে তখন তার ক্রোধের উপশম করার জন্য পূর্বোক্ত পদ্ধতি খুবই সহায়ক হয়।

(২) শান্তিদূত পৃথিবীর সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল হবেন। অর্থাৎ তিনি যদি হিন্দু হন তা হলে ভারতের অন্যান্য ধর্মমতকেও তিনি শ্রদ্ধা করবেন। সুতরাং তাঁকে এ দেশের বিভিন্ন ধর্মের মূলসূত্রগুলি জানতে হবে।

(৩) সাধারণতঃ শান্তি স্থাপনা করার এই কাজ স্থানীয় লোকদের পক্ষে নিজ নিজ এলাকাতেই করা সহজ।

(৪) একক ভাবে বা দলবদ্ধ হয়ে এ কাজ করা যায়। সুতরাং কেউ যেন সঙ্গীসাথীর জন্য অপেক্ষা না করেন। তবে নিজের পাড়ায় সঙ্গীসাথী জুটাতে চাওয়া স্বাভাবিক এবং এইভাবে সঙ্গীসাথী জুটিয়ে শান্তি সৈনিকের একটি দল খাড়া করার চেষ্টা অবশ্য করতে হবে।

(৫) শান্তিদূত নিজের পাড়া বা কর্মক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সেবা-কার্য দ্বারা জনসংযোগ করতে থাকবেন। এতে লাভ হবে এই যে, কোন বিসদৃশ পরিস্থিতির উদ্ভব হলে দাঙ্গাকারী জনতা তাঁকে একেবারে অপরিচিত আগন্তুক, সন্দেহভাজন ব্যক্তি বা অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বলে মনে করবেন না।

(৬) এ কথা বলাই বাহুল্য, শান্তি সৈনিকের চরিত্র সন্দেহাতীত হবে এবং পক্ষপাতহীন আচরণের জন্য তাঁর খ্যাতি থাকা চাই।

(৭) সাধারণতঃ বিপদ আসার পূর্বে তার আভাস পাওয়া যায়। এই রকম খবর পাওয়া গেলে শান্তি সেনা আগুন লাগা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন না। পূর্ব থেকেই তাঁরা অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য লেগে পড়বেন।

(৮) শান্তি সেনার আন্দোলনের প্রসার ঘটলে এর জন্য কয়েকজন সর্বক্ষণের কর্মী থাকা ভাল, তবে এ একেবারে অপরিহার্য নয়। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে যথাসম্ভব অধিকসংখ্যক সৎ নরনারীর সমাবেশ করা। এটা তখনই সম্ভব হতে পারে যখন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে এ কাজের জন্য স্বেচ্ছাসেবক পাওয়া যাবে। নিজেদের নিয়মিত

কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে এঁরা অবসর সময় নিজ নিজ এলাকার নর-নারীদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করবেন। অথবা অন্য ভাবেও এঁরা শান্তি সেনার পক্ষে প্রয়োজনীয় যোগ্যতাবলী অর্জন করতে পারেন।

(৯) প্রস্তাবিত শান্তি সেনাদের একটা নির্দিষ্ট পোশাক থাকা দরকার ; তা হলে প্রয়োজনের সময় কোনরকম ঝঞ্ঝাট ছাড়াই এঁদের চিনে বার করা যাবে।

এগুলি হচ্ছে সাধারণ ধরনের সুপারিশ। এর ভিত্তিতে প্রত্যেকটি কেন্দ্র নিজেদের গঠনতন্ত্র তৈরী করে নিতে পারেন।

হরিজন, ১৮-৬-১৯৩৮

অহিংস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী

কিছুদিন পূর্বে আমার আগ্রহে 'শান্তি দল' গঠন করার একটা প্রচেষ্টা হয়েছিল ; তবে তার ফলে বিশেষ কিছু হয় নি। তবে এই প্রচেষ্টা থেকে এই শিক্ষা পাওয়া গেছে যে, স্বভাবতঃই এই রকম দলের সদস্য-সংখ্যা খুব বেশী হবে না। দণ্ডশক্তির উপর আধারিত কোন বৃহৎ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে শৃঙ্খলাভঙ্গের কালে স্বভাবতঃই দণ্ডশক্তির শরণ নেওয়া হবে। ওই-জাতীয় প্রতিষ্ঠানে মানুষের চরিত্রশক্তির উপর নামমাত্র জোর দেওয়া হয়, বা একেবারে দেওয়া হয় না বললেই চলে। শারীরিক বলই ওখানে একমাত্র বিবেচ্য বিষয়। অহিংস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে এর বিপরীত ব্যাপার ঘটবে। এখানে চরিত্র বা আত্মার শক্তিই সবচেয়ে বড় কথা এবং শারীরিক শক্তির স্থান হবে গৌণ। এরকম লোক অধিক সংখ্যায় পাওয়া মুশকিল। এই জন্য অহিংস বাহিনীকে কার্যকুশল হতে হলে সংখ্যায় অল্প হতে হবে। এর সদস্যরা সর্বত্র ছড়িয়ে থাকতে পারেন ; প্রতিটি গ্রাম বা পাড়ায় এক এক জন

শান্তি সৈনিক থাকতে পারেন। তবে তাঁরা একে অপরকে ভাল করে চিনবেন। প্রত্যেকটি দল নিজেদের নায়ক বেছে নেবেন। শান্তি সৈনিকদের দলে অবশ্য প্রতিটি সদস্যই সমমর্যাদাসম্পন্ন ; তবে সকলেই যেখানে এক রকম কাজে নিযুক্ত সেখানে কোন এক জনের নেতৃত্বে বাকী সকলে কাজ না করলে কাজের ক্ষতি হয়। কোন এলাকায় দুই বা তার চেয়ে বেশী শান্তি দল থাকলে তার নেতারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সাধারণ কর্মসূচী গ্রহণ করবেন। একমাত্র এইভাবে কাজ করলে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা।

উপরি-উক্ত পদ্ধতিতে অহিংস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হলে তারা সহজে অশান্তি নিবারণ করতে পারবে। আখড়া ইত্যাদিতে যত রকমের শরীরচর্চা হয় তার সবটুকু এদের প্রয়োজনে না লাগলেও কিছু কিছু কাজে লাগবে।

তবে এই-জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের ভিতর একটি বিষয়ে ঐক্য থাকা চাই—ঈশ্বরের উপর তাঁদের যেন অবিচল আস্থা থাকে। তিনিই একমাত্র সঙ্গী ও কর্মকর্তা। তাঁর উপর বিশ্বাস না থাকলে এই সব শান্তি সৈনিকের দল নিষ্প্রাণ হয়ে পড়বে। ঈশ্বরকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন আমাদের বুঝতে হবে যে, আমরা কেবল তাঁর শক্তির প্রসাদেই কাজ করতে পারি। এই-জাতীয় বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ ব্যক্তি কারও প্রাণনাশ করতে পারেন না। প্রয়োজন হলে তিনি নিজ প্রাণ উৎসর্গ করবেন এবং এই ভাবে মৃত্যুকে জয় করে অমর হবেন।

যাঁর জীবনে এই সত্য জীবন্ত রূপ পরিগ্রহ করেছে, বিপদের সম্মুখীন হলেও তিনি কখনও বিভ্রান্ত হয়ে পড়বেন না। তাঁর স্বজ্ঞা তাঁকে সঠিক পথ বাতলে দেবে। এতৎসত্ত্বেও আমি আমার অভিজ্ঞতালব্ধ কয়েকটি বিধিবিধানের উল্লেখ করছি ঃ

১) অহিংস স্বেচ্ছাসেবক সঙ্গে কোন অস্ত্র রাখবেন না।

২) তাঁদের সহজেই চেনা যাবে।

৩) প্রাথমিক পরিচর্যা করার জন্য প্রত্যেকটি স্বেচ্ছাসেবকের কাছে ব্যাণ্ডেজ, কাঁচি, স্ূঁচ-সুতা ও অস্ত্রোপচার করার ছুরি ইত্যাদি থাকবে।

৪) আহতকে বহন ও স্থানান্তরিত করার প্রক্রিয়া তিনি জানবেন।

৫) অগ্নি নির্বাপণ, স্বয়ং আহত না হওে অগ্নিবেষ্টিত এলাকার মধ্যে প্রবেশ, বিপন্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করার জন্য উচ্চ জায়গায় চড়া ও সেখানে থেকে নিরাপদে নামা ইত্যাদি প্রক্রিয়া তাঁকে জানতে হবে।

৬) নিজের এলাকার সকলের সঙ্গে তাঁর ভাল রকম জানা-শোনা থাকা চাই। কেবল একেই এক রকমের সেবা আখ্যা দেওয়া যায়।

৭) তিনি নিরন্তর মনে মনে রামনাম জপ করবেন এবং অপর যাঁরা এতে বিশ্বাস করেন তাঁদেরও অনুরূপ করতে উদ্বুদ্ধ করবেন।

মানুষ কখনও কখনও তোতা পাখির মত ভগবানের নামোচ্চারণ করে এবং আশা করে যে তাতেই ফল হবে। খাঁটি ভক্তের বিশ্বাস এতটা জীবন্ত হওয়া চাই যার ফলে তাঁর নিজের তোতার মত নামোচ্চারণ করার বৃত্তিই কেবল বিদূরিত হবে না, অপরের হৃদয় থেকেও এই দুর্বলতা দূর করার শক্তি তাঁর হবে।

হরিজন, ৫-৫-১৯৪৬

১২

গ্রামসেবক

গ্রামের কাজ

গ্রামসেবকের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হবে চরখা। খাদি পরিকল্পনার পিছনকার দৃষ্টিকোণ হচ্ছে এই যে, এ শিল্প কৃষির পরিপূরক এবং কৃষির পাশে পাশে এর অবস্থান। যত দিন না দেশের গ্রামগুলি থেকে আলস্যকে নির্বাসিত করা হচ্ছে এবং যতক্ষণ না গ্রামের প্রতিটি ঘরে মৌচাকের মত কর্মগুঞ্জন উঠছে, তত দিন চরখা আমাদের জীবনে যথাযোগ্য স্থান পেয়েছে বলে দাবি করা যাবে না।

গ্রামসেবককে কেবল নিয়মিত চরখা চালালেই হবে না। উদরান্নের জন্য তিনি সূত্রধর, কৃষক অথবা চর্মকারের পেশা গ্রহণ করে তাদের হাতিয়ার নিয়ে কাজ করা আরম্ভ করবেন। নিদ্রা এবং বিশ্রামের জন্য নির্দিষ্ট আট ঘণ্টা ছাড়া দিনের বাদ বাকি সবটুকু সময় তিনি কোন না কোন কাজে মগ্ন থাকবেন। অপচয় করার মত সময় তাঁর থাকবে না। নিজে তিনি তো আলস্যের প্রশ্রয় দেবেনই না, অপর কাউকেও নিষ্কর্মা হয়ে থাকতে দেবেন না। প্রতিনিয়ত আনন্দজনক শিল্প-উদ্যোগে লেগে থাকার জন্য তাঁর জীবন প্রতিবেশীদের কাছে একটা স্থায়ী আদর্শ স্বরূপ হবে। আমাদের বাধ্যতামূলক বা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অলসতার অবসান ঘটাতে হবে। এ না গেলে কোন ওষুধে কোন কাজ হবে না এবং আজকেরই মত আধা-উপবাস আমাদের চির-স্থায়ী সমস্যা হয়ে থাকবে। যিনি দুই দানা খান তাঁকে চার দানা উৎপন্ন করতে হবে। এই নীতিকে বিশ্বজনীন সত্যের মর্যাদা না দিলে জনসংখ্যার যত হ্রাসই হোক না কেন তাতে সমস্যার

সমাধানে কোন সহায়তা মিলবে না। পূর্বোক্ত নীতিকে মেনে নিয়ে যদি তাকে কার্যান্বিত করা যায় তা হলে ভবিষ্যতে আমরা এ দেশে বহু লক্ষ নবজাতকের স্থান সংকুলান করতে পারব।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, গ্রামসেবক কর্মচাঞ্চল্যের জীবন্ত প্রতীক হবেন। কার্পাসের চাষ এবং গাছ হতে তুলা সংগ্রহ থেকে আরম্ভ করে বুনাই পর্যন্ত খাদির যাবতীয় প্রক্রিয়ায় তিনি দক্ষ হবেন এবং এই সব প্রক্রিয়াকে নিখুঁত করে তোলা তাঁর ধ্যান ও জ্ঞান স্বরূপ হবে। এ কাজকে তিনি এক বিজ্ঞান রূপে বিবেচনা করলে তা আর তাঁর বিরক্তিকর মনে হবে না। তিনি তখন এর থেকে নিত্য-নূতন আনন্দ পাবেন; কারণ এর মহান্ সম্ভাবনার কথা তিনি তখন উত্তরোত্তর উপলব্ধি করতে পারবেন। গ্রামে শিক্ষকতার কাজ করার জন্য গেলেও তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ছাত্র হবার জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে। কারণ শীঘ্রই তিনি দেখতে পাবেন যে, সরল গ্রামবাসীদের কাছ থেকেও তাঁর অনেক কিছু শিক্ষণীয় আছে। গ্রামীণ জীবনের যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয়ের মধ্যে তাঁকে প্রবেশ করতে হবে। তিনি গ্রামের বিভিন্ন কুটির শিল্প খুঁজে বার করবেন এবং সেগুলির বিকাশ ও উন্নতির সম্ভাবনা সম্বন্ধে তাঁকে অনুসন্ধান করতে হবে। তিনি হয়তো দেখবেন যে, খাদির বাণীর প্রতি গ্রামবাসীদের কোন আকর্ষণ নেই; কিন্তু নিজের সেবাময় জীবনের দ্বারা তিনি তাঁদের ভিতর আগ্রহ ও মনোযোগ সৃষ্টি করবেন। তবে তাঁকে নিজের শক্তির সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধেও সচেতন থাকতে হবে। এইজন্য কৃষিজীবীদের ঋণের সমস্যা সমাধান করার গুরুদায়িত্ব তিনি নিজের উপর নিতে যাবেন না; কারণ তাঁর পক্ষে এ প্রচেষ্টা নিরর্থক।

গ্রামের সাফাই ও স্বাস্থ্যরক্ষার কার্যক্রম তাঁর মনোযোগের বেশ একটা অংশ পাবার দাবি রাখে। তাঁর নিজের বাসস্থান ও তার চতুর্দিকই কেবল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার আদর্শ হলে চলবে না।

নিজে ঝাড়ু এবং ঝুড়ি হাতে কাজে লেগে পড়ে সমগ্র গ্রামে তিনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার আদর্শ স্থাপন করবেন।

তবে গ্রামে চিকিৎসালয় স্থাপন করে স্বয়ং তিনি তার ডাক্তার হবার চেষ্টা করবেন না। এ সব ফাঁদ এড়িয়ে যাওয়াই বিধেয়। বিগত হরিজন যাত্রার সময় আমি একটি গ্রামে উপস্থিত হয়ে দেখতে পাই যে, আমাদের জনৈক কর্মী সেখানে একটি বিরাট ইমারত বানিয়ে তাতে চিকিৎসালয় স্থাপন করে আশপাশের গ্রামে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করছেন। প্রত্যহ স্বেচ্ছাসেবকরা ঘরে ঘরে ওষুধ পৌঁছিয়ে দিত এবং আমাকে বেশ গর্ব ভরে জানানো হল যে, সেখানে মাসে তেরো শো রোগী আসে। আমাকে স্বভাবতই ওখানকার কাজের তীব্র সমালোচনা করতে হল। কর্মীটিকে আমি জানিয়ে দিলাম যে এ ভাবে গ্রামসেবা হয় না। গ্রামসেবকের কাজ রোগ হবার পর তার চিকিৎসা করা নয়, পরিবর্তে গ্রামবাসীদের রোগ প্রতিরোধ করতে শেখাবার জন্য প্রথম থেকেই স্বাস্থ্য ও সাফাই বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান দেওয়া। তাঁকে আমি ওই প্রাসাদোপম বাড়িটি ছেড়ে দিয়ে কোন কুঁড়েঘরে থাকার পরামর্শ দিই এবং ওই বাড়িটি লোকাল বোর্ডকে ভাড়া দিয়ে দিতে বলি। ওষুধ বলতে গ্রামসেবকের কাছে কুইনাইন, ক্যাস্টর অয়েল এবং আয়োডিন জাতীয় কয়েকটি মাত্র জিনিস থাকাই যথেষ্ট। ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং গ্রামের সাফাই সম্বন্ধে গ্রামবাসীদের সচেতন করা ও যে কোন মূল্যে তা বজায় রাখার উপর গ্রামসেবককে সমগ্র শক্তি সংহত করতে হবে।

এর পর তাঁকে গ্রামের হরিজনদের কল্যাণের কাজে মনোযোগ দিতে হবে। গ্রামসেবকের ঘরের দরজা তাদের কাছে সদা-উন্মুক্ত থাকবে। সত্য কথা বলতে কি, তাঁরা বিপদ-আপদে পড়লে স্বভাবতই সাহায্যের জন্য তাঁর কাছেই আসবেন। অপরাপর গ্রামবাসীরা যদি তাঁর ঘরে

হরিজনদের আসা পছন্দ না করেন তা হলে তিনি হরিজন পল্লীতে গিয়ে ঘর বাঁধবেন।

এবার অক্ষরজ্ঞান দেবার ব্যাপারে কিছু আলোচনা করা যাক। অক্ষরজ্ঞান দেবার প্রয়োজন থাকলেও এর উপর অনাবশ্যক জোর দেবার বিরুদ্ধে আমি আপনাদের সতর্ক করে দিতে চাই। আপনারা এ কথা ধরে নেবেন না যে, গ্রামে শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য প্রথমেই শিশু বা বয়স্কদের লিখতে পড়তে শেখানো দরকার। অক্ষরজ্ঞান হবার পূর্বেই সমসাময়িক ঘটনাবলী, ইতিহাস, ভূগোল এবং অঙ্ক সম্বন্ধে অনেক কিছু মুখে মুখে শেখান যায়। চোখ, কান ও জিভের স্থান হাতেরও আগে। লেখার আগেই মানুষ পড়তে শেখে এবং অক্ষর দেখে দেখে লেখার পূর্বে শিশু অঙ্কনবিদ্যা শিখে যায়। এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার অনুসরণ করলে, শিশুর বোধশক্তি অক্ষরপরিচয়ের মারফত তাকে শিক্ষা দেওয়ার বাঁধাধরা প্রক্রিয়ার তুলনায় অধিকতর বিকশিত হবে।

কর্মীর জীবন গ্রামের জীবনপ্রবাহের সঙ্গে সমান তালে চলবে। গ্রামসেবককে দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে অনাগ্রহী পুস্তককীট হলে চলবে না। পক্ষান্তরে মানুষ তাঁর কাছে গেলেই দেখতে পাবে যে, তিনি চরখা, তাঁত, বাটালী, কোদাল প্রভৃতি তাঁর কাজ করার হাতিয়ারগুলি নিয়ে কর্মব্যস্ত রয়েছেন। তিনি গ্রামবাসীদের তুচ্ছতম কৌতূহলটির জবাব দেবার জন্য ব্যগ্র থাকবেন। উদরান্নের জন্য শ্রম করার উপর তিনি সর্বদা জোর দেবেন। ঈশ্বর প্রত্যেককে নিজ দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তারও অতিরিক্ত দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করার ক্ষমতা দিয়েছেন। সুতরাং মানুষ যদি নিজের উদ্ভাবনা বুদ্ধির প্রয়োগ করে তা হলে তার যোগ্যতার উপযুক্ত (তা যতই কম হোক না কেন) কাজের অভাব হবার কথা নয়। গ্রামবাসী সানন্দে তাঁর ভরণপোষণের ভার নেবে এইটাই স্বাভাবিক। তবে কোন কোন স্থলে হয়তো তাঁকে লোকে

বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ নাও করতে পারে। কিন্তু তা হলেও তাঁকে নিজের কাজ আঁকড়ে থাকতে হবে। সম্ভবতঃ কোন কোন গ্রামে তাঁকে তাঁর হরিজনদের প্রতি অনুকূল মনোবৃত্তির জন্য একঘরে করা হবে। সে ক্ষেত্রে তিনি হরিজনদের শরণ নেবেন এবং খাদ্যের সংস্থানের জন্য তাদের দ্বারস্থ হবেন। পরিশ্রমী লোককে সকলে সাগ্রহে কাজ দিতে চাইবে এবং গ্রামসেবক যদি সততা সহকারে হরিজনদের কাজ করে দেন তা হলে তাদের কাছ থেকে খাদ্য গ্রহণে সংকোচ বোধ করার প্রয়োজন থাকবে না। তবে তিনি যেটুকু নেবেন তার চেয়ে বেশী দিতে হবে। প্রথমাবস্থায় সুবিধা থাকলে তিনি কেন্দ্রীয় কোষ থেকে নিজের জন্য যৎসামান্য মাসোহারা নিতে পারেন।

স্মরণ রাখতে হবে যে, আমাদের হাতিয়ার আধ্যাত্মিক। সূক্ষ্ম-ভাবে প্রযুক্ত হলেও এ শক্তি অপ্রতিরোধ্য। এর প্রগতি গাণিতিক হারে হয় না, হয় জ্যামিতিক গতিতে। পিছনে চালক-চক্র থাকলে এর গতি রুদ্ধ হবার নয়। সুতরাং আমাদের কার্যকলাপের পটভূমিকা যেন আধ্যাত্মিক হয়, এটি দেখতে হবে। আর এরই কারণে আমাদের চরিত্র ও আচরণে নিখুঁত পবিত্রতার প্রয়োজন।

আমাকে যেন এ কথা না বলা হয় যে, এ এক অসাধ্য কর্ম এবং আপনাদের এর উপযোগী গুণাবলী নেই। এ যাবত এ কাজ না করে উঠতে পারা ভবিষ্যতে এ পথে চলার বাধা স্বরূপ হওয়া উচিত নয়। এই কর্মসূচী যদি আপনাদের মতে যুক্তিযুক্ত হয় এবং এ কথা যদি আপনাদের হৃদয়ে সাড়া জাগায় তা হলে আপনাদের দ্বিধা করা সঙ্গত নয়। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্বন্ধে সংকোচ করার কোন কারণ নেই। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলেই উত্তরোত্তর অধিকতর চেষ্টা করার আগ্রহ জাগবে।

হরিজন, ৩১-৮-১৯৩৪

পল্লীগ্রামে তীর্থযাত্রা

শ্রীসীতারাম শাস্ত্রী গ্রামসেবকদের নিয়ে নিকটস্থ পল্লীগ্রামে তীর্থযাত্রায় যাবার এক কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন। আমার মতে এই সব তীর্থযাত্রীদের রেল, মোটর বা এমনকি গোরুর গাড়ীতে করে সফর না করাই ভাল। আমার পরামর্শ গ্রহণ করলে তাঁরা দেখবেন যে, তাঁদের কাজ আরও সুফলদায়ী হচ্ছে এবং এ বাবদ তাঁদের খরচও নামমাত্র হবে। এক-একটি দলে দুই তিন জনের বেশী থাকা উচিত নয়। এর ফলে গ্রামবাসীদের পক্ষে তাঁদের আশ্রয় ও আহার্য দেওয়া সহজ হবে। দলে বেশী লোক থাকলে গ্রামবাসীদের পক্ষে তাঁদের সৎকার করা অপেক্ষাকৃত কঠিন হয়।

এই সব দলের প্রধান কাজ হবে গ্রাম সাফাই ও গ্রামের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা। এ ছাড়া গ্রামবাসীরা খুব বেশী অর্থব্যয় না করেও, অথবা বিনা ব্যয়েই নিজেদের স্বাস্থ্য ও আর্থিক অবস্থার উন্নতি কি ভাবে করতে পারে সে সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞান দেওয়াও এই সব তীর্থযাত্রী গ্রামসেবকদের কাজ হবে।

হরিজন, ২২-৩-১৯৩৫

পুরাতনের বদলে নূতন ?

যথেষ্ট অভিজ্ঞতা না থাকলে কর্মীদের পুরাতন হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি, পুরাতন কর্মপ্রণালী এবং পুরাতন বিধিব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। প্রাচীন পটভূমিকা বজায় রেখে তাদের উন্নতি এবং বিকাশের কথা চিন্তা করাই নিরাপদ হবে। তাঁরা দেখতে পাবেন যে এতেই সত্যকার সাশ্রয় হচ্ছে।

হরিজন, ২৯-৩-১৯৩৫

গ্রামসেবকের প্রশ্ন

জনৈক গ্রামসেবক প্রশ্ন করেছিলেন যে, গ্রামবাসীরা যেখানে দুধ, ফল বা শাকসব্জী ইত্যাদি পায় না, সেখানে গ্রামসেবকের কি এ সব খাওয়া উচিত? এর উত্তরে গান্ধীজী লিখলেন:

গ্রামসেবককে এই মুলমন্ত্র স্মরণ রাখতে হবে যে, গ্রামে যদি তিনি গ্রামবাসীদের সেবার জন্য গিয়ে থাকেন তা হলে যে সব খাদ্য খেলে তাঁর শরীর কাজের উপযুক্ত সুস্থ ও সবল থাকবে, তা তাঁর খাওয়া উচিত। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, গ্রামসেবকের জীবনমান গ্রামবাসীদের তুলনায় উন্নততর হবে। তবে আমার অভিজ্ঞতা এই যে, কর্মীকে এই সব প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য জোগাতে গ্রামবাসীদের তরফে কখনও কোন আপত্তি হয় না। এ বিষয়ে কর্মীর বিবেকই মানদণ্ড। কর্মীর ভিতর সংযম থাকা চাই এবং তিনি রসনার পরিতৃপ্তির জন্য আহার করবেন না ও কোন বিলাস-ব্যসনের প্রশ্রয় দেবেন না। তাঁর জাগরণকালের সবটুকু সেবাকর্মে উৎসর্গীকৃত হবে। এ সত্ত্বেও দুই চার জন হয়তো তাঁর জীবনযাপনপ্রণালীর নিন্দা করতে পারেন। এ রকম সমালোচনা আমাদের সহ্য করতে হবে। আমি যে ভোজ্য তালিকার কথা বলেছি, একটু পরিশ্রম করলে গ্রামে তা না পাওয়া যাবার কথা নয়। দুধ সাধারণতঃ পাওয়া যায় এবং কুল, করমচা, পেয়ারা ইত্যাদি ফল সহজে পাওয়া যায় বলে আমরা তার কদর করি না। গ্রামে এমন অনেক উপকারী শাকপাতা নিজে থেকেই জন্মে থাকে যা আমাদের অজ্ঞতা বা আলস্যের (হয়তো বা উন্নাসিকতার) জন্য আমরা ব্যবহার করি না। আমি স্বয়ং এই-জাতীয় অনেক শাকপাতা এখন খাচ্ছি। পূর্বে কখনও এসব খাই নি; কিন্তু এখন দেখছি এসব ব্যবহার করা উচিত ছিল। গ্রামে গো-পালনের খরচ পুষিয়ে যাওয়া উচিত। অবশ্য আমি এ কাজ করে দেখি নি, তবে মনে হয় যে এ হওয়া

উচিত। আমার এও মনে হয় যে, গ্রামসেবক যা খান, গ্রামবাসীদের পক্ষেও তা খাওয়া অসম্ভব নয় এবং এইভাবে উভয়ের জীবনমান সমান স্তরের হতে পারে।

হরিজন, ২৪-৮-১৯৩৫

গ্রামসেবকদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে

খাদি স্বভাবতই গ্রামীণ শিল্পের কেন্দ্রবিন্দু হবে। তবে মনে রাখবেন যে, আমাদের গ্রামকে খাদির বিষয়ে স্বাবলম্বী করার প্রয়াস করতে হবে। আর স্বাবলম্বী হবার পর যেটুকু খাদি উদ্বৃত্ত হবে তার ব্যবসায় করা যেতে পারে।

গ্রামে আর যে শিল্প চলছে এবং যার বাজার পাওয়া সহজ, তাও হাতে নিতে হবে। শুধু খেয়াল রাখতে হবে এই যে, কুটির-শিল্পজাত পণ্য বিক্রয়ের দোকান চালাতে গিয়ে যেন লোকসান না হয় এবং এমন জিনিস উৎপন্ন না হয় যার চাহিদা নেই। নিজের পছন্দ মত যে কোন কুটির শিল্পের পিছনে দিনে আট ঘণ্টা সময় দিন এবং তারপর গ্রামবাসীদের দেখিয়ে দিন যে ওই কাজ করলে তারাও আট ঘণ্টায় আপনার মত রোজগার করতে পারবে।

আপনাদের সঙ্গে অপর কোন সহকর্মী থাকবে না। একটি বা একাধিক গ্রামের এক একটি এলাকায় আমরা একজন করে কর্মী পাঠানোর নীতি গ্রহণ করেছি। এর ফলে তার বুদ্ধিবৃত্তি পরিপূর্ণভাবে কাজ করার সুযোগ পাবে। তবে গ্রাম থেকে তিনি যত গুলি ইচ্ছা সঙ্গী বেছে নিতে পারেন। এই সব গ্রামের কর্মীরা তাঁর নির্দেশে কাজ করবেন। তবে তাঁর দায়িত্বে যে গ্রাম দেওয়া হবে তার সম্বন্ধে তিনিই দায়ী থাকবেন।

আমরা যেন যন্ত্রযুগের প্রলোভনের পাকে না পড়ি। আমরা

যেন আমাদের দেহযন্ত্রকে কাজের উপযুক্ত নিখুঁত ও দক্ষ সাধনে পরিণত করার উপর মনোযোগ নিবদ্ধ করি। শরীর থেকে যতটুকু পাওয়া যায় তা যেন আমরা নিতে পারি। এই হচ্ছে আপনাদের কর্তব্য। ইতস্ততঃ না করে এগিয়ে চলুন।

হরিজন, ২-১১-১৯৩৫

অলীক ভীতি

অনেক কর্মীর মনে গ্রামীণ জীবন সম্বন্ধে এমন প্রচণ্ড ভয় যে তাঁরা মনে করেন বাইরের থেকে মাসোহারা না পেলে কেবল গ্রামে পরিশ্রম করে তাঁরা নিজেদের প্রতিপালন করতে পারবেন না। বিশেষতঃ কর্মী যদি বিবাহিত হন এবং তাঁর উপর নির্ভরশীল পরিবারের দায়িত্ব যদি তাঁর থাকে তা হলে এ ভয়ের কোন সীমা থাকে না। আমার মতে এ এক আত্ম-অবমাননাকর বিশ্বাস। এ কথা অবশ্য ঠিক যে, গ্রামে যদি কেউ শহুরে মনোবৃত্তি নিয়ে যায় এবং সেখানে যদি সে শহুরে জীবন যাপন করতে চায় তা হলে শহরবাসীদের মত গ্রামবাসীদের শোষণ না করে তার পক্ষে এ-জাতীয় জীবন যাপনের উপযুক্ত যথেষ্ট অর্থ রোজগার করা সম্ভব হবে না। কিন্তু কেউ যদি গ্রামে বসতি স্থাপন করে গ্রামবাসীদের মত জীবন যাপন করতে চায় তা হলে তার পক্ষে পরিশ্রম দ্বারা নিজের উদরান্নের সংস্থান করে নেওয়া খুব কঠিন হবার কথা নয়। তাঁর মনে এইটুকু বিশ্বাস থাকা উচিত, গ্রামবাসীরা যদি তাদের সনাতন ও বুদ্ধির সম্পর্ক রহিত পন্থায় সমগ্র বৎসর কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে, তা হলে তিনিও একজন গড়পড়তা গ্রামবাসীর সমান রোজগার করতে সমর্থ হবেন। আর এ কাজ তিনি করবেন অপর কোন গ্রামবাসীকে বৃত্তিচ্যুত না করেই। কারণ তিনি কারও উপর নির্ভরশীল পরগাছার মত গ্রামে যাবেন না; তিনি যাবেন উৎপাদক রূপে।

কর্মীর পরিবারের আকার মোটামুটি ধরনের হলে তাঁর স্ত্রী এবং বাড়ীর অপর কেউ পূর্ণ সময়ের কর্মী হবেন। এই রকম কর্মীর শুরুতেই যে গ্রামবাসীদের মত পরিশ্রম করার ক্ষমতা থাকবে, তা নয়। তবে তিনি যদি আত্মগ্লানি এবং ভয়ের প্রভাব মুক্ত হন তা হলে তাঁর এই অপূর্ণতার পরিপূর্তি তিনি বুদ্ধি দিয়ে করে নিতে পারবেন। যতক্ষণ না গ্রামবাসীরা তাঁকে তাঁর পূরা সময় গ্রামের সেবায় দিতে বলছেন, ততক্ষণ তিনি নিছক উপভোক্তা না হয়ে উৎপাদকও হবেন। গ্রামবাসীদের কাছ থেকে এই রকম আহ্বান এলে সাড়া দেওয়া অন্যায় নয়। কারণ তাঁর প্রেরণায় গ্রামবাসীরা যে অতিরিক্ত উৎপাদন করবে স্বভাবতই তিনি তার একটা অংশের ন্যায়সঙ্গত ভাগীদার। তবে বিগত কয়েক মাসে অখিল ভারত চরখা সঙ্ঘের অধীনে পরিচালিত গ্রামসেবার কাজ থেকে এই অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে যে, এ ব্যাপারে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে বড় ধীরে সাড়া পাওয়া যায়। গ্রামসেবককে তাই গ্রামবাসীদের সম্মুখে সদ্‌গুণাবলী ও কর্মিষ্ঠ বৃত্তির নিদর্শন স্বরূপ হতে হবে। কর্মী গ্রামবাসীদেরই এক জন হয়ে গ্রামে বাস করবেন। তিনি তাঁদের মধ্যে এমন একজন মোড়ল জাতীয় ব্যক্তি হয়ে পড়বেন না যাকে সম্মানজনক ব্যবধান থেকে ভক্তি করাই কেবল পোষায়। গ্রামবাসীদের কাছে কর্মী হবেন শ্রেষ্ঠ প্রত্যক্ষ শিক্ষা এবং তা হলেই শীঘ্র বা বিলম্বে তিনি গ্রামকে প্রভাবান্বিত করতে পারবেন।

সুতরাং প্রশ্ন হচ্ছে, যে গ্রাম তিনি বেছে নেবেন তাতে কোন্ ধরনের অর্থকরী কাজ তিনি করতে পারেন? গ্রামবাসীরা সাহায্য করুন বা না করুন তিনি এবং তাঁর পরিবারের লোকেরা গ্রাম সাফাইয়ের জন্য রোজ কিছুটা সময় দেবেন। নিজের সাধ্যমত তিনি সহজ সরল চিকিৎসা-প্রণালী দ্বারা গ্রামবাসীদের সাহায্য করবেন। কুইনাইন বা ওই-জাতীয় কোন ওষুধ দেওয়া, ঘা হলে গরম জলে ধুয়ে দেওয়া, নোংরা চোখ কান ধুয়ে ফেলা, ঘায়ে পরিষ্কার মলম লাগিয়ে দেওয়া ইত্যাদি

মোটামুটি চিকিৎসা-প্রণালীর মধ্যে পড়ে। গ্রামে রোজ রোজ যে সব অসুখ-বিসুখ হয় তার সরল চিকিৎসা-পদ্ধতি বর্ণনাকারী বই আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি। যাই হোক, পূর্বোক্ত দুটি বিষয় গ্রামসেবার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হবে। এর জন্য প্রত্যহ তার দুই ঘণ্টার বেশী সময় লাগা উচিত নয়। গ্রামসেবকদের কাছে দৈনিক আট ঘণ্টা কাজ করা বলে কিছু নেই। তাঁর কাছে গ্রামবাসীদের জন্য কাজ করা প্রেমের তাগিদে করণীয় কর্তব্য। সুতরাং তিনি পূর্বোক্ত দুই ঘণ্টা ছাড়া জীবিকা অর্জনের জন্য আরও আট ঘণ্টা পরিশ্রম করবেন। মনে রাখতে হবে যে, অখিল ভারত চরখা সঙ্ঘ এবং অখিল ভারত গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘ প্রবর্তিত নূতন পরিকল্পনায় সকল প্রকার শ্রমের জন্য একটা ন্যূনতম সমান পারিশ্রমিক ধার্য করা হয়েছে। এতদনুযায়ী কোন ধুনুরী এক ঘণ্টা ধুনকি চালিয়ে উচিত মত পরিমাণের তুলা ধুনে নিলে তার মজুরী এক ঘণ্টায় অনুরূপ পরিমাণ কর্মসম্পাদনকারী কোন তাঁতী, কাটুনী বা কাগজীর সমানই হবে। সুতরাং কর্মী সহজে যে কাজ করতে পারবেন তা স্থির করে নিয়ে সেই কাজ শিখে নেবার স্বাধীনতা তাঁর আছে তবে এ ব্যাপারে এইটুকু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যে, সেই কাজের দ্বারা উৎপন্ন পণ্য যেন সহজে তাঁর গ্রাম ও তার আশেপাশে বিক্রি হয়ে যায়, অথবা চরখা সঙ্ঘের কাছে যেন তার চাহিদা থাকে।

প্রতিটি গ্রামের অধিবাসী যে প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভব করে তা হল সততা সহকারে পরিচালিত একটি দ্রব্যসামগ্রীর দোকান। এখানে ভেজালবিহীন খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য উপকরণ বিক্রি হবে। জিনিসের ক্রয়মূল্যের উপর সামান্য কমিশন নেওয়া হবে। এ কথা সত্য যে, দোকান যতই ছোট হোক না কেন, এর জন্য কিছু না কিছু পুঁজির দরকার হয়। তবে যে কর্মীকে তাঁর কর্মক্ষেত্রের কিছুসংখ্যক লোকও অল্পবিস্তর চেনে তাঁর সততার উপর লোকের এতটুকু আস্থা থাকবে যাতে তিনি ধারে অল্পস্বল্প মাল থোক দরে পেতে পারেন।

এই সব প্রত্যক্ষ সুপারিশের পরিমাণ আর বাড়িয়ে লাভ নেই। চোখ কান খোলা রেখে যে কর্মী কাজ করবেন তিনি নিত্য নূতন সত্য আবিষ্কার করতে সমর্থ হবেন এবং কোন্ ধরনের শরীরশ্রমের কাজ করলে নিজের জীবিকা নির্বাহের সঙ্গে সঙ্গে তিনি গ্রামবাসীদের আদর্শ-স্থানীয় হয়ে উঠবেন এ কথা শীঘ্রই তিনি নিজেই জানতে পারবেন। তিনি তাই এমন ধরনের শ্রম করার কাজ বেছে নেবেন যার ফলে গ্রামবাসীদের শোষণ হবে না বা যা তাদের স্বাস্থ্য বা সুনীতিজ্ঞানকে আঘাত দেবে না। পক্ষান্তরে তাঁর কাজের ফলে গ্রামবাসীরা তাদের অবকাশকালকে কাজে লাগাবার উপযুক্ত কোন শিল্প-উদ্যোগ গ্রহণ করে নিজেদের স্বল্পপরিমাণ উপার্জনকে কিছু মাত্রায় বাড়াবার প্রেরণা পাবে। তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টির ফলে তাঁর মনোযোগ গ্রামের ঝোপজঙ্গল সহ যাবতীয় আবর্জনার উপর পড়বে এবং যাবতীয় অব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদ তিনি খুঁজে বার করবেন। শীঘ্রই তিনি দেখবেন যে এই জিনিস-গুলির অধিকাংশ কাজে লাগানো সম্ভব। তিনি যদি খাবার উপযুক্ত লতাপাতা জোগাড় করতে পারেন তা হলে নিজের খাদ্যের একাংশ উপার্জন করেছেন বলতে হবে। মীরাবেন আমাকে অনেকগুলি মার্বেলের মত সুন্দর সুন্দর পাথর উপহার দিয়েছেন এবং পাথর হিসাবেই সেগুলি বহু রকমের কাজে লাগছে। আমার হাতে যদি একটু সময় থাকত তবে কিছু মামুলি যন্ত্রপাতি কিনে সেগুলিকে আমি বিভিন্ন আকার দিয়ে বাজারে বিক্রি করার উপযোগী পণ্যে রূপান্তরিত করতে পারতাম। কাকা সাহেব আমাকে কতকগুলি বাঁশের টুকরো দিয়েছিলেন। উনান ধরানো ছাড়া ওইগুলি দিয়ে আর কোন কিছু হবার কথা নয়। কিন্তু অতি সাধারণ একটি ছুরি দিয়ে ওইগুলির কোন কোনটিকে আমি কাগজ-কাটা ছুরি এবং কোনটিকে বা চামচে পরিণত করেছি। এ সবের একটা সীমিত বাজার আছে। মগনবাড়ির কোন কোন কর্মী এক পাশে লেখা বাজে কাগজ দিয়ে অবসর সময়ে খাম তৈরি করেন।

আসল কথা হচ্ছে, গ্রামবাসীরা সব রকম আশা ভরসা হারিয়ে বসে আছে। তাদের মনে এই সন্দেহ বাসা বেঁধে আছে যে, প্রতিটি অপরিচিত ব্যক্তির হাতই তাদের গলা টিপে ধরার জন্য উদ্যত এবং সবাই তাদের ঠকাতেই আসে। বুদ্ধি ও শ্রমের মধ্যে বিচ্ছেদের ফলে তাদের চিন্তা করার ক্ষমতাই পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। কাজের সময়টুকুও তারা ভাল করে কাজ করে না। কর্মী ভালবাসা ও বিশ্বাসে ভরপুর হয়ে এই সব গ্রামে প্রবেশ করবে। তাঁর মনে দৃঢ় বিশ্বাস থাকা চাই যে, মানুষ যেখানে বিনা বুদ্ধিতে পরিশ্রম করে বছরের অর্ধেক দিন বেকার থাকে, সেখানে তিনি বুদ্ধি প্রয়োগে পুরো বছর কাজ করলে অবশ্যই গ্রামবাসীদের আস্থা অর্জন করবেন ও এইভাবে তাদের সঙ্গে কাজ করে সততা সহকারে নিজের জীবিকা অর্জন করতে পারবেন।

তবুও হবু কর্মীর মনে প্রশ্ন জাগবে, "কিন্তু আমার ছেলেমেয়েদের কি হবে ? আর তাদের শিক্ষারই বা কি ব্যবস্থা করা যাবে ?" কর্মীর ছেলেপুলেদের যদি আধুনিক শিক্ষা দেবার পরিকল্পনা থাকে তা হলে আমি কোন কার্যকরী পরামর্শ দিতে অপারগ। তবে কর্মীর সন্তানদের সুস্থ, সবল, সৎ ও বুদ্ধিমান গ্রামবাসী রূপে গড়ে তোলা যদি শিক্ষার লক্ষ্য হয় এবং তাদের পিতা যে গ্রামকে নূতন বাসস্থল রূপে গ্রহণ করেছেন সেখানে তাদের জীবিকা নির্বাহের উপযোগী ক্ষমতা-সম্পন্ন করে তোলা যদি এই শিক্ষার মানদণ্ড হয়, তা হলে নিজের বাড়ীতে নিজের বাবা মায়ের কাছেই তারা এ শিক্ষা পেতে পারে। এ ছাড়া এই শিক্ষার কল্যাণে যে দিন থেকে তাদের বোধশক্তি জাগবে এবং নিজেদের হাত-পাকে বিধিবদ্ধ ভাবে কাজে লাগাতে পারবে, সেই দিন থেকে তারা পরিবারের আংশিক উপার্জনশীল সদস্য হতে পারবে। সুন্দর গৃহের মত ভাল বিদ্যালয় আর নেই, আর সৎ ও চরিত্রবান পিতা-মাতার চেয়ে ভাল শিক্ষকও আর হয় না। আজকালকার হাই স্কুলের

শিক্ষা গ্রামবাসীদের বুকের উপর পাষাণভারের মত চেপে বসেছে। তাদের সন্তানসন্ততি কখনও এ শিক্ষার সুযোগ পাবে না। আর সৌভাগ্যক্রমে বাড়ীতে ভাল রকম শিক্ষা পেলে এর অভাবে তাদের কোন ক্ষতিও হবে না। গ্রামসেবক বা গ্রামসেবিকা যদি একটি সুন্দর গৃহস্থালী চালাবার উপযুক্ত যোগ্য পুরুষ বা নারী না হন, তা হলে তাঁর গ্রামের কর্মী হবার মত সুউচ্চ সম্মান ও মর্যাদাপ্রার্থী না হওয়াই বিধেয়।

হরিজন, ২৩-১১-১৯৩৫

জনৈক গ্রামসেবকের প্রশ্ন

একটি কর্মী সমাবেশে গান্ধীজীকে বক্তৃতা দিতে বলার পরিবর্তে কর্মীরা তাঁর হাতে একটি প্রশ্ন-তালিকা দিয়ে সেগুলি সম্বন্ধে তাঁর উপদেশ ও পরামর্শ জানতে চাইলেন।

প্রথম প্রশ্নটি ছিল গ্রামসেবকের কর্তব্য সম্বন্ধে। গান্ধীজী বললেন যে, গ্রামসেবকের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে গ্রামবাসীদের সেবা করা এবং তিনি যদি একাদশ ব্রতকে চির-উজ্জ্বল আদর্শ স্বরূপ নিজের সম্মুখে জাগরূক রাখেন তা হলেই সর্বাপেক্ষা সুষ্ঠুভাবে তাঁদের সেবা করতে পারবেন। এই একাদশ ব্রতকে বিনোবা দুটি শ্লোকে গ্রথিত করেছেন এবং ভারতবর্ষের অধিকাংশ আশ্রমের কর্মীরা নিত্যকার প্রার্থনা-সভায় শ্লোক দুটি উচ্চারণ করে থাকেন:

অহিংসা সত্য অস্তেয় ব্রহ্মচর্য অসংগ্রহ,
শরীরশ্রম অস্বাদ সর্বত্র ভয়বর্জন,
সর্বধর্মী সমানত্ব স্বদেশী স্পর্শভাবনা
হী একাদশ সেবাবী নম্রত্বে ব্রতনিশ্চয়ে।

এর অর্থ হচ্ছে: অহিংসা, সত্য, চুরি না করা, ব্রহ্মচর্য, প্রয়োজনের

অধিক সঞ্চয় না করা, শরীরশ্রম, স্বাদবৃত্তির উর্ধ্বে ওঠা বা তাকে জয় করা, নির্ভীকত্ব, সকল ধর্মকে সমান জ্ঞান, স্বদেশী, এবং অস্পৃশ্যতা বর্জন—এই একাদশ ব্রত নম্রতা সহকারে পালন করতে হবে।

অপর প্রশ্নটি ছিল গ্রামসেবকের জীবিকা সম্বন্ধে। কর্মী কি ভাবে তা অর্জন করবে ? কর্মী কোন প্রতিষ্ঠান থেকে মাসোহারা পাবে, না, নিজের শ্রমে অতটা উপার্জন করবে, অথবা এর জন্য গ্রামবাসীদের উপর নির্ভর করবে ? গান্ধীজী বললেন যে, সেরা উপায় হচ্ছে গ্রামবাসীদের উপর নির্ভর করা। এতে লজ্জার কারণ নেই, আছে বিনম্রতা। আর এ প্রক্রিয়ার শরণ নিলে উচ্ছৃঙ্খলতার অবকাশ থাকবে না ; কারণ এমন কোন গ্রাম পাওয়া যাবে না যার বাসিন্দারা কর্মীর উচ্ছৃঙ্খলতা বা উদ্দণ্ডতার প্রশ্রয় দেবে। কর্মীকে কাজের সময়ের সবটুকু গ্রামের .কাজে দিতে হবে এবং তারপর নিজের প্রয়োজনীয় শস্য ও তরিতরকারী গ্রামবাসীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে। দরকার পড়লে ডাকখরচ বা ওই-জাতীয় নগদ অর্থ ব্যয়ের মত কাজকর্ম করার জন্য তিনি গ্রাম থেকে কিছু টাকা-পয়সাও তুলতে পারেন। তবে গান্ধীজীর মতে এ একেবারে অপরিহার্য নয়।গ্রামবাসীর আহ্বানে তিনি যদি সেখানে গিয়ে থাকেন তা হলে গ্রামবাসী সানন্দে তাঁর ব্যয় নির্বাহ করবে। তবে এমন একটা সময় আসতে পারে যখন গ্রামবাসীরা আর তাঁর অভিমতের সমর্থন করবে না এবং তারা সে অবস্থায় পৃষ্ঠপোষকতা প্রত্যাহার করে নিতে পারে। সত্যাগ্রহাশ্রমে ১৯১৫ সনে অস্পৃশ্যদের প্রবেশাধিকার দেবার পর এ রকম ঘটনা ঘটে। এ রকম পরিস্থিতির উদ্ভব হলে কর্মীর উচিত খেটে খাওয়া, কোন প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করার মানে হয় না।

তৃতীয় প্রশ্ন ছিল শরীর-শ্রম সম্বন্ধে। গ্রামে গ্রামসেবক থাকার অর্থ এই যে, তিনি যথাসাধ্য শরীরশ্রম করবেন এবং গ্রামবাসীদের আলস্য বর্জন করার শিক্ষা দেবেন। তিনি অবশ্য যে কোন ধরনের

কাজ করতে পারেন, তবে ঝাড়ুদারের কাজকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত। ঝাড়ু দেওয়াকে নিঃসন্দেহে উৎপাদক শ্রম বলা চলে। কোন কোন কর্মী যে দৈনিক আধ ঘণ্টা নিছক সেবামূলক অথচ উৎপাদক কাজে নিয়োগ করতে চান, এটা তাঁর খুব পছন্দ। সাফাই কার্যকে নিঃসন্দেহে এই পর্যায়ভুক্ত করা চলে। আটা পেষাইকেও একই শ্রেণীতে ফেলা যায়। আর অর্থ বাঁচানোর মানেই হল অর্থ উপার্জন করা।

চতুর্থ প্রশ্ন ছিল রোজনামচা লেখা সম্বন্ধে। গান্ধীজীর মনে এ বিষয়ে কোন সন্দেহই ছিল না যে, জাগরিত অবস্থার প্রতিটি মিনিটের হিসাব নিকাশ করার জন্য গ্রামসেবককে প্রস্তুত থাকতে হবে এবং তাঁর প্রতিটি মুহূর্ত কর্মময় হবে ও নিজের রোজনামচায় স্পষ্টভাবে এই কাজের উল্লেখ থাকবে। সত্যকার রোজনামচা বা দিনলিপি লেখকের মন ও আত্মার যথার্থ প্রতিবিম্ব স্বরূপ। তবে অনেকের পক্ষে হয়তো মনের গতিবিধির যথাযথ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা কঠিন হতে পারে। সে ক্ষেত্রে তাঁরা ডায়েরীতে কেবল বাইরের কাজের বিবরণ রাখবেন। তবে এলোমেলো ভাবে এ কাজ করলে চলবে না। কেবল "রান্নাঘরে কাজ করেছি"—এইটুকু লিখলে চলবে না। কেউ রান্নাঘরে সময় নষ্ট করতে পারেন। সঠিক কাজের বিবরণ লিখতে হবে।

পঞ্চম প্রশ্ন ছিল গুজরাতের 'দুবলাদের' মধ্যে কাজ করার সম্বন্ধে। গুজরাতের কোন কোন অঞ্চলে এদের অবস্থা ভূমিদাসের মত। গান্ধীজী বললেন যে, 'দুবলাদের' সেবা করার অর্থ হচ্ছে তাদের দুঃখ-কষ্টের অংশীদার হতে প্রস্তুত থাকা। এ ছাড়া এদের মালিকদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে যে তাদের হাতে এরা যেন ন্যায়সঙ্গত ও সহৃদয় ব্যবহার পায়।

বক্তব্যের পরিসমাপ্তি প্রসঙ্গে গান্ধীজী বললেন, "গ্রামসেবককে রাজনীতি বর্জন করতে হবে। তিনি কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্য হতে পারেন, তবে কোন নির্বাচনী অভিযানে তাঁর যোগ দেওয়া অন্যায়

হবে। তাঁর কর্মসূচী স্পষ্ট তাঁর চোখের সামনে থাকবে। গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘ এবং চরখা সঙ্ঘ উভয়ই কংগ্রেস কর্তৃক সৃষ্ট হলেও এই দুই প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস-নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করছে। এইজন্য এই দুই প্রতিষ্ঠান এবং তার সদস্য-কর্মিবর্গ সব রকমের কংগ্রেসী রাজনীতি থেকে দূরে থাকেন। এই হচ্ছে অহিংস প্রক্রিয়া।

"গ্রামের দলাদলিও তিনি এড়িয়ে চলবেন। শহরে যে সব জিনিস না হলে তার চলে না তার অধিকাংশের প্রয়োজনীয়তা বর্জন করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তিনি গ্রামে গিয়ে বসতি স্থাপন করবেন। আমি যদি কোন গ্রামে গিয়ে বসি তা হলে কোন্ কোন্ জিনিস আমি গ্রামে নিয়ে যাব না তা আমাকে পূর্বেই স্থির করে নিতে হবে। এ সব জিনিস মূলতঃ যতই নিরীহ প্রকৃতির হোক না কেন, এ কাজে এ-জাতীয় সীমারেখা না টেনে নিলে উপায় নেই। এ ক্ষেত্রে বিবেচ্য হচ্ছে, সাধারণ গ্রাম-বাসীর জীবনে এইসব জিনিস খাপ খায় কিনা। তাঁকে দুর্নীতির ঊর্ধ্বে উঠতে হবে এবং সকল প্রকার প্রলোভনের বিরুদ্ধে তিনি পাথরের মত মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়ে থাকবেন ও এইভাবে গ্রাম-বাসীদেরও প্রলোভনের হাত থেকে রক্ষা করবেন। বিভীষণ একাই যেমন লঙ্কাকে রক্ষা করেছিলেন তেমনি একজন মাত্র শুদ্ধহৃদয়বিশিষ্ট ব্যক্তি পুরো একটি গ্রামকে বাঁচাতে পারেন। শোদম ও গোমোরাতে যত দিন এক জনও পবিত্র মানুষ অবশিষ্ট ছিল তত দিন ওই জনপদ দুটির বিনাশ হয় নি।"*

হরিজন, ২৯-২-১৯৩৬

*বাইবেলে উক্ত প্রাচীন প্যালেস্টাইনের দুটি শহর। নগরবাসীদের দুষ্ট স্বভাবের জন্য স্বর্গের আগুনে শহর দুটি ভস্মীভূত হয়।—অনুবাদক

ভিতরের বিপদ

প্রাণশক্তিবিশিষ্ট কোন আন্দোলন বা প্রতিষ্ঠান বাহ্য আক্রমণের কারণে নিশ্চিহ্ন হয় না। এর মৃত্যু হয় আভ্যন্তরীণ ক্ষয়ের দরুন। প্রয়োজন হচ্ছে সন্দেহাতীত চরিত্র, বিরতিবিহীন প্রচেষ্টা এবং তার সঙ্গে চাই কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে ক্রমবর্ধমান জ্ঞান ও অত্যন্ত অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা। যে সব চরিত্রবলহীন কর্মীর জীবনমান সাধারণ গ্রামবাসীর তুলনায় উচ্চ এবং নিজের করণীয় কর্ম সম্পাদনের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে যাঁদের জ্ঞান নেই, তাঁরা গ্রামবাসীদের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন না।

এই কথাগুলি লেখবার সময় যে সব কর্মী চরিত্রবল এবং সারল্যের অভাবের জন্য নিজেদের আদর্শ ও নিজের ক্ষতি করেছেন, তাঁদের কথা মনে পড়ছে। তবে সৌভাগ্যবশতঃ সজ্ঞানে অসদাচরণ করার নিদর্শন অতীব বিরল। কিন্তু এ কাজের অগ্রগতির পক্ষে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বাধা হচ্ছে উপযুক্ত কর্মীদের গ্রামীণ জীবনস্তরে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেবার অক্ষমতা। এই-জাতীয় প্রতিটি কর্মী নিজেদের পারিশ্রমিক হিসাবে যদি এত বেশী পরিমাণ অর্থ দাবি করেন যার চাপ গ্রামসেবার কার্যক্রমের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়, তা হলে শেষ অবধি এই সব প্রতিষ্ঠানের কাজ বন্ধ করে দিতে হবে। কারণ এক মাত্র বিরল ক্ষেত্র ও সাময়িকভাবে ছাড়া যদি শহরের হিসাব অনুযায়ী পারিশ্রমিক চাওয়ার উপর জোর দেওয়া হয়, তা হলে বুঝতে হবে যে শহর ও গ্রামের মধ্যেকার পার্থক্য কোন দিনই মিটবার নয়। গ্রামমুখী হবার এই আন্দোলন গ্রামের মতই শহরবাসীদের পক্ষেও এক শিক্ষার বিষয়। শহর থেকে আগত কর্মীদের গ্রামীণ মনোবৃত্তি গড়ে তুলতে হবে এবং গ্রামবাসীদের মত জীবন যাপন করা শিখতে হবে। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে, তাঁদের গ্রামবাসীদের মত উপবাসী থাকতে

হবে। তবে নিঃসন্দেহে এর পরিণামে শহর থেকে আগত কর্মীদের পুরাতন জীবনযাত্রা-পদ্ধতিতে এক আমূল পরিবর্তন ঘটে যাবে। গ্রামবাসীর জীবনমানের উন্নতি ঘটানোর সঙ্গে সঙ্গে শহুরে জীবনমানকে অনেকখানি নিচে নামাতে হবে। অবশ্য তদ্দরুন কর্মীকে এমন জীবনমান গ্রহণে বাধ্য করা চলবে না যার ফলে তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ হতে পারে।

হরিজন, ১১-৪-১৯৩৬

গ্রামসেবা বিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রতি

যে কার্যক্রম ও জীবনের আদর্শ সম্মুখে রেখে আপনারা কাজ করবেন তার সম্বন্ধে আমি আপনাদের কিছু বলতে চাই।

ভবিষ্যৎ গড়া বলতে সচরাচর যা বোঝায়, আপনারা তার জন্য এখানে আসেন নি। আজ টাকা আনা পয়সা দিয়ে মানুষের মূল্য নির্ধারণ করা হয় এবং তার শিক্ষা এক অর্থকরী পণ্যে পর্যবসিত। আপনারাও যদি এই মানদণ্ড স্বীকার করে এসে থাকেন তা হলে নিশ্চয় হতাশ হবেন। আপনাদের প্রশিক্ষণকাল শেষ হলে হয়তো দশ টাকা মাসোহারায় কর্মজীবনের সূত্রপাত হবে এবং এর অবসানও হবে ওই টাকাতেই। কোন বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালক বা উচ্চ-পদারূঢ় রাজকর্মচারী যা পান তার সঙ্গে আপনারা যেন নিজেদের অবস্থার তুলনা না করেন।

আমাদের প্রচলিত মানদণ্ডের পরিবর্তন ঘটাতে হবে। জাগতিক অর্থে কোনরকম ভবিষ্যৎ গড়ার প্রতিশ্রুতি আমরা আপনাদের দেব না এবং প্রত্যুত আপনাদের মনকে আমরা ওই রকম ইচ্ছা থেকে ফিরিয়ে আনতে চাই। মাসিক ছয় টাকায় আপনাদের খাবার খরচ চলে যাবে এই হচ্ছে আমাদের কাম্য। এক জন সিভিল সার্ভিসের

অফিসার হয়তো মাসে ষাট টাকা ওই বাবদে খরচ করেন। তবে এই জন্য শারীরিক, মানসিক বা নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি যে আপনাদের চেয়ে শ্রেয়ঃ এ কথা মনে করার কারণ নেই। এই-জাতীয় ব্যয়বহুল জীবনযাত্রার কারণে তিনি হয়তো ওই সব দিক থেকে বিচার করলে আপনাদের থেকে নিম্নস্তরের বলে প্রতিপাদিত হবেন। আমার মনে হয় আপনারা নিজেদের যোগ্যতার পরিমাপ কাঞ্চনমূল্যে করেন না বলেই এই প্রতিষ্ঠানে এসেছেন। দুবেলা দুমুঠি কেবল খেতে পাবার বিনিময়ে দেশের সেবা করাতেই আপনাদের আনন্দ। ফাটকা খেলে কেউ কেউ হাজার হাজার টাকা রোজগার করতে পারেন, কিন্তু আমাদের কাজের পক্ষে তাঁরা হয়তো একেবারে অযোগ্য হবেন। আমাদের এই অনাড়ম্বর পরিবেশে এসে তাঁরা অস্বস্তি বোধ করবেন এবং তাঁদের পরিবেশে আমরা অস্বস্তি বোধ করব। দেশের সেবার জন্য আমরা আদর্শ শ্রমিক চাই। যে সব গ্রামবাসীদের সেবা করতে হবে তারা তাঁদের খাওয়া-দাওয়া বা অন্যবিধ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কি ব্যবস্থা করল এ নিয়ে এই সব আদর্শ শ্রমিক মাথা ঘামাবেন না। নিজের প্রয়োজনপূর্তির জন্য তাঁরা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করবেন এবং সকল রকমের দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয়েও তাঁরা উল্লাস বোধ করবেন। আমাদের দেশের মত যেখানে সাত লক্ষ গ্রাম নিয়ে চিন্তা করতে হয়, সেখানে এই রকমটাই স্বাভাবিক। এ কাজের জন্য নিয়মিত বেতন বৃদ্ধি, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড এবং পেন্সন ইত্যাদির প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধকারী বেতনভোগী কর্মচারী রাখা পোষায় না। গ্রামবাসীদের বিশ্বস্ততা সহকারে সেবা করাই এ কাজের স্বাভাবিক পুরস্কার।

আপনাদের ভিতর কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে গ্রামবাসীদের জীবনমানও কি এই রকম হবে? না, তা কখনই নয়। এই-জাতীয় ভবিষ্যৎ আমাদের মত সেবকদের, আমাদের প্রভু গ্রামবাসীদের নয়। অনেক দিন আমরা ওদের কাঁধে চড়ে কাটিয়েছি। তাই আমাদের

প্রভুদের ভাগ্য যাতে আজকের চেয়ে অনেক ভালো হয় তার জন্য স্বেচ্ছায় আমরা এই ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য বরণ করে নিতে চাই। আজ তাদের যা আয় তার চেয়ে বহুগুণ বেশী আয় তারা যাতে করতে পারে তার ব্যবস্থা আমাদের করে দিতে হবে। আর গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘের লক্ষ্যও তাই। তবে পুর্বে আমি যে রকম সেবকদের কথা বর্ণনা করেছি, অধিক সংখ্যায় সেইরকম সেবক না পেলে সঙ্ঘের পক্ষে এ কাজ সম্ভব নয়। প্রার্থনা করি যেন আপনারা ওই রকম সেবক হতে পারেন।

হরিজন, ২০-৫-১৯৩৬

পল্লীসেবা

[ওয়ার্ধায় গ্রামসেবা বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত আলাপচারী থেকে]

প্রশ্ন ॥ গ্রামবাসীরা কি আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে আসে?

উত্তর ॥ আসে, তবে তাদের মধ্যে ভয়, এমনকি সন্দেহও থাকে। গ্রামবাসীদের অনেকবিধ ক্রুটীর মধ্যে এগুলিও আছে। তাদের ভিতর থেকে এসব দূর করতে হবে।

প্রশ্ন ॥ কেমন করে?

উত্তর ॥ ধীরে ধীরে তাদের আস্থাভাজন হয়ে এবং স্নেহ অর্জন করে। আমরা ওদের উপর চাপ দিয়ে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে গেছি—এই ভয় ওদের মন থেকে দূর করতে হবে। আমাদের আচরণ দ্বারা প্রমাণ করতে হবে যে তাদের উপর অন্যায় চাপ দেবার বা স্বার্থ-প্রণোদিত অপর কোন অভিসন্ধি আমাদের নেই। তবে এর জন্য ধৈর্য ধরে প্রয়াস করতে হবে। আপনাদের সততা সম্বন্ধে সহজে তাদের মনে আস্থা সৃষ্টি করা যাবে না।

প্রশ্ন ॥ আপনার কি মনে হয় না যে, যাঁরা কোন প্রতিষ্ঠানের বা

গ্রামবাসাদের কাছ থেকে কোন-কিছু না নিয়ে কাজ করেন, একমাত্র তাঁরাই ওদের ভিতর বিশ্বাসের ভাব জাগাতে পারবেন ?

উত্তর ॥ না। কারণ কারা মাসোহারা নিয়ে কাজ করছে এবং কারা মাসোহারা নিচ্ছে না—এসব খবর তারা জানেই না। আমরা কি ভাবে থাকি, আমাদের আচার-ব্যবহার, কথাবার্তা, এমনকি আমাদের ভাবভঙ্গীও তাদের প্রভাবিত করে। হয়তো জন কয়েক এমন থাকতে পারে যারা মনে করে যে, টাকা রোজগারের জন্য আমরা এ সব কাজ করছি। নিঃসন্দেহে তাদের সন্দেহ দূর করতে হবে। তবে এ কথা ভেবে নিরস্ত হবেন না যে, যাঁরা কোন প্রতিষ্ঠানের বা গ্রামবাসীদের কাছ থেকে কোন-কিছু নেন না তাঁরাই আদর্শ সেবক। হয়তো দেখা যাবে যে, ওই রকম কর্মী অহমিকার শিকার হয়ে পড়েছেন ও এর ফলে তাঁর পতন অনিবার্য।

প্রশ্ন ॥ এখানে আমাদের কুটির-শিল্পের শিক্ষা দেওয়া হয়। এর উদ্দেশ্য কি আমাদের একটি জীবিকার উপায় শিখিয়ে দেওয়া, না আমরা গ্রামবাসীদের এই সব শিল্প-শিক্ষা দেব ? আমরা গ্রামবাসীদের শিক্ষা দেব এই যদি লক্ষ্য হয়ে থাকে, তা হলে এক বৎসরের মধ্যে আমরা এই সব শিল্পে নিপুণ হয়ে যাব বলে আশা করা কি সমীচীন ?

উত্তর ॥ কুটির-শিল্পগুলির কর্মপদ্ধতি মোটামুটি জেনে না নিলে আপনারা গ্রামবাসীদের এ সম্বন্ধে কোন বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতে পারবেন না বলে আপনাদের এই সব শিল্প সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়। আপনাদের মধ্যে যাঁদের উদ্যম খুব বেশী, তাঁরা নিশ্চয়ই এই সব কুটির-শিল্পের কোন না কোন একটির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে পারবেন। এই সব শিল্প যেভাবে এখানে শেখানো হয়ে থাকে তার দ্বারা নিঃসন্দেহে আপনারা গ্রামবাসীদের এ সম্বন্ধে আরও কিছু বেশী জ্ঞান দিতে পারবেন। এখানে জাঁতা, ঢেঁকি এবং ঘানীর উন্নতি সাধন করা হয়েছে। কুটির-শিল্পে যন্ত্রপাতির উন্নতিসাধন করার

পরীক্ষা-নিরীক্ষা এখানে চলছে এবং এই সব পরীক্ষার পরিণাম আপনারা গ্রামবাসীদের কাছে পৌঁছে দেবেন। এ ছাড়া একটা বড় কথা হচ্ছে এই যে, তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনের ব্যাপারে সততা ও সাধুতার শিক্ষা দিতে হবে। গ্রামবাসীরা আজ দুধে জল দেয়, তেলে ভেজাল মেশায় এবং যৎকিঞ্চিৎ লাভের সম্ভাবনা থাকলে মিথ্যার শরণ নেয়। এর জন্য অবশ্য ওদের দোষী করব না, এ দোষ আমাদের। আমরা এ যাবত ওদের উপেক্ষা করে এসেছি এবং কেবল শোষণ করেছি। অদ্যাপি আমরা ওদের ভাল কিছু শেখাই নি। ওদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হলে সহজেই আমরা তাদের আচরণের ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন করতে পারব। অনেক দিন যাবত উপেক্ষিত হওয়ায় এবং একান্তে পড়ে থাকায় তাদের বুদ্ধিবৃত্তি, এমনকি নীতিবোধেও মরচে পড়েছে। এই মালিন্য পরিষ্কার করে আমাদের পুনরায় ওদের ন্যায়পথে ফিরিয়ে আনতে হবে।

হরিজন, ২৫-৭-১৯৩৬

জনৈক গ্রামসেবকের প্রশ্ন

শান্তিনিকেতনের বাসিন্দা "বীরভূমের জনৈক বিনম্র গ্রামবাসী" দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের মারফত নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি আমার কাছে পঠিয়েছেন।—

> ১। আপনার বহুমূল্য অভিমত অনুসারে আদর্শ ভারতীয় গ্রামের স্বরূপ কি এবং ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থায় এই "আদর্শ গ্রামের" মানদণ্ডের ভিত্তিতে কোন্ গ্রামকে কতটা নূতন করে গড়ে তোলা সম্ভব?
>
> ২। গ্রামের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে সমাধানের জন্য কর্মী কোন্‌টিতে সর্বপ্রথম হাত দেবে এবং কি ভাবে সে এই লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হবে?
>
> ৩। ছোটখাট গ্রাম্য-প্রদর্শনী এবং যাদুঘরের বৈশিষ্ট্য কি হওয়া

উচিত? পল্লী-পুনর্গঠনের ব্যাপারে কি ভাবে এই সব প্রদর্শনীকে কাজে লাগানো যায়?

উত্তর

১। আদর্শ ভারতীয় গ্রাম এমন হবে যেখানে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার পরিপূর্ণ চিত্র দৃষ্টিগোচর হবে। গ্রামের ঘর তৈরির মাল-মশলা পাঁচ মাইলের মধ্যে থেকে আসবে এবং কুটিরগুলির ভিতর আলো হাওয়ার প্রাচুর্য থাকবে। ঘরের পিছনে একটি করে উঠান থাকবে—সেখানে গৃহপালিত পশু বেঁধে রাখা হবে। বাড়ির পিছনে ওই জায়গাটুকুতে শাক-সব্জীর বাগানও করা চলবে। গ্রামের পথে-ঘাটে যথাসম্ভব কম ধুলো-ময়লা ও আবর্জনা থাকবে। গ্রামে গ্রাম-বাসীদের প্রয়োজনমত জলের কুয়া থাকবে ও সেখান থেকে জল নেবার ব্যাপারে কোন বিধিনিষেধ থাকবে না। সকল সম্প্রদায় ও ধর্মের লোকের নিজ নিজ পদ্ধতি অনুযায়ী উপাসনার গৃহ ওই গ্রামে থাকা চাই। এ ছাড়া সাধারণের মিলন-গৃহ, সার্বজনীন গোচরভূমি, সমবায়-মূলক দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন-ব্যবস্থা গ্রামে থাকবে। গ্রামে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় থাকা চাই ও কারিগরি শিক্ষা সেই বিদ্যালয়ের প্রাণস্বরূপ হবে। গ্রামের ঝগড়া-বিবাদের সালিশী করার জন্য গ্রামে পঞ্চায়েতও থাকবে। গ্রামে গ্রামের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য, শাক-সব্জী, ফলমূল ও খাদি উৎপন্ন হবে। আদর্শ গ্রাম সম্বন্ধে এই হচ্ছে মোটামুটি আমার কল্পনা। বর্তমান অবস্থায় অবশ্য গ্রামের ঘরগুলির সামান্য মেরামত ছাড়া বিশেষ হেরফের করা যাবে না। কোন আদর্শবাদী জমিদারের সাহায্য পেলে বা গ্রামবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা-বৃত্তি থাকলে কেবল পূর্বোক্ত আদর্শ বাসগৃহ ছাড়া বাদবাকী সমস্ত পরিকল্পনাকে কার্যকরী করা যায়। এতে এমন একটা ব্যয় পড়বে না যার জন্য সরকারী সাহায্যের মুখাপেক্ষী হতে হবে। সরকারী সাহায্য পেলে তো কথাই নেই। সে ক্ষেত্রে পল্লী-

পুনর্গঠনের কার্যক্রমের সম্ভাবনার অন্ত দেখা যায় না। তবে সে সম্বন্ধে এখন আলোচনা না করে গ্রামবাসীরা কেবল নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্য শ্রমদান দ্বারা নিজেদের উন্নতির জন্য কতটা কি করতে পারে তাই খতিয়ে দেখতে চাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বুদ্ধিমান কর্মীর দ্বারা পরিচালিত হলে তারা ব্যক্তিগত আয় শুধু নয়, সমগ্র গ্রামের আয় অনতিবিলম্বে দ্বিগুণ করতে পারবে। আমাদের গ্রামগুলিতে অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ ছড়িয়ে রয়েছে। তবে এই সম্পদকে সর্বদা ব্যবসার জন্য কাজে লাগানোও যায় না; কিন্তু স্থানীয় প্রয়োজনে লাগানোর ব্যাপারে কোন বাধা-নিষেধ নেই। সর্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হচ্ছে যে, নিজেদের অবস্থার উন্নতির ব্যাপারে গ্রামবাসীদের ভিতর প্রবল একটা অনিচ্ছার ভাব দেখা যায়।

২। গ্রামসেবক সর্বপ্রথম গ্রাম-সাফাইয়ের সমস্যার সমাধান করবেন। গ্রামে কাজ করতে গিয়ে কর্মী যে সকল সমস্যার ভারে প্রপীড়িত হন তার মধ্যে এই সমস্যাটি সবচেয়ে বেশী উপেক্ষিত। গ্রাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না থাকার কারণে গ্রামবাসীর স্বাস্থ্য খারাপ হয় এবং নানাবিধ রোগের প্রাদুর্ভাব হয়ে থাকে। কর্মী স্বেচ্ছায় 'ভাঙ্গী'র ব্রত গ্রহণ করবেন এবং ইতস্ততঃ যে সব মল পড়ে থাকে তা সংগ্রহ করে তিনি তাকে সারে পরিণত করবেন। এ ছাড়া তিনি গ্রামের পথ-ঘাটও পরিষ্কার করবেন। গ্রামবাসী কোথায় কি ভাবে প্রত্যহ শৌচাদি কর্ম করবেন তার সম্বন্ধে তিনি গ্রামবাসীদের পরামর্শ দেবেন এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মূল্য ও তার অবহেলনার জন্য কী প্রচণ্ড ক্ষতি হয়ে থাকে, সে সম্বন্ধেও তিনি গ্রামবাসীদের জ্ঞান দেবেন। গ্রামবাসীরা তাঁর কথা শুনুন বা না-ই শুনুন, কর্মী নিজের কাজ করে যাবেন।

৩। এই-জাতীয় গ্রাম্য প্রদর্শনীর কেন্দ্রবিন্দু হবে চরখা এবং স্থানীর অবস্থার অনুকূল বিভিন্ন কুটির-শিল্প চরখার চতুর্দিকে স্থান

পাবে। এইভাবে পরিকল্পিত প্রদর্শনী স্বভাবতই গ্রামবাসীদের কাছে প্রত্যক্ষ শিক্ষার মাধ্যম হবে এবং এর সঙ্গে বক্তৃতা, প্রচার-পুস্তিকা ও দর্শনীয় দ্রব্যের সম্বন্ধে আলোচনা ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকলে একেবারে সোনায় সোহাগা হবে।

হরিজন, ৯-১-১৯৩৭

আমাদের গ্রাম

জনৈক যুবক একটি গ্রামে থেকে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করছেন। তিনি আমাকে একটি বিষাদমণ্ডিত পত্র দিয়েছেন। নিচে পত্রটির সংক্ষিপ্তসার উদ্ধৃত করছি:

> তিন বৎসর পূর্বে, আমার বয়স যখন কুড়ি বছর, বিগত পনের বৎসরের শহুরে জীবন ছেড়ে আমি এই গ্রামটিতে আসি। বাড়ির অবস্থার কারণে আমি কলেজে পড়তে পারি নি। পল্লী-উন্নয়নের জন্য আপনি যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন, তা দেখে আমি গ্রামে বসবাস কবার ব্যাপারে উৎসাহিত হই। আমাদের অল্প কিছু জমি আছে। আমাদের গ্রামের অধিবাসীর সংখ্যা আড়াই হাজারের মত। গ্রামবাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হবার পব দেখছি যে তিন-চতুর্থাংশেরও অধিক বাসিন্দাদের ভিতর নিম্নলিখিত দোষগুলি বিদ্যমান:
>
> ১) দলাদলি ও ঝগড়া
> ২) ঈর্ষা
> ৩) নিরক্ষরতা
> ৪) খলতা
> ৫) অনৈক্য
> ৬) অমনোযোগিতা
> ৭) অভব্যতা ও অশালীনতা
> ৮) কুসংস্কার-প্রীতি
> ৯) নিষ্ঠুরতা

এখানে পথঘাটের খুবই অসুবিধা। এই-জাতীয় দুর্গম গ্রামে কোন দিন কোন বিখ্যাত ব্যক্তির পদধূলি পড়ে নি। উন্নতির জন্য মহাপুরুষদের সাহচর্য প্রয়োজন। আমার তাই এই গ্রামে থাকতে ভয় করছে। আমি কি এই গ্রাম ছেড়ে চলে যাব? আপনার পরামর্শ কি?

—তরুণ পত্রলেখকের বক্তব্যে নিঃসন্দেহে কিছু মাত্রায় অতিরঞ্জন থাকলেও এঁর বিশ্লেষণ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য। এই দুঃখজনক অবস্থার কারণ আবিষ্কার করা খুব কঠিন নয়। গ্রামবাসীরা শিক্ষার সৌভাগ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দ্বারা বহুদিন যাবত উপেক্ষিত হয়েছেন। তাঁরা শহরে থাকাই বেছে নিয়েছেন। গ্রামে ফিরে যাবার এই আন্দোলনের লক্ষ্য হচ্ছে গ্রামবাসীদের সঙ্গে সমুচিত সম্পর্ক স্থাপন করার প্রয়াস করা। সেবাবৃত্তির দ্বারা উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিদের এই সব গ্রামে বসতি স্থাপন করিয়ে গ্রামবাসীদের সেবার মাধ্যমে আত্মবিকাশ করার পন্থা দেখিয়ে দেওয়া এই আন্দোলনের কর্মসূচী। পত্রলেখক যে সব দোষত্রুটীর তালিকা রচনা করেছেন সেগুলি গ্রামীণ জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ নয়। সেবার ভাব নিয়ে যাঁরা গ্রামে বসতি স্থাপন করেছেন তাঁরা কখনও বাধা-বিপত্তির দ্বারা হতোৎসাহ হন না। গ্রামে যাবার পূর্বেই তাঁরা জানতেন যে বহুবিধ কষ্ট, এমনকি গ্রামবাসীদের বিরাগও তাঁদের সহ্য করতে হবে। সুতরাং যাঁদের নিজের ও নিজ আদর্শের উপর আস্থা আছে তাঁরাই গ্রামবাসীদের সেবা করতে এবং তাদের জীবনকে প্রভাবিত করতে পারবেন। জনসাধারণের ভিতর আদর্শ জীবন যাপন করাই এক অত্যুত্তম প্রত্যক্ষ শিক্ষা-প্রকরণ এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ পরিবেশের উপর এর পরিণাম দেখা দিতে বাধ্য। পত্র-লেখক যুবকটির বোধ হয় মুশকিল এই যে, তিনি সেবা-ভাবনার দ্বারা চালিত না হয়ে কেবল অর্থোপার্জনের জন্য গ্রামে গেছেন। আমি স্বীকার করছি যে, গ্রামে যাঁরা কেবল পয়সা রোজগারের জন্যই যান,

তাঁদের কাছে গ্রামীণ জীবন আকর্ষণীয় না হবারই কথা। সেবার প্রেরণা পিছনে না থাকলে নূতনত্ব ফুরিয়ে যাবার পরই গ্রামের জীবন-যাত্রা নীরস বোধ হবে। গ্রামে যাবার পর কোন যুবকের পক্ষে একটু অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া মাত্র নিজের কর্তব্যে ক্ষান্তি দেওয়া উচিত নয়। ধীর ভাবে লেগে থাকলে দেখা যাবে যে গ্রামবাসীরা শহরের লোকেদের চেয়ে খুব একটা পৃথক কিছু নন এবং তাদের প্রতি সহৃদয়তা ও মনোযোগ দেখালে তারা তাতে সাড়া দিতে জানে। এ কথা ঠিক যে, গ্রামে গেলে দেশের জ্ঞানী গুণীদের সম্পর্কে আসা সম্ভব নয়। কিন্তু গ্রামীণ মনোভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নেতৃবৃন্দ দেখবেন যে, গ্রামাঞ্চলে সফর করে গ্রামবাসীদের সঙ্গে সজীব সম্পর্ক বজায় রাখা একান্ত প্রয়োজন। এ ছাড়া চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, তুলসীদাস, কবীর, নানক, দাদু, তুকারাম, তিরুভেল্লুয়ার এবং অন্যান্য অসংখ্য প্রসিদ্ধ মহাপ্রাণ ব্যক্তিদের রচনাবলীর মাধ্যমেও মহাপুরুষদের সংসর্গে আসা যায়। আসল সমস্যা দেখা দেয় শাশ্বত মূল্যবোধ গ্রহণের উপযুক্ত করে মনকে তৈরী করার ব্যাপারে। রাজনীতি, সমাজ-বিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র, বিজ্ঞান ইত্যাদি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা থাকলে তার উপযুক্ত সাহিত্যও পাওয়া যায়। তবে স্বীকার করতেই হবে যে, এসব পুস্তক ধর্মগ্রন্থের মত সহজলভ্য নয়। সাধু-সন্তরা জনসাধারণকে উদ্দেশ করেই লিখেছেন বা বলেছেন। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানকে জনসাধারণের গ্রহণযোগ্য করে ভাষান্তরিত করার প্রথা এখনও ঠিক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে নি। তবে কালে এ হবেই। অতএব পত্রলেখকের মত যুবকদের আমি এই পরামর্শ দেব যে তাঁরা যেন হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে না দেন। তাঁরা তাঁদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখুন এবং তাঁদের উপস্থিতি দ্বারা গ্রামজীবনকে অপেক্ষাকৃত বসবাসযোগ্য ও ভালবাসার উপযুক্ত করে গড়ে তুলুন। আর এ করার উপায় হচ্ছে গ্রামবাসীদের পক্ষে গ্রহণীয় পন্থায় গ্রামের সেবা করা, নিজের শক্তিতে

সাধ্যমত গ্রামকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে ও গ্রাম থেকে নিরক্ষরতা বিদূরিত করে প্রত্যেকেই এ কাজের সূত্রপাত করতে পারেন। আর তাঁদের নিজেদের জীবনযাত্রা যদি পরিচ্ছন্ন, শৃঙ্খলাপরায়ণ এবং শ্রমনিষ্ঠ হয়, তা হলে নিঃসন্দেহে তার ছোঁয়া তাঁদের কর্মক্ষেত্রের গ্রামটিতে লাগবে।

হরিজন, ২০-২-১৯৩৭

প্রয়োজনীয় যোগ্যতা

[নিচে গান্ধীজী কর্তৃক রচিত সত্যাগ্রহীদের যোগ্যতার একটি তালিকা দেওয়া হল। কিন্তু গান্ধীজীর মতে গ্রামসেবক যেহেতু যথার্থ সত্যাগ্রহীও বটেন, সেই কারণে এই সব যোগ্যতা গ্রামসেবকদের পক্ষে প্রযোজ্য বলে মনে করা যেতে পারে।—সম্পাদক]

১) ঈশ্বরে তাঁর জ্বলন্ত বিশ্বাস থাকবে, কারণ তিনিই তাঁর একমাত্র শরণ।

২) সত্য এবং অহিংসায় বিশ্বাস তাঁর জীবনব্রত স্বরূপ হবে। এইজন্য মানব-প্রকৃতির স্বাভাবিক সৎ প্রবৃত্তির উপর তাঁর আস্থা থাকবে। স্বয়ং কষ্ট বরণ করে তিনি যে সত্য ও প্রেমের পরিচয় দেবেন তার দ্বারা মানুষের অন্তর্নিহিত এই সৎ প্রবৃত্তি জাগানো তাঁর লক্ষ্য হবে।

৩) তাঁর জাবনযাত্রা পবিত্র হবে এবং নিজ আদর্শের জন্য তিনি নিজ জীবন ও ধন-সম্পত্তি উৎসর্গ করে দিতে প্রস্তুত থাকবেন।

৪) তিনি নিয়মিত ভাবে খাদি পরিধান করবেন ও সুতা কাটবেন। ভারতবর্ষের পক্ষে এ শর্ত অপরিহার্য।

৫) সর্বপ্রকার মাদক দ্রব্য তাঁর কাছে পরিত্যাজ্য হবে। এর ফলে তাঁর বুদ্ধি ও বিচারক্ষমতা কখনও কুয়াসাচ্ছন্ন হবে না এবং তাঁর মনেও স্থৈর্য থাকবে।

৬) মাঝে মাঝে প্রয়োজন মত যে সব নিয়ম এবং শৃঙ্খলার বিধি রচিত হবে তা তিনি সানন্দে পালন করবেন।

পূর্বোক্ত যোগ্যতা-সূচী এ সম্বন্ধে শেষ কথা নয়। এগুলি কেবল উদাহরণার্থ পেশ করা হল।

হরিজন, ২৫-৩-১৯৩৯

গ্রামসেবা-কর্মসূচীর অপরিহার্য অঙ্গ

পল্লী-পুনর্গঠনের কর্মসূচীর ভিতর যদি গ্রামের সাফাই সন্নিবিষ্ট না হয় তা হলে আমাদের গ্রামগুলি আজকেরই মত গোময়-স্তূপ হয়ে থেকে যাবে। গ্রামের সাফাই গ্রামজীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ এবং এ কাজ যত গুরুত্বপূর্ণ তত কঠিন। যুগ যুগ ধরে যে অপরিচ্ছন্নতা চলে আসছে তাকে দূর করা এক বীরত্বব্যঞ্জক প্রচেষ্টা। যে গ্রামসেবক গ্রামের সাফাই-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞ এবং যিনি কুশলী ঝাড়ুদার নন, তিনি কিছুতেই গ্রামসেবার উপযুক্ত হতে পারবেন না।

এ কথা আজ মোটামুটি স্বীকার করা হয় যে, নঈ তালিম বা বুনিয়াদী শিক্ষা ছাড়া ভারতের লক্ষ লক্ষ শিশুকে শিক্ষা দেওয়া এক রকম অসম্ভব। গ্রামসেবককে তাই এই শিক্ষা-পদ্ধতি শিখে নিতে হবে ও স্বয়ং তাঁকে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে হবে।

বয়স্ক শিক্ষার কার্যক্রম স্বভাবতই বুনিয়াদী শিক্ষার অনুগামী হবে। নঈ তালিম যেখানে শিকড় গাড়তে সক্ষম হবে, বিদ্যালয়ের ছাত্ররাই সেখানে পিতা মাতার শিক্ষক হয়ে পড়বে। যাই হোক না কেন, গ্রামসেবককে বয়স্ক শিক্ষার ভারও নিতে হবে।

নারীকে পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী বলা হয়ে থাকে। আইনে যত দিন না পুরুষের সমান অধিকার তারা পায় এবং যত দিন না ঘরে কন্যার জন্ম পুত্রসন্তানের জন্মেরই মত অভিনন্দিত হয়, তত দিন বুঝতে হবে যে

ভারতবর্ষ আংশিক পক্ষাঘাতে ভুগছে। নারীদের পদানত করে রাখা অহিংসার অস্বীকৃতি। প্রতিটি গ্রামসেবক তাই বয়স হিসাবে প্রত্যেক নারীকে নিজের মাতা, ভগ্নী বা কন্যা রূপে বিবেচনা করবেন এবং তাঁদের সম্মানের দৃষ্টিতে দেখবেন। একমাত্র এই-জাতীয় কর্মীই গ্রাম-বাসীদের বিশ্বাস অর্জনে কৃতকার্য হবেন।

অসুস্থ জাতির পক্ষে স্বরাজ অর্জন করা অসম্ভব। তাই দেশবাসীর স্বাস্থ্যের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করার অপরাধকে আর প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। প্রতিটি গ্রামসেবকের স্বাস্থ্যতত্ত্বের সাধারণ নীতি জানা অত্যাবশ্যক।

সাধারণ ভাষা না থাকলে কোন জাতিই দানা বাঁধতে পারে না। হিন্দী-হিন্দুস্থানী ও উর্দুর ঝগড়ার মধ্যে না গিয়ে গ্রামসেবক রাষ্ট্র-ভাষার জ্ঞান অর্জন করবেন। এই রাষ্ট্রভাষা এমন হওয়া দরকার যাতে হিন্দু-মুসলমান সকলের কাছেই তা সহজবোধ্য হয়।

ইংরেজী ভাষার প্রতি আমাদের মোহ হেতু আমরা প্রাদেশিক ভাষাগুলির প্রতি অবিশ্বাসীর ন্যায় আচরণ করছি। আর কিছু নয়, একমাত্র এই বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যই গ্রামসেবক গ্রামবাসীদের ভিতর নিজ মাতৃভাষার প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধির প্রয়াস করবেন। ভারতের অপরাপর ভাষার প্রতি গ্রামসেবকের সমান শ্রদ্ধা থাকবে এবং তিনি যেখানে কাজ করবেন সেখানকার ভাষা তিনি শিখে নেবেন। এইভাবে গ্রামবাসীদের ভিতর তিনি তাদের মাতৃভাষার প্রতি প্রেম গড়ে তুলতে সমর্থ হবেন।

আর্থিক সাম্যের দৃঢ় ভিত্তির উপর রচিত না হলে এই কার্যসূচী সবটুকুই বালুচরে ঘর বাঁধার মত ব্যর্থ হবে। আর্থিক সাম্যের অর্থ এই নয় যে সকলেরই কাছে সমপরিমাণ পার্থিব বস্তু থাকবে। তবে সকলেরই বসবাসোপযোগী ঘর থাকবে, যথেষ্ট ও সুষম খাদ্য জুটবে এবং শরীর আচ্ছাদনের জন্য যথোচিত পরিমাণ খাদি প্রত্যেকে পাবে—এসব

নিশ্চয় আর্থিক সাম্যের আওতায় পড়ে। আজকের হৃদয়হীন অসাম্য শুদ্ধমাত্র অহিংস পন্থায় বিদূরিত হবে, এও এর তাৎপর্য।

হরিজন, ১৮-৮-১৯৪০

সামগ্রিক গ্রামসেবা

গঠনমূলক কর্মী সম্মেলন একটি প্রশ্নের উত্তরদান প্রসঙ্গে গান্ধীজী বললেন:

গ্রামের প্রতিটি অধিবাসীর সঙ্গে সমগ্র গ্রামসেবকের পরিচয় থাকবে এবং তিনি তাঁদের সর্বপ্রকারে সেবা করবেন। অবশ্য এর মানে এই নয় যে কর্মী একা হাতে সব কিছু করবেন। গ্রামবাসীরা যাতে নিজেরাই নিজেদের কাজ করে নিতে পারেন তার পথ তিনি গ্রামবাসীদের দেখাবেন এবং এর জন্য যে সাহায্য ও মালমশলা প্রয়োজন তা তিনি তাঁদের জোগাড় করে দেবেন। তিনি তাঁর সহায়কদের শিক্ষা দিয়ে তৈরি করে নেবেন। এমন ভাবে তিনি গ্রামবাসীদের হৃদয় জয় করে নেবেন যে তাঁরা যেন তাঁর পরামর্শ যাচ্ঞা করেন ও তদনুযায়ী চলেন। আমি যদি ঘানী নিয়ে কোন গ্রামে বসি তা হলে আমি মাসে পনের কুড়ি টাকা রোজগারকারী কোন সাধারণ কলু হব না। আমি হব মহাত্মা কলু। "মহাত্মা" শব্দটি এক্ষেত্রে কৌতুক করে ব্যবহার করলেও আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, কলু হিসাবে আমি গ্রামের আদর্শস্থানীয় হব। আমি গীতা ও কোরাণ জানা কলু হব। গ্রামের শিশুগুলিকে শিক্ষা দেবার মত জ্ঞান আমার থাকবে। সময়াভাবের জন্য এ কাজ আমি হয়তো করে উঠতে পারব না। গ্রামবাসীরা আমার কাছে এসে বলবেন, "অনুগ্রহ করে আমাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করে দিন।" উত্তরে আমি বলব, "আপনাদের জন্য আমি একজন শিক্ষক জোগাড় করে দেব, কিন্তু তাঁর খরচ আপনাদের দিতে হবে।" আর সানন্দে তাঁরা এ দায়িত্ব স্বীকার করবেন। গ্রামবাসীদের আমি সুতা

কাটা শিখিয়ে দেব এবং তাঁরা যখন একজন তাঁতী জোগাড় করে দেবার জন্য আমাকে বলবেন তখন যে শর্তে তাঁদের জন্য শিক্ষক জুটিয়ে দেওয়া হয়েছে সেই শর্তে তাঁতীও জোগাড় করে দেব। আর এই তাঁতী তাঁদের বস্ত্রবয়নবিদ্যা শিখিয়ে দেবেন। স্বাস্থ্যরক্ষা ও সাফাই-এর গুরুত্ব সম্বন্ধে আমি তাঁদের সচেতন করে তুলব এবং তাঁরা যখন আমার কাছে এসে একজন ঝাড়ুদার জোগাড় করে দিতে বলবেন, আমি তখন বলব, "আমিই আপনাদের ঝাড়ুদার হব এবং এ সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় শিখিয়ে দেব।" এই হচ্ছে সমগ্র গ্রামসেবা সম্বন্ধে আমার ধারণা।

হরিজন, ১৭-২-১৯.৬

দলাদলি ও ঝগড়া

প্রশ্ন ॥ প্রায় সব গ্রামেই দলাদলি ও ঝগড়া আছে। স্থানীয় জনসাধারণের সাহায্য নেবার সময় ইচ্ছা থাক বা না-ই থাক আমাদের স্থানীয় রাজনীতির মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হয়। এই অসুবিধার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় কি ? আমরা কি উভয় দলকেই অগ্রাহ্য করে বাইরের কর্মীর সাহায্যে কাজ করব ? অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, এই জাতীয় কাজ বাইরের সাহায্যের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং সে সহায়তা বন্ধ হওয়া মাত্র কাজ বন্ধ হয়ে যায়। অতএব স্থানীয় উদ্যম ও অভিক্রম (initiative) সৃষ্টি করতে হলে এবং স্থানীয় সহযোগিতা পেতে হলে কি করা উচিত ?

উত্তর ॥ ভারতের দুর্ভাগ্য যে, শহরেরই মত গ্রামেও দলাদলি ও ঝগড়াঝাটির অস্তিত্ব রয়েছে। আর ক্ষমতালাভের রাজনীতি গ্রামে অনুপ্রবেশ করলে তা গ্রামের প্রগতির সহায়ক না হয়ে বাধক হয়ে থাকে। কারণ এই রাজনীতির লক্ষ্য যতটা না গ্রামবাসীদের হিত সাধন তার চেয়ে বেশী নিজ নিজ দলের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য গ্রামবাসীদের কাজে

লাগানো। আমার বক্তব্য এই যে, পরিণাম যাই হোক না কেন, আমাদের যথাসম্ভব অধিক মাত্রায় স্থানীয় সহায়তা গ্রহণ করা উচিত। আর আমরা ক্ষমতা লাভের রাজনীতির কালিমামুক্ত থাকলে পথভ্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকবে না। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, শহরের ইংরেজীশিক্ষিত নরনারীবর্গ ভারতের মেরুদণ্ড স্বরূপ তার গ্রামগুলির প্রতি চূড়ান্ত রকমের উপেক্ষা প্রদর্শনের অপরাধে অপরাধী। এ কথা মনে জাগরূক থাকলে ধৈর্য বাড়বে। এমন কোন গ্রাম আমি দেখি নি যেখানে অন্ততঃ একজন সৎ কর্মী নেই। গ্রামে এই রকম কোন কর্মী খুঁজে না পাওয়ার কারণ হচ্ছে, অনেক সময় আমরা আমাদের গ্রামগুলিতে কোন সদ্‌গুণ আছে বলে স্বীকার করার মত নম্রতার পরিচয় দিই না। অবশ্য স্থানীয় রাজনীতি থেকে আমাদের দূরে থাকতেই হবে। এ শিখতে হলে আমাদের সব দলের কাছ থেকে সাহায্য নিতে হবে এবং যেখানে এ সাহায্য না নেওয়াই যথার্থ মঙ্গলকর, সে স্থলে কোন দল থেকেই আমরা সাহায্য নেব না। গ্রামবাসীদের এড়িয়ে যাওয়া সাফল্যের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক বলে আমি মনে করি। এ অসুবিধা সম্বন্ধে প্রথমেই আমি জানতাম বলে আমি একটি গ্রামে একজন কর্মী দেবার নিয়ম কঠোরভাবে পালন করার চেষ্টা করেছি। কর্মী বাংলা না জানলে (এ পরিকল্পনা নোয়াখালিতে থাকার সময়ের।—অনুবাদক) একজন দোভাষীর সাহায্য দেওয়া হয়েছে। আমি কেবল এইটুকুই বলতে পারি যে, এই পদ্ধতি এ যাবত বাঞ্ছিত ফল প্রসব করেছে। আমার পক্ষে তাই আপনার অভিজ্ঞতা ষোল-আনা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। এ ছাড়া আমি এও বলব যে, আমরা বড় তাড়াতাড়ি কোন সিদ্ধান্ত করে ফেলার বিপজ্জনক স্বভাবের শিকার হয়ে পড়েছি। "এই জাতীয় কাজ বাইরের সাহায্যের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং সে সহায়তা বন্ধ হওয়া মাত্র কাজ বন্ধ হয়ে যায়"—এই বাক্যের ভিতর যে ধরনের ঢালাও ধিক্কার নিহিত রয়েছে তা

উচ্চারণ করার পূর্বে আমি এ কথাও বলব যে, কোন একটি গ্রামে এমনকি একটানা কয়েক বৎসর বসবাস করে স্থানীয় কর্মীদের সহায়তায় কাজ করার চেষ্টা করার পরও নিশ্চিতভাবে ঘোষণা করা চলে না যে স্থানীয় কর্মীদের মাধ্যমে বা তাদের দ্বারা কাজ করা সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে এর বিপরীত কথাই সত্য। আমার পক্ষে তাই এখন প্রশ্নের শেষ বাক্যটির বিস্তৃত বিশ্লেষণ নিরর্থক। মুখ্য কর্মীকে আমি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলতে পারি—"আপনি যদি এখনও বাইরের সাহায্য নিয়ে থাকেন তবে তা পরিহার করুন। স্থানীয় সাহায্য যতখানি পাওয়া সম্ভব তা নিয়ে একা সাহস ও বুদ্ধি সহকারে কাজ করে চলুন। আর সফলকাম না হলে আর কাউকে বা অপর কোন-কিছুর উপর দোষারোপ না করে কেবল নিজেকেই দায়ী করুন।"

হরিজন, ২-৩-১৯৪৭

১০

ছাত্রসম্প্রদায় ও গ্রাম

পাঠরত অবস্থাতেই বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলেদের (এই পর্যায়ে প্রত্যেকটি কলেজের ছাত্র পড়ে) গ্রামের কাজ করা উচিত। এইভাবে যে সব কর্মী আংশিক সময় দিতে প্রস্তুত, তাদের জন্য নিম্নরূপ পরিকল্পনা উপস্থাপিত করা হচ্ছে।

ছাত্ররা তাদের সমগ্র অবকাশকাল গ্রামসেবায় নিয়োগ করবে এর জন্য তারা চিরাচরিত পথে ভ্রমণ না করে নিকটবর্তী গ্রামসমূহে যাবে এবং গ্রামবাসীদের অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করে তাঁদের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করবে। এই অভ্যাসের ফলে গ্রামবাসীদের সঙ্গে তাদের যোগসূত্র গড়ে উঠবে এবং তারপর ছাত্ররা যখন সত্যসত্যই তাঁদের মধ্যে বাস করতে যাবে, তখন পূর্ব-পরিচয়ের জন্য তাদের নবীন আগন্তুক মনে করে সন্দেহ করার বদলে গ্রামবাসীরা তাদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবেন। দীর্ঘ অবকাশকালে ছাত্ররা গ্রামে থাকবে এবং সেই সময় তারা বয়স্কদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করবে এবং গ্রামবাসীদের সাফাইয়ের নিয়মগুলি শেখাবে ও সাধারণ অসুখে রোগীর যত্ন-পরিচর্যা করবে। তারা তাঁদের ভিতর চরকার প্রবর্তন করে প্রতিটি কর্মহীন মুহূর্তের সদুপযোগ শেখাবে। এ কাজ করার জন্য শিক্ষক ও ছাত্রদের নিজ অবকাশের সদুপযোগ সম্বন্ধীয় ধারণার পরিবর্তন করতে হবে। সময় সময় অবিবেচক শিক্ষকরা ছুটির পড়া দিয়ে থাকেন। আমার মতে সর্বাবস্থাতেই এ একটা অন্যায় প্রথা। অবকাশ হচ্ছে এমন একটা কাল যখন ছাত্রের মন বাঁধাধরা কাজ থেকে মুক্ত থাকবে এবং তাকে এ সময় স্বাবলম্বন ও মৌলিক আত্মবিকাশের জন্য ছেড়ে দিতে হবে। আমি যে ধরনের গ্রামসেবার কথা উল্লেখ করেছি, নিঃসন্দেহে তা

শিক্ষার লঘু কার্যক্রম সমন্বিত শ্রেষ্ঠ আনন্দের ব্যবস্থা। পাঠ সমাপনান্তে সম্পূর্ণভাবে গ্রামসেবায় আত্মনিয়োগের জন্য এ নিশ্চিত প্রস্তুতির উপায়।

সম্পূর্ণ গ্রামসেবায় আত্মনিয়োগ করার পরিকল্পনা নিয়ে এখন বিস্তৃতভাবে আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা নেই। অবকাশকালে যা করা হয়েছিল এখন তাকে স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। গ্রামবাসীরাও আরও ভালভাবে সাড়া দেবার জন্য প্রস্তুত হবে। গ্রামজীবনের আর্থিক, স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক—প্রতিটি দিক আমাদের স্পর্শ করতে হবে। নিঃসন্দেহে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবিলম্বে আর্থিক দুর্দশার সমাধানের উপায় হচ্ছে চরকা প্রবর্তন করা। প্রথম থেকেই গ্রামবাসীরা এর দ্বারা কিছু আয় করতে শুরু করে এবং দুষ্কার্য করার অবকাশ পায় না। স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় কার্যক্রমের মধ্যে সাফাই ব্যবস্থার উন্নতি সাধন ও রোগপরিচর্যা স্থান পাবে। এই ক্ষেত্রে ছাত্রকে নিজ হাতে কাজ করতে হবে। খাত খনন করে মলমূত্র এবং গ্রামের অন্যান্য আবর্জনা তার মধ্যে চাপা দিয়ে তাকে সারে পরিণত করা, কূপ এবং পুষ্করিণী পরিষ্কার করা, ছোটখাটো বাঁধ দেওয়া এবং আবর্জনা ইত্যাদি অপসারিত করে গ্রামকে পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে মনুষ্য-বাসোপযোগী করা হবে এইসব কাজের লক্ষ্য।

গ্রামসেবককে সামাজিক দিকটি সম্বন্ধেও অবহিত হতে হবে এবং অস্পৃশ্যতা, বাল্যবিবাহ, অসম বিবাহ, মদ্য ও অন্যবিধ মাদক দ্রব্য সেবন এবং আরও বহুবিধ স্থানীয় কুসংস্কার বর্জন করার জন্য গ্রামবাসীদের উপর ধীরে ধীরে চাপ দিতে হবে। সর্বশেষে রাজনৈতিক দিক। এই ক্ষেত্রে কর্মীকে গ্রামবাসীদের রাজনৈতিক অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করতে হবে এবং সর্বাবস্থায় তাঁদের স্বাধীনতা, আত্মনির্ভরতা ও স্বাবলম্বনের মর্যাদা শিক্ষা দিতে হবে। আমার মতে এই হচ্ছে বয়স্ক শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ রূপ।

কিন্তু গ্রামসেবকের কাজ এইখানেই শেষ হয় না। গ্রামের শিশুদের প্রতি তাঁকে দৃষ্টি দিতে হবে এবং তাদের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। তাঁকে বয়স্কদের জন্য একটি নৈশ বিদ্যালয় পরিচালনা করতে হবে। অবশ্য এই অক্ষর-পরিচয় হচ্ছে সমগ্র শিক্ষাক্রমের একটি অঙ্গমাত্র এবং শুধু পূর্বোক্ত বৃহত্তর আদর্শে উপনীত হবার সোপান।

আমি বলব, এ-জাতীয় সেবাকার্যের উপযুক্ত গুণ হচ্ছে উদার হৃদয় এবং সন্দেহাতীত চরিত্র। এই দুটি গুণ থাকলে অন্যান্য যোগ্যতা আপনিই হবে।

শেষ প্রশ্ন হচ্ছে খেতে পরতে পাবার। শ্রমিককে তার পরিশ্রমের দাম দিতে হবে। বেঁচে থাকার মত পারিশ্রমিকের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে, তার বেশী দেবার ক্ষমতা নেই ; এক সঙ্গে আত্মসেবা ও দেশ-সেবা দুই চলে না। দেশসেবার কার্যক্রমের ভিতর আত্মসেবার স্থান অতীব সীমিত। তাই জীবনযাত্রার মান এই নিতান্ত দরিদ্রদেশের উর্ধ্বে উঠতে পারে না। গ্রামসেবা করার নামই স্বরাজ স্থাপন করা। আর সব কিছু অলস মস্তিষ্কের কল্পনা।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৬-১২-১৯২৯

১৪
নারীজাতি ও গ্রাম

বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রসঙ্গে গান্ধীজী লিখেছিলেন :

মায়ের জাতকে উপযুক্ত ক্ষেত্রে অন্যায় অস্বীকার করার অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে হবে। আর নারীরা ছাড়া অপর কে এ শিক্ষাদানের যোগ্য পাত্র? বিনম্রভাবে আমি তাই বলব যে, অখিল ভারত মহিলা সম্মেলনকে (অল ইণ্ডিয়া উইমেনস্ কনফারেন্স) তার নামের উপযুক্ত হতে হলে গ্রামে যেতে হবে। প্রচারপুস্তিকা ইত্যাদির মূল্য আছে; কিন্তু এগুলি কেবল মুষ্টিমেয়সংখ্যক ইংরাজী-জানা শহুরে লোকের কাছে পৌঁছয়। এখন প্রয়োজন হচ্ছে গ্রামীণ মহিলাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন। আর কোন দিন যদি এই উদ্দেশ্য সাধিত হয়ও, কাজটি বড় সহজ হবে না। কিন্তু কোন রকম ফল লাভ করার আশা করার পূর্বে কোন না কোন দিন এ কাজ তো হাতে নিতেই হবে। অখিল ভারত মহিলা সম্মেলন কি গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘের সঙ্গে একযোগে কাজ করবে? যত যোগ্যই হোন না কেন, কোন গ্রামসেবক বা গ্রামসেবিকা নিছক সমাজসংস্কারের লক্ষ্য নিয়ে গ্রামে যাবার আশা করতে পারেন না। গ্রামীণ জীবনের সব কটি দিকে তাঁর কাজের প্রভাব পড়া চাই। আবারও আমি বলছি যে, গ্রামসেবার অর্থ গ্রামবাসীদের কেবল চলনসই লেখাপড়া শেখানো নয়, এর উদ্দেশ্য সত্যকার শিক্ষা। মানুষ বিচারপরায়ণ প্রাণী। তার উপযুক্ত যথার্থ যে জীবন, সে জীবনের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া সম্বন্ধে গ্রামবাসীদের সচেতন করে তোলা এর অন্যতম লক্ষ্য।

হরিজন, ১৬-১১-১৯৩৫

১৫

কংগ্রেস ও গ্রাম

জনসংযোগ

দেশের যে তিন কোটি গ্রামবাসীর সঙ্গে তাঁদের প্রতিনিধিদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে তাঁদের কাছে ১৯২০ সনের গঠনমূলক কর্মসূচী নিয়ে যাবার প্রয়োজনীয়তার উপর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী জোর দিয়েছে। প্রতিনিধিরা ইচ্ছা করলে গ্রামবাসীদের উপেক্ষা করতে পারেন, অথবা তাঁদের যৎকিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য করতে পারেন, কিংবা হয়তো তাঁদের আর্থিক কষ্ট অনেকটা লাঘব করতেও পারেন। কিন্তু চতুর্বিধ গঠনমূলক কার্যক্রম সম্বন্ধে তাঁদের আগ্রহশীল করতে না পারা অবধি তাঁদের ভিতর আত্মবিশ্বাস, মর্যাদাবোধ এবং সর্বদা নিজের অবস্থার উন্নতি করার শক্তি সঞ্চার করা যাবে না। এই গঠনমূলক কর্মচতুষ্টয় হচ্ছে, সর্বজনীন চরখা কাতাই দ্বারা ব্যাপক খাদি উৎপাদন, হিন্দু মুসলমান বা সাম্প্রদায়িক ঐক্য স্থাপন, পানাসক্তদের মধ্যে প্রচার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে মাদক বর্জন এবং হিন্দুদের দ্বারা শাখা-প্রশাখা ও মূল সমেত অস্পৃশ্যতা বর্জন।

১৯২০ ও ১৯২১ সনে সহস্র সহস্র বার ঘোষণা করা হয়েছিল যে, পূর্বোক্ত চতুর্বিধ গঠনমূলক কার্যক্রমের রূপায়ণ ব্যতিরেকে অহিংস পন্থায় স্বরাজ অর্জন অসম্ভব। আমি মনে করি আজও সে কথা সমান সত্য।

রাষ্ট্রের উদ্যোগে কর ধার্য করে জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করা এক কথা, আর কেবল নিজেদের চেষ্টায় নিজেদের ভাগ্যের উন্নতি করেছি এই বোধ তাদের ভিতর জাগরিত করা এক সম্পূর্ণ পৃথক্ জিনিস। আর এর একমাত্র উপায় হচ্ছে চরখা ও অন্যান্য কুটির-শিল্পের শরণ নেওয়া।

এইরূপ, স্বেচ্ছায় বা সরকারের চাপে পড়ে নেতৃবৃন্দের ভিতর চুক্তি সম্পাদন দ্বারা সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্য বজায় রাখা এক জিনিস, আর জনসাধারণ কর্তৃক স্বেচ্ছায় পরস্পরের ধর্মবিশ্বাস ও তৎসংশ্লিষ্ট আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এক সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যাপার। ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যবর্গ ও প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা গ্রামবাসীদের সঙ্গে মেলামেশা করে তাঁদের পারস্পরিক সহনশীলতার মন্ত্রে দীক্ষিত না করা পর্যন্ত এটা সম্ভব নয়।

অনুরূপভাবে আইন করে (যদিও এ আমাদের করতেই হবে) মদ্য নিষেধ করা এক ব্যাপার এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আনুগত্য চালিত হয়ে এই আইন পালন করা এক পৃথক্ জিনিস। ব্যয়বহুল বহুবিস্তীর্ণ গোয়েন্দা বিভাগ ছাড়া এ কাজে সফলকাম হওয়া যাবে না বলা পরাজিতের মনোবৃত্তি এবং অলস কল্পনাপ্রেমী নিষ্ক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গীও বটে। যে সব এলাকায় সুরাপানের প্রভাব আছে, কর্মীরা সেখানে গিয়ে যদি গ্রামবাসীদের নেশা করার কুফল বুঝিয়ে দেন এবং গবেষণা কার্যে নিরত ব্যক্তিরা যদি পানাসক্তির কারণ খুঁজে পান ও জনসাধারণকে তার পর যদি যথোপযুক্ত জ্ঞান বিতরণ করা হয়, তা হলে সুরা বর্জনের কার্যক্রম কেবল স্বল্পব্যয়যুক্ত কার্যক্রম বলেই প্রমাণিত হবে না, এ যে লাভজনক তারও প্রমাণ মিলবে। এ কর্তব্যের দায়িত্ব মূলতঃ মহিলা-দেরই বহন করা উচিত।

এবার সর্বশেষ উদাহরণ পেশ করছি। অস্পৃশ্যতার কুপ্রথার বিরুদ্ধে আমরা আইন করতে পারি এবং এ আমাদের করতেও হবে। তবে দেশের জনসাধারণ যতক্ষণ না মন থেকে "ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না" ভাব বর্জন করছে, ততক্ষণ সত্যকার স্বাধীনতা আসবে না। হৃদয় থেকে অস্পৃশ্যতার ভাবনাকে বিসর্জন না দেওয়া পর্যন্ত জনগণ একদেহ এক-প্রাণ হয়ে কাজ করতে পারবে না।

এইজন্য এইটি এবং অপর তিনটি কর্মসূচী যথার্থ গণশিক্ষার বিষয়।

আর উচিত বা অনুচিত যাই হোক না কেন, এখন যখন তিন কোটি নরনারীর হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তখন এই দুষ্ট প্রথার সঙ্গে যে যতটা অঙ্গাঙ্গীভাবেই জড়িত থাকুন না কেন, কংগ্রেসকর্মী এবং আর যাঁরা হরিজনদের ভোটাধিকার দাবি করতেন তাঁরা ইচ্ছা করলে এই তিন কোটি মানুষকে যথার্থ পথে চালিত করার শিক্ষা দিতে পারেন, আবার ভুল পথেও পরিচালিত করতে পারেন। ওদের ভাল-মন্দের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বিষয়াবলীর প্রতি একেবারে উদাসীন থাকা যুক্তিযুক্ত হবে না।

হরিজন, ১৫-৫-১৯৩৭

লোকসেবক সঙ্ঘের সদস্যদের যোগ্যতা

(নিহত হবার অল্পকাল পূর্বে গান্ধীজী লোকসেবক সঙ্ঘের সংবিধানের এক মুশাবিদা রচনা করেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে, কংগ্রেস যেন তার রাজনৈতিক স্বরূপ বিসর্জন দিয়ে লোকসেবক সঙ্ঘে রূপান্তরিত হয়। প্রস্তাবিত সঙ্ঘের সদস্যদের অন্যান্য যোগ্যতার মধ্যে নিম্নলিখিত যোগ্যতা থাকা দরকার বলে তিনি মনে করতেন।)

১। প্রত্যেকটি কর্মী নিজের হাতে কাটা সুতার বা অখিল ভারত চরখা সঙ্ঘ কর্তৃক অনুমোদিত খাদি নিয়মিতভাবে পরবেন এবং তাঁরা কোন রকম নেশায় আসক্ত হবেন না। হিন্দু হলে তাঁকে স্বয়ং ও তাঁর পরিবারের সবাইকে সকল প্রকারের অস্পৃশ্যতা বর্জন করতে হবে। তিনি সাম্প্রদায়িক ঐক্যের আদর্শে বিশ্বাসী হবেন ও সকল ধর্মমতের প্রতি তাঁর সমান শ্রদ্ধা থাকবে। জাতি বর্ণ ও মতবাদের বাছবিচার না করে নরনারী নির্বিশেষে সকলকে সমান সুযোগ দেবার নীতিতে তিনি বিশ্বাসী হবেন।

২। নিজ কর্মক্ষেত্রের প্রতিটি গ্রামবাসীর সঙ্গে তিনি ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করবেন।

৩। গ্রামবাসীদের ভিতর থেকে তিনি নূতন নূতন কর্মী সংগ্রহ করে তাঁদের শিক্ষা দেবেন ও এই সব শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মীদের একটি তালিকা তাঁর কাছে থাকবে।

৪। তাঁকে দৈনিক কর্মবিবরণ রাখতে হবে।

৫। কৃষি ও কুটির শিল্পের দ্বারা গ্রামবাসীদের স্বাবলম্বী ও স্বরাট্ করার জন্য তিনি তাঁদের সংগঠিত করবেন।

৬। গ্রামবাসীদের তিনি সাফাই ও স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়ে শিক্ষা দেবেন এবং তাঁদের ভিতর থেকে রোগ-ব্যাধি ও অস্পৃশ্যতা নিবারণের জন্য সর্ববিধ প্রযত্ন করবেন।

৭। হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ঘের নীতি অনুযায়ী নঈ তালিমের পদ্ধতি গ্রহণ করে তিনি গ্রামবাসীদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করবেন।

হরিজন, ১৫-২-১৯৪৮

১৬

সরকার ও গ্রাম

সরকার কি করতে পারে

কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর স্বভাবতই এই প্রশ্ন ওঠে যে, তাঁরা খদ্দর ও অন্যান্য কুটির শিল্পের বিকাশের জন্য কি করবেন। এর জন্য পৃথক্ মন্ত্রী নিয়োগ করা হোক বা না হোক, এর জন্য একটা স্বতন্ত্র বিভাগ অবশ্যই খুলতে হবে। আজকের এই অন্নবস্ত্রের অভাবের সময় এই বিভাগ দেশের সবচেয়ে বেশী সেবা করবে। অখিল ভারত চরখা সঙ্ঘ ও অখিল ভারত গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘের মত বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের সেবা মন্ত্রীরা পেতে পারেন। যৎকিঞ্চিৎ পুঁজি বিনিয়োগ করে যথাসম্ভব স্বল্প সময়ে আজ সমগ্র ভারতবর্ষকে খাদি বস্ত্র পরানো যায়। প্রাদেশিক সরকারগুলি গ্রামবাসীদের বলে দেবেন যে তাঁদের নিজেদের প্রয়োজনীয় খদ্দর উৎপাদন করে নিতে হবে। এর ফলে নিজে থেকেই স্থানীয় উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা কার্যকরী হয়ে যাবে। আর এই ব্যবস্থায় অন্ততঃ কিছুটা পরিমাণে বস্ত্র শহরবাসীদের জন্য উদ্বৃত্ত হবে ও তার ফলে কাপড়ের কলগুলির উপর থেকে চাপ কমে যাবে। আর তা হলে এ দেশের কলগুলি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বস্ত্রাভাব দূর করার কাজে সহায়তা করতে পারবে।

এই কর্মসূচীকে কি ভাবে বাস্তবে রূপায়িত করা যায়?

সরকার গ্রামবাসীদের এই মর্মে জানিয়ে দেবেন যে, একটা নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে তাঁদের নিজেদের গ্রামের জন্য প্রয়োজনীয় খদ্দর উৎপাদন করে নিতে হবে এবং তার পর তাঁদের আর বাইরের কাপড় সরবরাহ করা হবে না। এর পরিবর্তে সরকার কাপাসের বীজ বা প্রয়োজন বুঝলে কাপাস তুলা বিনা-মুনাফায় সরবরাহ করবেন এবং

বস্ত্র উৎপাদন করার যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন মূল্য দিয়ে পাঁচ বৎসর বা তারও অধিক সময়ের কিস্তিতে তার দাম উশুল করে নেবেন। যেখানে প্রয়োজন সেখানে সরকারের তরফ থেকে কাতাই-বুনাই-এর শিক্ষক যাবে এবং গ্রামবাসীরা খদ্দর দ্বারা নিজেদের প্রয়োজনপূর্তি করে নেবার পর যেটুকু উদ্বৃত্ত হবে, সরকার তা কিনে নেবেন। কোন হৈচৈ হট্টগোল ব্যতিরেকে এই পদ্ধতিতে দেশের বস্ত্রাভাব দূর হয়ে যাবে এবং এর জন্য ব্যবস্থা-খরচও খুব কম পড়বে।

গ্রামের জরিপ করতে হবে এবং বাইরের কোন সাহায্য ছাড়া বা যৎসামান্য সহায়তায় গ্রামের প্রয়োজনীয় বা গ্রাম থেকে চালান দেবার উপযুক্ত যে সব পণ্য উৎপাদন করা যেতে পারে, তার একটি তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। ঘানির তেল ও খইল, ঘানিতে উৎপন্ন জ্বালানী তেল, ঢেঁকি-ছাঁটা চাল, তাল ও খেজুর গুড়, মধু, খেলনা, মাদুর, হাতে তৈরী কাগজ ও সাবান ইত্যাদি এর মধ্যে পড়ে। যথোচিত যত্ন নেওয়া হলে বর্তমানে মৃত বা মৃতপ্রায় গ্রামগুলি আবার কর্মচাঞ্চল্যে কলগুঞ্জন করে উঠবে এবং নিজেদের ও ভারতবর্ষের শহরগুলির পক্ষে প্রয়োজনীয় পণ্যসম্ভার সরবরাহের ব্যাপারে তাদের অসীম ক্ষমতার পরিচয় দেবে।

এর পর ভারতের অসংখ্য পশুসম্পদের কথা ধরা যেতে পারে। শোচনীয় অবহেলার দরুন আজ এই সম্পত্তি বিনষ্টপ্রায়। গো-সেবা সঙ্ঘ এখনও পূর্ণমাত্রায় অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সমর্থ না হলেও এ বিষয়ে যথেষ্ট মূল্যবান সহায়তা দান করতে পারে।

বুনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতির বিকাশ না হবার জন্য গ্রামবাসীদের শিক্ষার ক্ষুধা অপূর্ণ রয়ে গেছে। হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ঘ এই অত্যাবশ্যক বস্তুর অভাবপূর্তি করতে পারে।

হরিজন, ২৮-৪-১৯৪৬

পরিশিষ্ট—ক

শ্রীযুক্ত ব্রেনের পল্লী-পুনর্গঠন পরিকল্পনা

(পাঞ্জাবের গুরগাঁও জেলার ডেপুটি কমিশনার বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত ব্রেনের (Mr. Brayne) পল্লী-পুনর্গঠন কর্মসূচীর সমলোচনা করে লালা দেশরাজ একটি প্রবন্ধ লেখেন। এ বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশের সূত্রে গান্ধীজী কর্তৃক নিম্নলিখিত রচনাটি লিখিত হয়।—অনুবাদক)

প্রবন্ধটি (লালা দেশরাজ লিখিত) প্রকাশিত হবার সময় আমি শ্রীযুক্ত ব্রেনের 'দি রিমেকিং অফ ভিলেজ ইণ্ডিয়া' নামক পুস্তকটি অধ্যয়ন করি। বইটি তাঁর 'ভিলেজ আপলিফট ইন ইণ্ডিয়া' নামক মূল পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ। লালা দেশরাজের রচনাটি পড়লে মনে হবে যে গুরগাঁও-এর পল্লী-পুনর্গঠনের পরিকল্পনা এক রকম ব্যর্থ হয়েছে। শ্রীযুক্ত ব্রেন সেখান থেকে চলে আসার পর যে সব ব্যক্তি তাঁর প্রেরণায় বা তাঁর চাপে পড়ে কাজ করছিলেন, তাঁরা যেন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছেন। সারের গর্তগুলি উপেক্ষিত অবস্থায় পড়ে আছে, নূতন ধরনের লাঙ্গলে মরচে পড়ছে এবং ছেলেমেয়েদের সহশিক্ষাও উঠে যাবার মুখে।

এই ব্যর্থতার কারণ আবিষ্কার করা খুব কঠিন নয়। পূর্বোক্ত সংস্কার ভিতরের তাগিদে হয় নি, ওসব বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ব্রেন সাহেব তাঁর সরকারী পদের সুযোগে অধস্তন কর্মচারী এবং গ্রামবাসীদের উপর যথাসম্ভব চাপ দিয়েছিলেন; কিন্তু চাপ দিয়ে মানুষের মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করা যায় না, তাই সাফল্যের মূলসূত্র এই বিশ্বাসেরই অভাব ওখানে পরিলক্ষিত হয়। তিনি ভেবেছিলেন যে কার্যসূচীর পরিণাম জনসাধারণের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করবে। কিন্তু সমাজসংস্কার ওভাবে হয় না। সমাজসংস্কারকের চলার পথে গোলাপ বিছানো নেই, আছে কাঁটা এবং তাঁকে তাই চিন্তা করে পদক্ষেপ করতে হয়। তাঁর চলা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, হঠাৎ লাফ দেবার কথা তিনি কল্পনাও করতে পারেন না। শ্রীযুক্ত ব্রেন অধীর হয়ে এক লাফে অনেকখানি পথ এগিয়ে যাবার কথা ভেবেছিলেন, তার জন্যই তাঁকে ব্যর্থ হতে হল।

কোন সরকারী কর্মচারী সমাজসংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলে তাঁকে এ কথা বুঝে নিতে হবে যে, এ কাজের পক্ষে তাঁর সরকারী পদ সহায়ক না হয়ে প্রতিকূল প্রমাণিত হতে পারে। তাঁর বীরোচিত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও জনসাধারণ তাঁকে ও তাঁর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করতে পারে। কোথাও কোন বিপদের সম্ভাবনা না থাকলেও জনসাধারণ বিপদের গন্ধ পেতে পারে আর অনেক সময় তারা কাজ করলেও হয়তো দেখা যাবে যে তার মূলে নিজেদের অন্তরের তাগিদের চেয়ে সরকারী কর্মচারীদের খুশি করার প্রবৃত্তিই বেশী।

শ্রীযুক্ত ব্রেনের সাফল্যের পথে আর একটি বাধা হচ্ছে টাকা পয়সা পাবার ব্যাপারে তাঁর মারাত্মক সুবিধা ছিল। আমার মতে সমাজসংস্কারকের পক্ষে সবশেষের প্রয়োজনীয় বস্তু হচ্ছে অর্থ। তাঁর যথাযথ প্রয়োজন মত অর্থ অযাচিতভাবে তাঁর কাছে আসে। ব্যর্থতার কারণস্বরূপ যে সব সমাজসংস্কারক অর্থাভাবের দোহাই দেন, অমি চিরকালই তাঁদের অবিশ্বাস করি। উদ্যম, সম্যক্ জ্ঞান ও আত্মবিশ্বাস থাকলে চিরকালই আর্থিক সহায়তা পাওয়া যায়। কিন্তু শ্রীযুক্ত ব্রেন তাঁর কর্মসূচীর সাফল্যের জন্য আত্মবিশ্বাস বা জনসাধারণের উপর আস্থার তুলনায় টাকার উপর বেশী ভরসা করেছিলেন। তাই লালা দেশরাজের অনুমান অনুসারে এক বৎসরে ৫০,০০০ টাকা সাহায্যস্বরূপ পাওয়া সত্ত্বেও তিনি অভিযোগ করেছেন যে, নিছক টাকার অভাবে অনেক উন্নয়নমূলক কাজ মুলতুবী রাখতে হয়েছে। তাঁর উচ্চাশার শেষ নেই।

প্রত্যক্ষ প্রয়োগের কথা বাদ দিলেও বইটি মনোযোগ দিয়ে পড়া কর্তব্য। শ্রীযুক্ত ব্রেনের সততা সম্বন্ধে কোন কথাই উঠতে পারে না। পুস্তকটির পাতায় পাতায় এর প্রমাণ মেলে। গ্রন্থকারের অনেক সুপারিশেরই মূল্য মূল্যাতীত। পুস্তকটি সুদক্ষভাবে লিখিত এবং যাঁরা পল্লী সংস্কারের কাজ করতে চান, তাঁদের অনতিবিলম্বে শ্রীযুক্ত ব্রেনের এই গ্রন্থটি পড়ে ফেলা দরকার। শ্রীযুক্ত ব্রেনের মতে গ্রামের দোষ-ত্রুটি নিম্ন প্রকারের :—

১। চাষীদের কৃষিকর্মের পদ্ধতি ভাল নয়।

২। তাদের গ্রাম নোংরা এবং তারা আবর্জনা, ময়লা, নানাবিধ রোগ ও দুঃখকষ্টের মধ্যে থাকে।

৩। তাদের সংক্রামক ব্যাধির করুণার উপর নির্ভর করে টিকে থাকতে হয়।

৪। যা সম্পদে রূপান্তরিত হতে পারত তাকে তারা নষ্ট করে।

৫। গ্রামের নারী জাতিকে তারা হীনতা ও দাসত্ব বন্ধনে বন্দী করে রাখে।

৬। নিজের ঘর-সংসার বা গ্রামের কল্যাণের প্রতি তাদের কোনই দৃষ্টি নেই এবং নিজের ও নিজ চতুষ্পার্শ্বের আর সকলের অবস্থার উন্নতির জন্য তারা কোন রকম চিন্তা-ভাবনা বা প্রয়াস করতে অভ্যস্ত নয়।

৭। গ্রামবাসী সকল রকমের পরিবর্তনের বিরোধী। সে নিরক্ষর এবং অন্যান্য সভ্য দেশ বা তার নিজের দেশেরই অপরাপর প্রান্তে গ্রামবাসীরা কি ভাবে উন্নতি করে চলেছে এবং ইচ্ছা করলে সেও কি ভাবে তাদের মত উন্নতি করতে পারে এ সম্বন্ধে সে অজ্ঞ, অচেতন।

পূর্বোক্ত বর্ণনায় অনেক অতিরঞ্জন আছে। ভারতীয় কৃষকদের চাষ করার পদ্ধতি নিঃসন্দেহেই খারাপ নয়। অনেকের কাছ থেকেই এ কথার সমর্থন পাওয়া গেছে যে, তারা মোটামুটি ভালভাবে চাষ করার জ্ঞান রাখে এবং এই জ্ঞানকে মোটেই তাচ্ছিল্য করা যায় না। তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ত্রুটীকে বোধ হয় আমরা অস্বীকার করতে পারি না। সম্পূর্ণভাবে না হলেও চতুর্থ ত্রুটীটিকে বহুলাংশে নিরাধার বলতে হবে। কারণ বাস্তব অবস্থা হচ্ছে এই যে, নষ্ট করার মত কোন সম্পদই তাদের থাকে না। পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম দোষ বহুলাংশে সত্য। এর প্রতিকারের জন্য শ্রীযুক্ত ব্রেন অষ্টাদশবিধ কর্মসূচী উপস্থাপিত করেছেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে সেগুলি নিম্নরূপ—

১। ভাল জাতের গোরু বলদ রাখতে হবে।

২। আধুনিক কৃষিযন্ত্র ব্যবহার করতে হবে।

৩। ভাল বীজ ব্যবহার করা।

৪। জল সেচের জন্য পারসিয়ান হুইল বা রাইট ব্যবহার।

৫। মাটিতে গর্ত করে সার জমানো।

৬। ঘুঁটে তৈরি বন্ধ করা।

৭। গ্রামের ব্যাঙ্কের সাহায্য নেওয়া।

৮। ক্ষেতের সমানতা দেখে কেয়ারী তৈরি করতে হবে যাতে বৃষ্টির জল নষ্ট না হয়।

৯। চকবন্দী করা।

১০। কুয়ার জল দ্বারা ক্ষেতে সেচ দিয়ে সারা বছর ফসল ফলানো।

১১। খালি জায়গা পেলেই তাতে বৃক্ষ রোপণ।

১২। পশুদের রোগ-প্রতিষেধক টিকা দেওয়া।

১৩। ফসলের শত্রু ইঁদুর কীট পতঙ্গ ইত্যাদি বিনাশ করা।

১৪। গোচারণ-ভূমির ব্যবস্থা করা।

১৫। যতটা জমি একজনের আছে তার অর্ধেকটায় ভাল করে চাষ করে বাকী অর্ধেক গোচর করা।

১৬। কুয়ার জল ক্ষেতে নিয়ে যাবার জন্য ভূমিগর্ভস্থ নালা তৈরি করা।

১৭। বালুকা স্তূপের প্রসার বন্ধ করার জন্য তাতে যথোপযুক্ত বৃক্ষ-লতার চাষ।

১৮। গ্রামের নালা আর পয়ঃপ্রণালীগুলিকে সোজা ও পরিষ্কার করে সহজে জল-চলাচলের উপযুক্ত করা।

এর অনেকগুলি সুপারিশই প্রশংসনীয়। যে কটি সুপারিশ নূতন, সেগুলির সম্বন্ধে ভালভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে হয়। তবে পুরাতন অনেকগুলি সুপারিশ পরীক্ষা যোগ্য নয়। কৃষির আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে এই কথা বলব যে, এই সব যন্ত্রপাতির বিরুদ্ধে কোনরকম পক্ষপাতমূলক ধারণা পোষণ না করে পনের বৎসর যাবত ওর অনেকগুলি নিয়ে আশ্রমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, ওই সব যন্ত্রপাতি একেবারে অকেজো। পাঠকগণকে আমি আশ্বস্ত করতে চাই যে আমরা নিয়মমাফিক পদ্ধতিতেই যন্ত্রপাতিগুলি ব্যবহার করেছিলাম। কৃষিকার্যে আমরা দ্রুত উন্নতি করছি, তবে খুব অল্পসংখ্যক আধুনিক কৃষিযন্ত্রই আমাদের কাজের উপযুক্ত।

আধুনিক কৃষিযন্ত্র নিয়ে আশ্রমে যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে তার সম্বন্ধে পরে কোন সময় আমি বিস্তারিতভাবে লিখব। ইতোমধ্যে আধুনিক কৃষি-যন্ত্রপাতির ভক্তদের উদ্দেশে আমি বলব আপনারা ধীরে ত্বরান্বিত হোন। সার

জমানো এবং ঘুঁটে তৈরি করে নির্বিচারে সার নষ্ট করার প্রথা বন্ধ করার প্রস্তাব নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য সুপারিশ। আর কৃষিক্ষেত্রের আয়তন ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হয়ে যাওয়াও এক ভীষণ ত্রুটী। এই-জাতীয় অর্থহীন ব্যাপার বন্ধ করার জন্য কঠোর আইনই একমাত্র উপায়। এই সব প্রস্তাবকে সাফল্যজনকভাবে কাজে লাগাতে হলে যথার্থ শিক্ষা ও আত্মবিশ্বাস প্রয়োজন। বুভুক্ষু কৃষক শিক্ষা বা আত্মবিশ্বাসের ধার ধারে না। কারণ তার ধারণা, দারিদ্র্য এমন একটা জন্মগত ব্যাপার যার হাত থেকে কিছুতেই ত্রাণ পাবার উপায় নেই। সাফাই সম্বন্ধেও শ্রীযুক্ত ব্রেন মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। ঠিক মত খোঁড়া গর্তে ছাড়া অন্যত্র কোথাও তিনি ঘর-ঝাড়ু-দেওয়া ময়লা, আবর্জনা, গোবর বা ছাই ইত্যাদি ফেলার পক্ষপাতী নন। সারের গর্তকে পায়খানা হিসাবে ব্যবহারের পদ্ধতি সম্বন্ধে তিনি বিস্তৃত নির্দেশ দিয়েছেন। নিম্নলিখিত দীর্ঘ কিন্তু যথার্থ শিক্ষামূলক পংক্তিগুলি উদ্ধৃত করার প্রলোভন সংবরণ করতে পারলাম না :

> গ্রামের চতুর্দিকে এবং ভিতরে স্তূপীকৃত এই আবর্জনারাশি এবং গ্রামের বাইরে, এমনকি, অনেক সময় ভিতরেও পুরু আস্তরের মত জমা মল শুকিয়ে যাবার পর হাওয়ার বেগে গ্রামের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং মানুষ ও পশুর পায়ে পায়ে সব কিছুর সঙ্গে মিশে যায়। এ আপনার খাদ্য ও পানীয়ের ভিতরে পড়ে, সকলের নাকে চোখে ঢুকে যায় ও এই ভাবে প্রতিটি শ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে গিয়ে পৌঁছয়। এই ভাবে এই মল আপনার চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ুমণ্ডল এবং খাদ্য ও পানীয়ের অঙ্গ স্বরূপ হয়ে যায়। ফলে আপনি ও আপনার সন্তান গ্রামের আবর্জনা দ্বারা প্রত্যহ বিষজর্জরিত হচ্ছেন। এ ছাড়া এর ফলে নূতন অসংখ্য মাছির জন্ম হয় এবং এই সব মাছি প্রথমে আবর্জনার উপর বসার পর আপনার খাদ্য, আপনার বাসনপত্র ও আপনার ছেলেদের চোখে মুখে বসে। আর মনে রাখবেন যে মাছিরা আপনার বাড়ীতে আসার পূর্বে জুতা খুলে হাত পা ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে আসে না। আপনি এবং আপনার পরিবারের আর সকলে স্থায়ী ভাবে রোগের শিকার হয়ে তাড়াতাড়ি শ্মশানে যাবার এর চেয়ে ভাল কোন ব্যবস্থার কথা কল্পনা করতে পারেন ?

লেখকের মতে, "গুরগাঁও-এর গ্রামের বাড়ীগুলি প্রাগৈতিহাসিক যুগের গুহার প্রত্যক্ষ একালীন সংস্করণ।" তিনি তাই চান যে, গ্রামবাসীরা নিজেদের ঘরে জানালাও লাগাক। তিনি বসন্ত রোগের প্রতিরোধের জন্য বিনা ব্যয়ে টিকা দেবার ব্যবস্থা করার পক্ষপাতী, প্লেগের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তিনি প্লেগ-ইঞ্জেকশন নেবার কথা ও ইঁদুর মারার কথা বলেছেন, কলেরার প্রতিষেধক হিসাবে চতুর্দিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ও পানীয় জল সংগ্রহের যথোচিত ব্যবস্থা করার প্রস্তাব করেছেন, এইরূপ ম্যালেরিয়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য কুইনাইন ও মশারির বন্দোবস্ত করার পরিকল্পনা করেছেন। তবে শ্রীযুক্ত ব্রেন টিকা ও ইঞ্জেকশন ইত্যাদির স্বপক্ষে যেরকম দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে অভিমত প্রকাশ করেছেন তা একটু বিস্ময়কর। কারণ আমরা জানি যে, চিকিৎসা-বিশেষজ্ঞরাও এ সম্বন্ধে খুবই সতর্কতা সহকারে কথা বলে থাকেন। টিকার অসারতা নিত্য প্রমাণিত হচ্ছে। সাময়িক প্রতিকার-ব্যবস্থা হিসাবে প্লেগ ও অন্যান্য রোগের ইঞ্জেকশনের যে মূল্যই থাকুক—যদি আদৌ তাদের কোন মূল্য থেকে থাকে—সেগুলি আসলে আত্মঘাতী প্রতিকার-ব্যবস্থা এবং এগুলি প্রয়োগের ফলে মানুষ দুর্বল হয়ে পড়ে ও তার সত্যিকার মরণের পূর্বে আরও অনেবার মরণ হয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে যে প্লেগ বা বসন্তের ভয় থাকে না এর স্বপক্ষে বহু প্রমাণ আছে। এর কারণ এই যে, উভয় রোগই নোংরামি ও অপরিচ্ছন্নতা সঞ্জাত। চতুর্দিক পরিষ্কার রাখা এবং পানীয় ও রন্ধনকার্যের জন্য পরিষ্কার জল ব্যবহার করা কেবল কলেরার প্রতিষেধক হিসাবেই ভাল নয়, বহু দিক থেকে এতে লাভ আছে। কিন্তু দুধ না পেলে কুইনাইনে কোন লাভ নেই, এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে, দেশের জনসাধারণের মশারি কেনার সঙ্গতি নেই। শ্রীযুক্ত ব্রেন একাধিক বার ভারতবর্ষের জনসাধারণের মজ্জাগত আর্থিক দুর্গতি সম্বন্ধে অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। জনসাধারণের সঙ্গতির বহির্ভূত প্রতিষেধকের কথা বলা একান্তভাবে নিরর্থক। সংস্কারকের স্বপ্ন সার্থক হলে জনসাধারণের পক্ষে কতটুকু কি করা সম্ভব হবে তার আলোচনা যখন সেই সংস্কারপর্ব চলছে তখন অপ্রয়োজনীয়।

অর্থের অপচয় বন্ধ করার জন্য তিনি নিম্নলিখিত প্রস্তাব দিয়েছেন:

> বিভিন্ন সামাজিক ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষ্যে যে সব অসম্ভব ব্যয়বাহুল্য করা হয়, তার কথা ভুলে যেতে হবে। গয়না-পত্র, বিবাহের আড়ম্বর ও ঝগড়া-বিবাদ করে অর্থের অপচয় করবার অভ্যাস বর্জন করতে হবে।

আমার আশঙ্কা হয় যে, এই সব 'অসম্ভব ব্যয়ের' অস্তিত্ব শ্রীযুক্ত ব্রেনের কল্পনাতে ছাড়া অন্যত্র নেই বললেও চলে। দেশের বিপুলসংখ্যক মানুষের হাতে কোন রকম উৎসব-অনুষ্ঠানে খরচ করার মত অর্থসঙ্গতি নেই। অবশ্য গয়না জমিয়ে রাখার কথা একটা প্রাচীন সরকারী চাল। এ যাবত আমি ভারতের সর্বত্র লক্ষ লক্ষ মহিলার মধ্যে ঘুরেছি। আমি স্বয়ং গহনা পরার প্রথার বিরুদ্ধে বলেছি ও বহু ভগ্নীকে অলঙ্কারভারমুক্ত করেছি। আমি জানি যে গহনায় সৌন্দর্যবৃদ্ধি হয় না। তবে উৎসব-অনুষ্ঠানকারীদের সংখ্যা যদি বেশী না হয়, তা হলে যাঁরা গহনা পরতে পারেন তাঁদের সংখ্যা আরও কম। ভারতবর্ষের অধিকাংশ নারীই হয় বিচিত্র রকমের সব পাথরের আর নয় কাঠের টুকরার গয়না পরে থাকেন। অনেকে পিতল বা তামার গহনা পরেন এবং কেউ কেউ রূপার বালা বা মল পরে থাকেন। সোনা যাদের গায়ে দেখা যায়, তাদের সংখ্যা নগণ্য। সুতরাং অলঙ্কারকে নগদ টাকায় পরিণত করে ব্যাঙ্কে রেখে দেওয়ার প্রস্তাব আমার মতে খুবই যুক্তিযুক্ত হলেও পল্লী-সংস্কারের কার্যক্রমের অঙ্গ হিসাবে এর বিশেষ কোন মূল্য নেই। ঝগড়া-বিবাদ সম্বন্ধেও ওই একই কথা প্রযোজ্য। মামলা মোকদ্দমার সংখ্যা যথেষ্ট এবং সারা ব্যাপারটা লজ্জাজনক হওয়া সত্ত্বেও এসব কিন্তু মুষ্টিমেয়-সংখ্যক বিত্তবানের মধ্যেই সীমিত। পক্ষান্তরে, অধিকাংশ গ্রামবাসীই দরিদ্র এবং তাই পল্লী-সংস্কারের কার্যক্রম উপলক্ষ্যে আমাদের অসংখ্য, অসহায় অজ্ঞ ও আশা-আনন্দবিহীন সংখ্যাগুরুর কথা সর্বাগ্রে বিবেচনা করতে হবে।

সাংসারিক শান্তি কায়েম রাখার জন্য শ্রীযুক্ত ব্রেন নারীদের মানুষের মর্যাদা দিয়ে ঘরের মাননীয়া ও সমান অধিকারযুক্ত অংশীদারের মর্যাদা দেবার প্রস্তাব করেছেন। মেয়েরা বেশ বড় না হওয়া পর্যন্ত তাদের ছেলেদেরই মত তিনি স্কুলে পাঠানোর সমর্থক। শ্রীযুক্ত ব্রেন বাল্যবিবাহ প্রথার বিরোধী।

নারী জাতির অধিকার সম্বন্ধে তিনি অতীব আগ্রহশীল এবং অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় তিনি তাদের অধিকারাবলীর অনুকূলে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর রচনার নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদ দুটি বিবেচনার যোগ্য :

> আপনার স্ত্রী আসন্নপ্রসবা হলে তাকে একটি অন্ধকার ও নোংরা ঘরে পাঠিয়ে আপনারা ঝাড়ুদারের বৌকে খবর দেন। কিন্তু নিজের হাত ভেঙে গেলে ঝাড়ুদারকে ডাকেন না কেন? নিজেদের সমাজের দুই-চারিটি মহিলাকে প্রসূতি পরিচর্যাকারিণীর শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেন না কেন? ঝাড়ুদারের স্ত্রী যদি প্রসূতি পরিচর্যাকারিণী হতে পারে তবে তার ডাক্তার হতেই বা বাধা কি? আপনার স্ত্রী তাঁর জীবনের এক সঙ্কটজনক মুহূর্তে গ্রামের নিম্নতম শ্রেণীর একটি রমণীর করুণা-নির্ভর হবার পরিবর্তে নিজেরই কোন আত্মীয়-স্বজনের সেবাধীন থাকা কি অনেক ভাল নয়? উচ্চশ্রেণীর মহিলাদের কাছে প্রসূতি-পরিচর্যাকারিণী বা দাই-এর কাজের চেয়ে মহত্তর কাজ আর নেই। আপনার স্ত্রী বা পরিবারের অপরাপর মহিলাদের বসবাসের জন্য ঘরের সবচেয়ে অন্ধকার ও সর্বাপেক্ষা কম বাতাসযুক্ত কামরা নির্দিষ্ট করবেন না। পরিবারস্থ মহিলারা আপনারই মত সংসারের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ এবং তাঁদের অসুস্থতা আপনার নিজের অসুস্থতার মতই চিন্তার বিষয়। আপনি না হয় সময় সময় বাইরের খোলা হাওয়ায় ঘুরে স্বাস্থ্য বজায় রাখলেন। কিন্তু আপনার পরিবারের নারী ও শিশুদের অধিকাংশ সময়ই ঘরে কাটাতে হয়। তাই তাঁদের বাড়ীর সব চেয়ে বেশী আলো-বাতাস-যুক্ত অংশে থাকতে দিন।

আর একটি কাব্যসুষমামণ্ডিত অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করা হচ্ছে :

> মানুষই একমাত্র জীব যে নিজের কন্যা এবং পুত্র সন্তানের ভিতর পার্থক্য করে এবং কন্যাকে হীন জ্ঞান করে। একদা আপনার মা বালিকা ছিলেন। আপনার স্ত্রীও কারও বাড়ীর মেয়ে ছিলেন। আবার আপনার মেয়েরাও একদিন মা হবে। তাই মেয়েরা যদি হীন হয়, তা হলে আপনি স্বয়ং হীন।"

আমি আশা করি যে পাঠকবর্গ কুকুর সম্বন্ধে তার নিম্নোক্ত বক্তব্যের প্রশংসা করবে :

> কুকুরকে মানুষের বন্ধু বলা হয়ে থাকে। গুরগাঁও-এ কিন্তু কুকুরের সঙ্গে মেয়েদের চেয়ে ভাল ব্যবহার করা হয় না। কুকুর এখানে যেন মানুষের শত্রু। কুকুর অবশ্যই পুষতে পারেন ; কিন্তু তাকে নিয়মিত খেতে দিন। কুকুরের একটা নাম দিন, তার গলায় বগলেশ থাকুক। কুকুরকে ভাল শিক্ষা দিন এবং জীবটির প্রতি যথোচিত দৃষ্টি রাখুন। অনাদৃত মালিকবিহীন কুকুরকে গ্রামের পথে ঘাটে ঘুরে বেড়াতে দেবেন না। এরা আপনার খাবারে মুখ দেবে, রাত্রে চেঁচিয়ে ঘুম নষ্ট করবে এবং শেষ অবধি পাগল হয়ে গিয়ে আপনাদেরই কামড়াবে।

এ ছাড়াও এ পুস্তকে বহু মূল্যবান বিষয় আছে। গ্রামের এমন কোন ত্রুটী নেই যা লেখকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়েছে। গ্রামের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁর পরিকল্পনাকে আমি সবিশেষ যুক্তিপূর্ণ মনে করি এবং এই পরিকল্পনার আরও উন্নতির অবকাশ আছে বলে বোধ হয় না। নিম্নোক্ত পংক্তি কটি উদ্ধৃত না করে থাকতে পারলাম না।

> গ্রামের বিদ্যালয়ের লক্ষ্য হবে অধিকতর বুদ্ধিমান স্বাস্থ্যবান ও সুখী গ্রামবাসী সৃষ্টি করা। কোন কৃষকের ছেলে বিদ্যালয়ে এলে বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভের ফল স্বরূপ তার ভিতর এমন প্রস্তুতি আসা দরকার যে ফিরে গিয়ে যেন সে বাবার লাঙ্গলের মুঠো আরও শক্ত হাতে ধরতে পারে। বাবার চেয়েও অধিকতর দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তা সহকারে যেন সে নিজেদের বংশগত পেশা চালিয়ে যেতে পারে। এ ছাড়া ছেলেরা স্বাস্থ্যসঙ্গত পদ্ধতিতে জীবনযাত্রা পরিচালনা করা ও সংক্রামক ব্যাধির হাত থেকে বাঁচার প্রক্রিয়া শিখবে। যে সব ছেলেমেয়ে শীঘ্রই অন্ধ বা অন্য কোন রকমে শারীরিক দিক থেকে অশক্ত হয়ে যাবে, অথবা যারা পূর্ণ যৌবন-প্রাপ্তির পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হবে, তাদের এক গাদা পড়িয়ে লাভ কি? বাসগৃহ যদি নোংরা ও অগোছাল থাকে, সমগ্র পরিবারের

> যদি সংক্রামক ব্যাধির এক ধাক্কায় বিলুপ্ত হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে, অথবা শিশুদের যদি অন্ধ বা অন্যভাবে অঙ্গহীন হবার ভয়ে কাল কাটাতে হয়, তা হলে শিক্ষার আর প্রয়োজন কি?

এইজন্য তিনি এমন একজন লোককে গ্রামের বিদ্যালয়ে শিক্ষক রূপে নিতে রাজী নন, যিনি সাধারণভাবে লিখতে পড়তে ও হিসাব শেখানোর বেশী আর কিছু ছেলেদের শেখাবেন না। শিক্ষককে যথার্থই গ্রামের নেতা হতে হবে। তিনি হবেন গ্রামের আলোকস্তম্ভ স্বরূপ ও সংস্কৃতির পীঠস্থল। তিনি স্বভাবতই জনসাধারণের আস্থাভাজন হবেন। গ্রামবাসী প্রয়োজনে তাঁর কাছে তাদের সমস্যাবলী নিয়ে উপস্থিত হবে এবং মনে সংশয় জাগলে বা কোন রকমের অসুবিধা দেখা দিলে তাঁর কাছে বুদ্ধি-পরামর্শ নিতে আসবে।

> শিক্ষককে গ্রামজীবনের উপযুক্ত ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। তিনি মুখে যা প্রচার করেন, কাজে তাকে রূপ দেবেন। যে সব উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার কথা তিনি বলেন, তিনি স্বয়ং হাতে-কলমে সেগুলিকে কাজে খাটাবার চেষ্টা করে সৎদৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন। শ্রম ও সমাজসেবার মর্যাদা হবে তাঁর বাণী। লেখা-পড়া শেখানোর জন্য তাঁর যতটা ইচ্ছা, গ্রাম সাফাই বা লাঙ্গল মেরামতের জন্যও তাঁর ততখানি আগ্রহ থাকবে।

এবার আমাকে লেখার রাশ টানতে হবে এবং পল্লী-পুনর্গঠনের জন্য তিনি যে মূল্যবান গ্রন্থখানি রচনা করেছেন সেটি পড়ার সুপারিশ করে সন্তুষ্টি মানতে হবে। মোটামুটিভাবে বিচার করতে গেলে তাঁর পরিকল্পনা ভাল ও বাস্তবতা গুণযুক্ত। তবে লালা দেশরাজ যে খবর দিয়েছেন তা যদি সত্য হয়, আর আমার ধারণা তা সত্য, এই পরিকল্পনাকে কার্যান্বিত করার ব্যবস্থা নিতান্ত ত্রুটিপূর্ণ হয়েছে। তবে এর জন্য শ্রীযুক্ত ব্রেন বা তাঁর সহকর্মীরা দায়ী নন। কারণ তাঁদের ইচ্ছা বা প্রয়াস কোনটারই অভাব ছিল না। এর মূল কারণ হচ্ছে এই যে, তিনি ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ সরকারী আবহাওয়া ও ধারা-ধরনের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন নি। তবে তাঁকে যে সব বাধা-বন্ধনের মধ্যে কাজ করতে হয়েছিল তার কথা বিবেচনা করে বলা যায়, অনুরূপ পরিস্থিতিতে আমাদের মধ্যে যে কোন লোককে তাঁর অবস্থাতেই পড়তে হত। আমি

জানি যে শ্রীযুক্ত ব্রেন ভারতের বিরূপ সমালোচনা করেছেন এবং তাঁর ইংরেজ শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে নিজের সীমিত পর্যবেক্ষণের দ্বারা প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত সমূহ উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর এই সব সিদ্ধান্তের সত্যাসত্য সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করার উপায় অত দূরে হয়তো কারও নেই, আর ভারতে ওই সব কথা না বলে সুদূর ইংলণ্ডে গিয়ে বলার দরুন তার বক্তব্য আরও অতিরঞ্জিত বলে মনে হচ্ছে। তবে তিনি ইংলণ্ডে গিয়ে যে সব নিন্দাবাদ করেছেন তা বা তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যর্থতা তাঁর বইটি সম্বন্ধে মতামত দেবার সময় আমাকে প্রভাবিত করতে পারে নি। পল্লী-পুনর্গঠন কার্যে গভীরভাবে আগ্রহশীল সংস্কারক রূপে আমি আন্তরিকতা সহকারে লিখিত একটি পুস্তক থেকে যতটুকু ভাল নেওয়া সম্ভব, তার চেষ্টা করেছি।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৪-১১-১৯২৯

পরিশিষ্ট—খ

প্রয়োজনীয় সংকেত

জে. সি. কুমারাপ্পা

সমবায় সমিতি ঃ কেবল গ্রামীণ শিল্পের বিকাশই নয়, গ্রামবাসীদের মিলিত কর্মপ্রচেষ্টার বিকাশের দিক থেকেও সমবায় সমিতিগুলি আদর্শ প্রতিষ্ঠান। সর্বার্থসাধক গ্রাম সমিতি সমূহ বহুবিধ প্রকারে গ্রামের মঙ্গল সাধন করতে পারে। এর মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ ঃ

১। কুটির শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল ও গ্রামবাসীর প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য মজুত করা।

২। গ্রাম্য পণ্যের বিক্রয়ের বন্দোবস্ত ও গ্রামবাসীর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

৩। বীজ, উন্নত ধরনের কৃষির যন্ত্রপাতি এবং হাড়ের গুঁড়া, মাংস বা মাছের সার, খোল এবং জৈব সার ইত্যাদি বিতরণের ব্যবস্থা করা।

৪। নিজ এলাকার জন্য একটি সর্বসাধারণের প্রয়োজনোপযোগী ষাঁড় পোষা যা প্রজননের কাজে লাগবে।

৫। কর সংগ্রহের ব্যাপারে সরকার এবং জনসাধারণের মাঝখানে মধ্যস্থের কাজ করা, ইত্যাদি।

সমবায় সমিতি সরকার এবং জনসাধারণ উভয় তরফেরই আস্থাভাজন বলে খাদ্যশস্য এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় পরিবহণ ও স্থানান্তরকরণের সময় যে অপচয় হয়ে থাকে সমবায় সমিতির দ্বারা তার অনেকটাই কমানো যেতে পারে। তা ছাড়া, কেন্দ্রীয় কোন জায়গায় খাদ্যশস্য একবার একত্র করা এবং তারপর আবার গ্রামবাসীদের মধ্যে তাকে বিতরণ করার খরচ কমাতেও সমবায় সমিতি সাহায্য করতে পারে। সমবায় সমিতিগুলি যদি গ্রামে খাদ্যশস্য মজুত রাখার ব্যবস্থা করে তা হলে গ্রামীণ স্তরের সরকারী কর্মচারীদের বেতনের একাংশ সহজেই খাদ্যশস্যে দেওয়া চলতে পারে এবং

এইভাবে শস্যে খাজনা নেবার অতীব কাম্য পদ্ধতি প্রবর্তনের পথও প্রশস্ত হতে পারে।

কৃষিকার্য: শস্য উৎপাদন নিম্নোক্ত দুটি বিষয়ের প্রতি নজর রেখে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। (১) অর্থকরী ফসলের পরিবর্তে সম্বন্ধিত এলাকায় নিজের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য ও জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য অন্যান্য পণ্য উৎপাদনের উপযোগী কাঁচা মালের চাষ করার দিকে প্রধানতঃ দৃষ্টি দিতে হবে। (২) শহরের কারখানার পরিবর্তে কুটির শিল্পের উপযোগী কাঁচা মাল উৎপাদনের চেষ্টা করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, কারখানার চাহিদা পূর্তির জন্য মোটা ছিল্‌কাযুক্ত আখ বা লম্বা আঁশবিশিষ্ট তুলার চাষ না করে গুড় তৈরির জন্য ঘানীতে পেষাইয়ের উপযুক্ত পাতলা ছিল্‌কাযুক্ত আখ এবং চরখায় সুতা কাটার জন্য ছোট আঁশের তুলার চাষ করতে হবে। নিজ এলাকার আবশ্যকীয় খাদ্যশস্য ও প্রয়োজনীয় পণ্যের কাঁচা মালের চাহিদা মিটিয়ে যে জমি উদ্বৃত্ত থাকবে তাতে পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রয়োজনীয় ফসলের চাষ করা যেতে পারে। এখন কারখানার মুখ চেয়ে আখ, তামাক, পাট ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য যতটা জমিতে চাষ চলে, ততটা জমির চাষ সম্ভব হলে সম্পূর্ণ-ভাবে বন্ধ করতে হবে নয় তো এর পরিমাণ যথাসম্ভব হ্রাস করতে হবে। কৃষকরা যাতে এই নীতি গ্রহণ করে তার জন্য অর্থকরী ফসলের আবাদের অধীনে জমিতে চড়া হারে অতিরিক্ত কর বসানো চলতে পারে,আর এই-জাতীয় ফসলের চাষ করার জন্য অনুমতি নেবার প্রয়োজন হবে। এর ফলে কৃষকরা নিজেদের প্রয়োজনীয় ফসলের চাষ করা ছেড়ে অর্থকরী ফসলের দিকে ঝুঁকবে না। মোট কথা, দেখতে হবে যে, কৃষিজাত পণ্য ও কারখানার পণ্যের দামের মধ্যে যেন একটা মারাত্মক পার্থক্য না থাকে।

তামাক, পাট, আখ ইত্যাদি অর্থকরী ফসল দুই দিক থেকে ক্ষতিকারক। এর উৎপাদনের ফলে মানুষ এবং পশু উভয়ের খাদ্যেই ঘাটতি পড়ে। খাদ্য-শস্যের চাষ হলে তার খড় পশুখাদ্য স্বরূপ ব্যবহার হতে পারে।

কারখানার জন্য প্রয়োজনীয় আখের চাষ কম হলে গুড়ের উৎপাদনও সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পাবে বলে আশঙ্কা হতে পারে। কিন্তু তাল ও খেজুর গুড়ের দ্বারা এই ঘাটতি সহজেই পূরণ করা যায়। বর্তমানে বহু তাল খেজুরের

গাছ কেবল তাড়ি তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়। তাড়ি তৈরি নিষিদ্ধ করে ওই সব গাছের রসে গুড় তৈরি করা যাবে। আর প্রয়োজন বুঝলে আমাদের চাহিদা পূর্তির জন্য পড়্তি জমিতে সহজেই তাল খেজুরের গাছ লাগানো যায়। আখের পিছনে আজ আমাদের সেরা জমি দিয়ে দিতে হচ্ছে। তা তখন খাদ্যশস্য, ফল এবং তরিতরকারী উৎপাদনের কাজে লাগানো চলবে। ভারতে এখন এসবের খুবই প্রয়োজন।

সেচ : প্রত্যেকটি গ্রামে জলসেচের ব্যবস্থা করার গুরুত্ব সম্বন্ধে দ্বিমতের অবকাশ নেই। কৃষির উন্নতি এরই উপর নির্ভর করে আর এর অভাবে কৃষিকার্য জুয়া খেলার মত হয়ে দাঁড়ায়। গ্রামে গ্রামে নূতন কূপ খনন, পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার ও তার আয়তন বৃদ্ধি ও খাল কাটা ইত্যাদির জন্য আন্দোলন করতে হবে। ধান ও আটার কলে যে সব ইঞ্জিন আজ ব্যবহৃত হচ্ছে সরকার সেগুলিকে বাজেয়াপ্ত করে ক্ষেতে জলসেচ করার কাজে লাগাতে পারে। জলের সুবিধা না থাকলে প্রয়োজন মত সার ক্ষেতে দেওয়া যায় না। কারণ জল ছাড়া কেবল সার ক্ষেতের পক্ষে ক্ষতিকারক।

হরিজন, ১২-৫-১৯৪৬

সার : ঘর এবং পথঘাট ঝাড়ু দেওয়া, ময়লা, মৃত পশুর হাড় এবং মানুষের মল মূত্র ইত্যাদি গ্রামের যে সব আবর্জনা আজ গ্রামকে নোংরা করে, তাকে সহজেই কম্পোস্ট সারে পরিণত করা চলে এবং এই সার গোবরের সারের মতই উত্তম। হাড় ও খোল আজ বিদেশে রপ্তানী করা হয়; কিন্তু এসব গ্রামের বাইরে যেতে দেওয়া উচিত নয়। মৃত পশুর হাড় চুনের ভাঁটিতে একটু পুড়িয়ে নিয়ে গ্রামের চুনাচাক্কি বা ঢেঁকিতে কুটে নেওয়া উচিত। তারপর ক্ষেতে দেবার জন্য এই হাড়ের গুঁড়া কৃষকদের দেওয়া চলতে পারে।

গ্রামে সার তৈরির কাজের ঠিকা দেওয়া যায় এবং দরকার বুঝলে ঠিকাদারকে কিছু অর্থ সাহায্যও করা যায়। এর ফলে গ্রামের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মানই কেবল বাড়বে না, কম্পোস্ট ও অন্যবিধ সার তৈরির কাজে নিযুক্ত ঝাড়ুদাররা এই পদ্ধতির কারণে ব্যবসায়ীর পদে উন্নীত হবে।

তেলের কলগুলি আজ গ্রাম থেকে তৈলবীজ নিয়ে প্রতিদানে কেবল তেল ফিরিয়ে দেয়। খোল তারা বিদেশে চালান করে দেয়। এর ফলে জমি অতীব মূল্যবান খোরাক থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ একেবারে বন্ধ করে দিতে হবে। তৈলবীজকে বাইরে না পাঠিয়ে কেন গ্রামের ঘানীতে পেষাই করতে হবে—এ তার এক মৌলিক কারণ। এই প্রস্তাব কার্যকরী হলে তেল ও খোল দুইই গ্রামে থাকবে এবং মানুষ, পশু ও জমি এ তিনেরই সমৃদ্ধি হবে।

জমির উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধির অজুহাতে এ দেশের কৃষিতে রাসায়নিক সারের প্রবর্তন করার অনেক চেষ্টা হচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় এই রাসায়নিক সার প্রয়োগের অভিজ্ঞতা এই সব অজৈব সারের আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার পক্ষে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। রাসায়নিক সার মাটির উৎপাদিকাশক্তি বাড়ায় না। এ সব আসলে মাটির পক্ষে উত্তেজক ঔষধ বিশেষ। এর প্রয়োগের ফলে আশু জোর ফলন হলেও শেষ অবধি জমির শক্তি হ্রাস পায়। এ ছাড়া রাসায়নিক সার কৃষির পক্ষে অপরিহার্য বহুবিধ কীটাণুর মৃত্যু ঘটায়। তাই অবশেষে এই সব কৃত্রিম সার মাটির পক্ষে হানিকর বলে প্রমাণিত হয়। রাসায়নিক সারের সপক্ষে এত ঢক্কা নিনাদের পিছনে সারের কারখানার মালিকদের স্বার্থ রয়েছে। কৃষির ভালমন্দের প্রতি তিল মাত্র দৃক্‌পাত না করে তাঁরা নিজেদের মাল বিক্রি করার জন্য উদ্‌গ্রীব।

জমির রক্ষণাবেক্ষণ : সারের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন মত জল নিকাশের জন্য নালা কেটে, বাঁধ দিয়ে ভূমির ক্ষয় বন্ধ করতে হবে, তা হলে জমির উৎপাদিকাশক্তি কায়েম থাকবে। চূড়ান্ত বিচারে জমির উর্বরতাই হচ্ছে সব কিছুর মূলে। কারণ এর থেকেই খাদ্যশস্য ও খড় ইত্যাদির আকারে মানুষ ও পশু তাদের শরীর পোষণের উপযুক্ত পুষ্টি পেয়ে থাকে। ভূমির উর্বরতা কমে গেলে উৎপন্ন ফসলের গুণ কমে যাবে এবং তার ফলে জনসাধারণের স্বাস্থ্যেরও অধোগতি হবে। এই জন্য পোষণতত্ত্ব-বিশারদরা কৃষির সঙ্গে স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ আছে বলে ঘোষণা করেন।

বীজ : কৃষির উন্নতির জন্য বাছাই করা উন্নত শ্রেণীর বীজ অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন ভাল বীজ বিতরণ করার সুবন্দোবস্ত। সমবায় সমিতির চেয়ে ভাল ব্যবস্থা এর জন্য হতে পারে না।

গবেষণা: কৃষি-গবেষণার লক্ষ্য অর্থকরী ফসল অর্থাৎ কারখানার উপযুক্ত মোটা ছিল্‌কার আখ, লম্বা আঁশের তুলা বা তামাক ইত্যাদির উন্নয়ন হবে না; খাদ্যশস্য ও কুটির শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা মালের উন্নতি-প্রচেষ্টাই হবে কৃষি-গবেষণার লক্ষ্য।

সুষম খাদ্য উৎপাদনের জন্য ভূমির বিলিব্যবস্থা: খাদ্য সমস্যা বর্তমানে বিরাট রূপ ধারণ করেছে; অদূর ভবিষ্যতে এর সমাধানের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। এই সমস্যার দুটি দিক আছে। অবিলম্বে যে প্রশ্নের সমাধান আবশ্যক তা হচ্ছে খাদ্যের ক্যালরীর ঘাটতি, এবং তারপর দীর্ঘ মেয়াদী সমস্যা—দেহ পোষণের পক্ষে পর্যাপ্ত খাদ্যের ঘাটতি পূরণ করার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রথম সমস্যার সমাধান কঠিন হবে না; কিন্তু দ্বিতীয়টির জন্য বেগ পেতে হবে।

সচরাচর মনে করা হয় যে, এক একর জমিতে অন্নশস্যের চাষ করলে যতটা ক্যালরী পাওয়া যাবে, অন্য কোন ফসলের চাষে তা পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু ক্যালরীর কথা ছেড়ে দিলে, অন্ন-জাতীয় শস্য পোষণতত্ত্বের দিক থেকে নিতান্ত দরিদ্র। সুতরাং কেবল অন্নশস্য থেকেই পুষ্টি আহরণের পরিকল্পনা করলে এর জন্য প্রচুর পরিমাণ শস্যের প্রয়োজন পড়বে। পক্ষান্তরে যদি ফল, তরিতরকারী, বাদাম, তৈলবীজ ইত্যাদি খাদ্য পূর্ণতঃ বা অংশতঃ গ্রহণ করা যায় তা হলে সহজেই পুষ্টিক্ষমতা বিশিষ্ট আহার্য পাওয়া যায় এবং অন্নশস্যের তুলনায় কম পরিমাণে এই সব খাদ্য খেলেও তা সুষম খাদ্য হয়। এমনকি আলু-জাতীয় কন্দ সব্জির একর পিছু ক্যালরীর পরিমাণ অন্নশস্যের চেয়ে বেশী। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, সুষম খাদ্য পাবার পরিকল্পনা দুই দিক থেকে লাভজনক এবং এর দ্বারা আমাদের খাদ্য সমস্যার সমাধান হতে পারে। এর ফলে মাথা-পিছু জমির চাহিদা কমে যায় এবং এর সঙ্গে সঙ্গে শরীর যথোচিত মাত্রায় সর্ববিধ প্রয়োজনীয় পুষ্টিলাভ করে। ফলে দেহ সুস্থ ও সবল থাকে। হিসাব করে দেখা গেছে যে, বর্তমান ভারতবর্ষে খাদ্য উৎপাদনের জন্য মাথা পিছু ০.৭ একর জমি পাওয়া যায়। প্রচলিত কৃষি-ব্যবস্থা অনুযায়ী এই পরিমাণ জমি এক জনের খাদ্যের প্রয়োজনপূর্তির পক্ষে কম। কিন্তু ফসল উৎপাদনের নূতন যে পরিকল্পনার কথা বলা হচ্ছে তাতে ০.৪ একরেই সুষম খাদ্য

পাওয়া সম্ভব। হিসাব করে গ্রামের জমিতে এমন ভাবে ফসলের আবাদ করতে হবে যে গ্রামবাসী যেন আজকের মত কেবল অন্নশস্য পাবার পরিবর্তে সুষম খাদ্যের উপযুক্ত খাদ্যপদার্থ পেতে পারে। সমস্যার এই দিকটি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে গবেষণা করতে হবে এবং তারপর নূতন ভাবে ফসল উৎপাদনের একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে।

চাউল : ১. সমস্ত চালের কল তুলে দিতে হবে, যেমন ত্রিবাঙ্কুরে দেওয়া হয়েছে।

২. চাল ছাঁটাইয়ের জন্য ব্যবহৃত সমস্ত "হলার" (Hauler) একেবারে বন্ধ করে দিতে হবে।

৩. আকাঁড়া চালের অধিকতর পুষ্টির গুণ সম্বন্ধে জনসাধারণকে সচেতন করে তুলতে হবে এবং এই চালের ভাত রাঁধার প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষভাবে বা চলচ্চিত্রের সাহায্যে দেখাতে হবে। চাল ছাঁটাই করা একেবারে নিষিদ্ধ করে দিতে হবে, অথবা ছাঁটাইয়ের মাত্রা খুব শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

৪. যে সব ধান্য উৎপাদনকারী এলাকায় ব্যাপকভাবে ব্যবসায়ের ভিত্তিতে চাল তৈরি হয়, সেখানে এক দল ধান-ভাহনীকে সমবায় সমিতির মারফত সংগঠিত করে ধান ঝাড়া ও কুটা সাফ করার দামী যন্ত্রপাতি ভাড়ায় দেওয়া যেতে পারে।

৫. আকাঁড়া চালের ব্যবহার জনপ্রিয় করার জন্য এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় ধান নিয়ে যাবার প্রয়োজন পড়বে। সুতরাং ধান্য পরিবহণের ভাড়া যাতে আকাঁড়া চালের দাম খুব একটা বাড়িয়ে না দেয় তার জন্য ধানের ভাড়ার সুবিধাজনক হার নির্ধারণের চেষ্টা করতে হবে।

৬. যে সব এলাকায় ধানের খোসা ছাড়ানো ও চাল ছাঁটাইয়ের জন্য একই যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, অর্থাৎ যেখানে ধান কোটার অর্থ খোসা ছাড়ানো এবং ছাঁটাই দুইই, সেখানে ধান কোটার পরিণাম হচ্ছে পালিশ করা চাল। ওই সব এলাকায় ধানের খোসা ছাড়ানোর জন্য কাঠ, পাথর বা

মাটির জাঁতা সরবরাহ করতে হবে। জেলার প্রদর্শন কেন্দ্র থেকে অন্যান্য কুটির শিল্পের যন্ত্রপাতির সঙ্গে এই রকম জাঁতাও সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। চাল পালিশ করাকে যথাসম্ভব বাধা দিতে হবে। প্রয়োজন বুঝলে পালিশ করার যন্ত্রপাতির উপর কর ধার্য করা যেতে পারে। এই সব চাল লাইসেন্স প্রাপ্ত পালিশের কলে নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে বেশী পালিশ হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য পরিদর্শকের ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রামের জন্য প্রয়োজনীয় ধান, অন্যান্য শস্য এবং বীজ ইত্যাদি গ্রামেই মজুত রাখতে হবে। যেটুকু উদ্বৃত্ত তাই কেবল বাইরে যাবে। এই সব কাজ করার সেরা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে সর্বার্থসাধক সমবায় সমিতি।

শস্য মজুত রাখার পদ্ধতি ঃ শস্য যেখানে উৎপন্ন হয় সেইখানেই যদি মজুত করার ব্যবস্থা থাকে তা হলে খারাপভাবে গুদামজাত করা ইত্যাদির জন্য ও পরিবহণ বাবদ যে অতিরিক্ত ব্যয় হয়, তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যেতে পারে। বড় বড় শহর ও নগর ইত্যাদি, যেখানে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে শস্য মজুত করতে হয়, সেখানে উত্তর প্রদেশের মুজফরনগরের ধাঁচে সিমেণ্টের পাকা গুদাম তৈরি করা যেতে পারে। এগুলি শহরের মিউনিসিপ্যালিটী বা কোন ব্যবসায়ী তৈরি করে ভাড়া দিতে পারেন। এই-জাতীয় গুদামের জন্য লাইসেন্স নিতে হবে এবং এ সব মাঝে মাঝে পরিদর্শনের ব্যবস্থাও থাকবে। কেবল ভালভাবে গুদামজাত না করার জন্যই প্রতি বছর অনেক শস্যের অপচয় হয়। খুব কম করে ধরলেও এই অপচয়ের পরিমাণ বার্ষিক ৩৫ লক্ষ টন, অর্থাৎ সরকারী হিসাব অনুযায়ী এই বৎসরে ভারতবর্ষের মোট খাদ্যশস্যে ঘাটতির পরিমাণ। গুদামজাত করার ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থার কারণে আর পোকা মাকড়, ইঁদুর, ছুঁচো এবং স্যাঁতসেঁতে মেঝে ও দেওয়াল ইত্যাদির জন্য শস্যের যে গুণগত ক্ষতি হয় এবং যার ফলে নানারকম রোগব্যাধির সৃষ্টি হয়, তার পরিমাণও অত্যধিক। খাদ্যশস্য ভালভাবে গুদামজাত করার সমস্যা জরুরী এবং স্থায়ী ধরনের। তাই যথোচিত গুরুত্ব ও আগ্রহ সহকারে এর সমাধান প্রচেষ্টা করতে হবে।

মোট কথা, এখনকার মত যেখানে-সেখানে খাদ্যশস্য মজুত করার প্রথা বন্ধ করতে হবে।

ফসল যেখানে উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ গ্রামেই যদি গুদামজাত করার ব্যবস্থা থাকে এবং একবার ফসল শহরে পাঠিয়ে আবার সেখান থেকে গ্রামে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া যদি বর্জন করা যায়, তা হলে নিঃসন্দেহে শস্য নষ্ট হবার সম্ভাবনা খুবই কম হয়ে পড়ে। গ্রামে খাদ্যশস্য মজুত রাখার প্রথা চালু হলে চোরাবাজার বন্ধের পথে অনেকটা অগ্রসর হওয়া যাবে এবং এর ফলস্বরূপ খাদ্যশস্যের দামও অনেকটা স্থিতিশীল হবে। আর তা ছাড়া, গ্রামের লোকদের শহরে গিয়ে র‍্যাশান আনার যে ঝামেলা পোহাতে হয়, তার হাত থেকেও তারা নিষ্কৃতি পাবে।

ব্যক্তিগতভাবে যাঁদের ধান চাল মজুত রাখতে হয়, তাঁদেরও শস্য সংরক্ষণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি শেখাতে হবে।

হরিজন, ১৯-৭-১৯৪৬

পরিশিষ্ট—গ

ভূদান যজ্ঞের ভূমিকা

শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১

১৯৫১ সনের ১৮ই এপ্রিল তেলেঙ্গানার (বর্তমানে অন্ধ্র রাজ্যের অন্তর্গত) পোচমপল্লী নামক গ্রামে যে ভূদান যজ্ঞ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, তা কেবল ভারতবর্ষই নয়, সমগ্র বিশ্বের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অবশ্য কোন বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষিত হবার মানেই তার অনুবর্তী হওয়া নয়। বিষয়মুখ (অবজেকৃটিভ) দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কোন বিষয়ের পর্যালোচনা করাই যুক্তিবাদীর লক্ষণ। সুতরাং এই অভিনব আন্দোলনের লক্ষ্য এবং তত্ত্বদর্শন সম্বন্ধে পূর্ব-সংস্কারবর্জিত খোলা মন নিয়ে আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

অর্থশাস্ত্রের যে-কোন ছাত্রই জানেন যে, ভারত তথা সমগ্র এশিয়ার মূল সমস্যা ভূমি-আধারিত। এবং রাজনীতির যে-কোন ছাত্রই স্বীকার করবেন যে, জনগণের আর্থিক স্বাতন্ত্র্য ব্যতিরেকে কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতা আমাদের খুব বেশী দূর নিয়ে যেতে পারে না। ভূদান যজ্ঞ আন্দোলন বর্তমান ভারতের এই দুই মৌলিক সমস্যার সমাধানের জন্যে এক অদৃষ্টপূর্ব পথনির্দেশ করছে।

'দান' শব্দটি আমাদের মত পাশ্চাত্ত্য ভাবধারায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের মনে প্রথমেই একটা বিমুখতার ভাব সৃষ্টি করে। দানের প্রচলিত অর্থ ভিক্ষার নামান্তর মাত্র। সুতরাং আধুনিক শিক্ষিত সমাজ-বিপ্লবীরা 'ভূদান' শব্দটি শ্রবণ মাত্র উপেক্ষার বঙ্কিম হাস্যে মুখর হয়ে ওঠেন। কিন্তু ভূদান যজ্ঞের প্রবর্তক বিনোবাজীর কাছে 'দান' শব্দের অর্থ সম-বিভাজন। এ অর্থ বিনোবাকৃত নয়। শঙ্করাচার্য দানের এই পরিভাষা করে গেছেন এবং শব্দের শুদ্ধ রূপে তাকে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করার অহিংস প্রক্রিয়ার নিদর্শন রূপে সম-বিভাজন অর্থে বিনোবাজী বা ভূদান যজ্ঞের কর্মীরা 'দান' শব্দটি প্রয়োগ করে থাকেন। দানের এই পরিভাষা প্রচলন করার প্রচেষ্টার আরও একটি কারণ আছে। যে-কোন বাস্তব দৃষ্টিসম্পন্ন বিপ্লবী বিপ্লবের মূল উপাদান—স্থানীয় জনসাধারণের বোধগম্য

ভাষাই ব্যবহার করেন। নচেৎ স্থানীয় জনমানসের পক্ষে অনধিগম্য অথচ পুঁথিপত্রে লিখিত শাস্ত্রীয় পরিভাষা ব্যবহার করলে এই শব্দ লোকমানসকে প্রভাবিত করতে পারে না এবং তার ফলস্বরূপ বিপ্লব রূপায়ণের পথে নিজ ভূমিকা গ্রহণ করতে তারা উদ্বুদ্ধও হয় না। আধুনিক শিক্ষাভিমানীদের উন্নাসিকতা সত্ত্বেও তাই জনসাধারণের নাড়ির গতি বোঝার ব্যাপারে ভিষগাচার্য গান্ধীজী তাঁর আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থাকে 'রামরাজ্য' নামে অভিহিত করতেন। গান্ধী-শিষ্য বিনোবাও গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আর্থিক সাম্য প্রতিষ্ঠার এই অহিংস আন্দোলনের নাম 'ভূদান যজ্ঞ' দিয়েছেন। এই ক্ষেত্রে 'দান' বা 'যজ্ঞ' শব্দের ভিতর আধ্যাত্মিক ভাবনার প্রচ্ছন্ন 'অপদেবতা' আছে কি নেই—এ-নিয়ে অসার তর্কে কালক্ষেপ না করে তাই এর অন্তর্নিহিত সঠিক অর্থ বুঝে আমাদের মত পাশ্চাত্ত্য ভাবধারায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা ভূদান যজ্ঞের তত্ত্ব-দর্শন বোঝার প্রয়াস আরম্ভ করতে পারেন।

অত্যল্প কালের ব্যবধানে পর পর অনুষ্ঠিত দুটি বিশ্বযুদ্ধ বুদ্ধিমান মানুষের কাছে হিংসার অসারতা প্রমাণ করেছে। তাই ইতিহাসের বিচিত্র নিয়মে বর্তমান বিশ্বে কেবল বুদ্ধ বা গান্ধীর অনুগামীরাই শান্তি বা অহিংসার কথা বলছেন না, পৃথিবীর প্রতিটি দেশের জনগণই আজ যথার্থ শান্তিকামী। ইতঃপূর্বে যাঁরা হিংসাবৃত্তিকে এক শাস্ত্রীয় মতবাদের (থিয়োরী) মর্যাদা দিয়েছিলেন, কালচক্রের আবর্তনের ফলে তাঁরাও আজ শান্তির প্রবক্তা হয়ে উঠেছেন। এ ছাড়া মানব সভ্যতার বাঁচার নান্যঃ পন্থাঃ। সভ্যতা কেন, নিছক জীব হিসাবে মানুষকে এই ধরাপৃষ্ঠে টিকে থাকতে হলে হিংসাকে যে বর্জন করতে হবে বিশ্বরাজনীতির গতি-প্রকৃতি দিবালোকের মত এ-কথা আমাদের কাছে প্রমাণ করছে। কিন্তু বিশ্বশান্তির উপায় কী?

আমরা বিভিন্ন জাতির ভিতর বিভেদ, বৈষম্য ও স্বার্থ-সংঘাত শান্তির পথে সমাধানের কথা বলে আসছি। পারস্পরিক আলোচনা, বোঝাপড়া বা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের মত বিশ্বসভায় জাতিসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-নিরাকরণের চেষ্টা করছি। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোন জাতির আভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানের জন্য যদি হিংসার শরণ নেওয়া হয়, তবে সে-আচরণ কি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং বিশ্বশান্তির প্রতিকূল হবে না? আর্থিকক্ষেত্রে

কোন শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীর শোষণরূপী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সমস্যার সমাধান যদি শান্তিময় অর্থাৎ অহিংস পন্থায় করার জন্যে আমরা প্রস্তুত না হই, তবে কোন্ মুখে আমরা বিশ্বযুদ্ধের মত বৃহত্তর সমস্যার শান্তিময় সমাধানের নামোচ্চারণ করব? কোন পদ্ধতিতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সমস্যার সমাধান না হলে তা দিয়ে কি বৃহত্তর সমস্যার সমাধান হয়? এই জন্য ১৯৫৫ সনে পুরীতে অনুষ্ঠিত সর্বোদয় সম্মেলনে বিনোবাজী ঘোষণা করেন যে, ভূদান যজ্ঞের প্রতিটি দানপত্র বিশ্বশান্তির সপক্ষে এক একটি ভোট। প্রত্যুত এ-কথা মোটেই অতিরঞ্জন নয়। ভূদান যজ্ঞ আন্দোলন তাই কেবল গান্ধীপন্থীদের কর্মসূচী নয়। বিশ্বশান্তি স্থাপনে ইচ্ছুক প্রতিটি ব্যক্তির আজ কর্তব্য হচ্ছে সর্ববিধ প্রযত্নে বিশ্বশান্তির জন্যে ভূদান যজ্ঞ আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করা।

এবার দেখা যাক ভূদান যজ্ঞ আন্দোলন কি? বাহ্যতঃ ভূদান যজ্ঞ আন্দোলনকে ভূমিপ্রাপ্তি এবং পুনর্বণ্টনের আন্দোলন মনে হলেও এর উদ্দেশ্য আরও গভীরমূল। তবে প্রথমে আমরা ভূমিপ্রাপ্তি ও বণ্টনের প্রসঙ্গই আলোচনা করব। ভারতের অর্থনীতি কৃষিকেন্দ্রিক। দেশের শতকরা ৭৬ জনেরও অধিক কৃষি বা তৎ-সংশ্লিষ্ট শিল্পব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং ভূমিসমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধানের প্রয়োজনীয়তার সম্বন্ধে দ্বিমতের অবকাশ নেই। সাধারণভাবে বলতে গেলে ভারতের ভূমি-মালিকানা ব্যবস্থার স্বরূপ হচ্ছে এই যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভূমির মালিকানা তাদেরই হাতে যারা স্বয়ং বা তাদের পরিবারবর্গ প্রত্যক্ষ কৃষিকার্য করে না। চাষবাসের আসল কাজ করে ভূমিহীন কৃষক এবং কোথাও কোথাও তারা এর বিনিময়ে মজুরী পায় এবং কোথাও বা ফসলের একটা অংশ পেয়ে থাকে। এর মাঝখানে অবশ্য বহুবিধ মধ্যবর্তী স্বত্ব ও উপস্বত্ব আছে। এখানে সে-সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এর ফলে আসল চাষী—ভূমিহীন কৃষকদের পরিশ্রমের ফল ভূমিবানরা বিনাশ্রমেই অন্যায়ভাবে ভোগ করে। মূলতঃ সামাজিক ন্যায়-বিচারের জন্যে প্রারব্ধ ভূদান যজ্ঞ আন্দোলনের প্রাথমিক লক্ষ্য হচ্ছে তাই: ভূমির উপর থেকে যাবতীয় ব্যক্তিগত মালিকানার বিলোপ সাধন। ভূদান যজ্ঞের বক্তব্য হচ্ছে এই যে, বায়ু, জল ও সূর্যালোকের মত ভূমিও ভগবানের (বা প্রকৃতির) দান। এর উপর কারও ব্যক্তিগত মালিকানা থাকার

ন্যায়সঙ্গত কারণ নেই। ভূমি আমাদের মাতা। আমরা মাতার উপর প্রভুত্ব করার ব্যভিচারী প্রথা আরম্ভ করার ফলে অর্থাৎ ভূমির ব্যক্তিগত মালিকানা মেনে নেবার পরিণামে যাবতীয় সামাজিক ও আর্থিক কদাচারের সূত্রপাত হয়েছে। তাই মাতাকে স্বত্বস্বামিত্ববন্ধন মুক্ত করে দিতে হবে এবং যে-কোন ভূমিপুত্র বা কৃষকের ভূ-মাতার সেবা অর্থাৎ কৃষিকার্য করার অধিকার থাকবে এবং তাঁর প্রসাদ রূপে উৎপন্ন শস্যে তার সার্বভৌম দাবী থাকবে।

কিন্তু কোন্ উপায়ে জমিহীন কৃষক তার এই জন্মসিদ্ধ অধিকার অর্জন করবে? যেহেতু ভূদান যজ্ঞ আন্দোলন অহিংসায় বিশ্বাসী, সেই জন্যে স্বভাবতই এর পদ্ধতিও হবে অহিংসাসম্মত অর্থাৎ হৃদয়পরিবর্তনের প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হবে। অহিংসায় বিশ্বাসীদের মানুষের মৌলিক সৎ-বৃত্তিতে আস্থা আছে, তাঁরা মনে করেন যে মানুষ মূলতঃ সৎ। কেবল অজ্ঞতা ও বিরূপ পরিবেশের কারণে তাকে সাময়িকভাবে অসৎ পন্থা গ্রহণ করতে দেখা যায়। স্বার্থের মোহাঞ্জন বিধৌত হলে এবং অনুকূল পরিবেশ সৃষ্ট হলে সাধারণ অবস্থায় মানুষের উন্মার্গগামী হবার কারণ নেই। সংবাদের পরিভাষা প্রদান প্রসঙ্গে একবার জনৈক বিশিষ্ট সাংবাদিক বলেছিলেন যে, কুকুর মানুষকে কামড়ালে সংবাদ হয় না; কিন্তু মানুষ কুকুরকে কামড়ালে সংবাদ হয়। কুকুরকে কামড়ানো মানুষের স্বভাব নয় বলেই এই-জাতীয় ঘটনা সংবাদের মর্যাদা পায়। অর্থাৎ যা অস্বাভাবিক তা-ই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেউ কারো প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ভাবে থাকলে বা পুত্র বৃদ্ধ পিতার সেবা-যত্ন করলে তা সংবাদ হয় না; কারণ তা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু কেউ তার প্রতিবেশীর ঘরে আগুন দিলে বা ঔরঙ্গজেব শাজাহানকে বন্দী করলে তা সংবাদ হয়। কারণ এরূপ ঘটনা মানুষের স্বভাববিরুদ্ধ। কিঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যাঁরা মুহুর্মুহু ইতিহাসের দোহাই দিয়ে সমাজ-বিপ্লবের জন্যে হিংসার প্রয়োগ সমর্থন করেন, তাঁরা ইতিহাসের এই মূল ধর্মের কথাই বিস্মৃত হন। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, মানুষ যে অজ্ঞতা (অর্থাৎ শোষণ করছি এই বোধের অভাব) এবং প্রতিকূল পরিবেশের জন্যে শোষণব্যবস্থার অঙ্গ হয়ে থাকে, তার নিরাকরণই মুখ্য কর্তব্য।

পূর্বোক্ত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ভূদান যজ্ঞের কর্মপদ্ধতি (টেকনিক) বোঝার চেষ্টা করতে হবে। অহিংসায় বিশ্বাসী ব্যক্তিরা অর্থাৎ ভূদান আন্দোলনের কর্মীরা প্রত্যেকের কাছে গিয়ে বোঝান যে, ভূমির উপর মালিকানা বজায় রাখা কী-রকম অযৌক্তিক ও অন্যায় এবং ফলে সমাজে কি-ভাবে এক শোষণযন্ত্র চলছে ও তার নিচে ভূমিহীনরা নিষ্পিষ্ট হচ্ছে। এইভাবে বোঝানোর পর ভূমির বর্তমান ভূস্বামী ধাপে ধাপে যাবতীয় ভূমির উপর স্বত্ব ছেড়ে দেবেন। তখন গ্রামসমাজ ভূমির মালিক হবে এবং গ্রামসমাজ প্রত্যেক পরিবারকে তাদের জীবিকানির্বাহের জন্যে যতটা জমি দেবে, তাতে সাধারণ অবস্থায় সপরিবার বা সময়বিশেষে প্রতিবেশীর সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়ে কৃষিকার্য করে পরিবার প্রতিপালন করবে। ভারতে মোটামুটি ভূমির উপর নির্ভরশীল এক কোটি ব্যক্তি ভূমিহীন। ভূদান যজ্ঞের কর্মীরা এই পদ্ধতিতে প্রথমে তাদের গড়পড়তা পরিবারপিছু পাঁচ একর হিসাবে মোট পাঁচ কোটি একর জমি পাবার সংকল্প করেছেন ও এইভাবে ভূমিহীনদের সমস্যা বা ভূমিসমস্যার সমাধানের প্রথম অধ্যায়ের সূত্রপাত করতে মনস্থ করেছেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এই প্রক্রিয়ার অন্তিম স্বরূপ হচ্ছে ভূমির স্বামিত্ব বোধের পরিপূর্ণ বিসর্জন। অর্থাৎ গ্রামের সমস্ত ভূমি সমাজের কাছে দান বা গ্রামদান হবে এবং কৃষি পরিবারকেন্দ্রিক বা পরিবারসমূহের সমবায়ভিত্তিক হবে ও এইভাবে আর্থিক সাম্য বা গান্ধীজীকথিত রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

সংশয়বাদী প্রশ্ন করবেন যে, এ কবি-কল্পনা মূর্ত হবে কি? এই গজদন্ত গোপুরম্ অভিমুখী অভিযান সফল হবে কি? প্রত্যুত এই প্রশ্ন নূতন নয়। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় যে, যে-কোন নূতন বিচারধারা বা কর্মসূচী প্রবর্তিত হবার কালে এ প্রশ্ন উঠে থাকে। ভূদান যজ্ঞের বেলাতেই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন? ১৯৫১ সনের ১৮ই এপ্রিলের পর একা বিনোবাজীর কয়েক মাসের প্রচেষ্টায় এক তেলেঙ্গানায় ১২ হাজার একর জমি সংগৃহীত হয়। সংশয়বাদীরা তখন বলেন যে, তেলেঙ্গানায় হিংসাত্মক আন্দোলন চলার ফলে অহিংস পন্থায় সাফল্যের ভূমি প্রস্তুত হয়। তাঁরা চ্যালেঞ্জ দিলেন যে, অন্যত্র বিনোবাকথিত "হৃদয় পরিবর্তন" কতটা সফল হয় তা যেন বিনোবাজী দেখান। ওই বৎসর ১২ই সেপ্টেম্বর বিনোবাজী পবনার থেকে পদব্রজে দিল্লীর পথে

রওনা হন এবং ১৯৫২ সনের এপ্রিল মাসে সেবাপুরীতে অনুষ্ঠিত সর্বোদয় সম্মেলনের সময় দেখা যায় যে, হিংসাত্মক আন্দোলনের নামগন্ধবর্জিত মধ্য-প্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশে প্রায় দেড় লক্ষ একর জমি পাওয়া গেছে এবং প্রাত্যহিক গড়প্রাপ্তির পরিমাণ তেলেঙ্গানার বহুগুণ অধিক। সংশয়বাদীরা নিরস্ত হবার পাত্র নন। তাঁরা বললেন, এ-ভাবে সাধু সন্তকে দান করার প্রথা ভারতে বহুদিন চলে আসছে। কোথাও ব্যাপকভাবে ভূদান পাওয়া গেলে বোঝা যাবে যে, এ আন্দোলনের পিছনে সমাজবিপ্লবের প্রেরণা আছে। ১৯৫৪ সনের ভিতর বিহারে তেইশ লক্ষ একরেরও অধিক ভূমি সংগৃহীত হল। সংশয়বাদীরা তবু ভুরু কুঁচকে রইলেন। ১৯৫৫-৫৬ সনে দেখা গেল, উড়িষ্যার প্রায় এক হাজার গ্রামে আর ভূমির মালিক বলতে কেউ নেই, আর্থিক ক্ষেত্রে উচ্চ-নীচের ভেদভাব মিটে গেছে। তবুও সংশয়বাদীদের বিশ্বাস জন্ম'লো না। তাঁরা বললেন, উড়িষ্যার আদিবাসীদের ভিতর তো প্রাচীনকাল থেকে এক ধরনের আদিম সমাজবাদ (প্রিমিটিভ সোশিয়ালিজ্‌ম্‌) চলে আসছে, সুতরাং এই কৃতিকে কৃতিত্ব আখ্যা দেওয়া যায় না। ১৯৫৭ সনের প্রারম্ভে দেখা যাচ্ছে, তামিলনাদের স্বর্ণপ্রসূ অঞ্চল এবং শিক্ষিত সমাজের বাসভূমি মাদুরা, তাঞ্জোর ইত্যাদি জেলাতে শত শত গ্রামদান হচ্ছে এবং সংশয়বাদের অন্যতম পীঠস্থল মহারাষ্ট্রে তালুকা অর্থাৎ একসঙ্গে বিশ-পঁচিশটি গ্রামের এক একটি "ইউনিয়ন" দান হচ্ছে। এ ঘটনায় সংশয়বাদীদের মনে কি প্রতিক্রিয়া জাগে, তা এখন লক্ষ্য করার বিষয়। ১৯৫৭ সনের প্রথম মাস পর্যন্ত প্রাপ্ত বিবরণে জানা যায় যে, এ-যাবত ভারতে প্রায় কয়েক লক্ষ একর পরিমাণ ভূমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টিত হয়ে গেছে। এ-পর্যন্ত কয়েক লক্ষ টাকার সম্পত্তি দান পাওয়া গেছে এবং আসমুদ্রহিমাচলব্যাপী গ্রামময় ভারতে লোকশক্তি অর্থাৎ রাজকীয় প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষার প্রতি আকর্ষণবিহীন জনশক্তির উদ্বোধক সহস্র সহস্র কর্মী দেশের প্রত্যন্ত প্রদেশে পদব্রজে নবযুগের উদ্‌ঘোষ শুনিয়ে বেড়াচ্ছে।*

২

অহিংসা গান্ধীপন্থীদের বিশ্বাসের একটি মৌলিক অঙ্গ বলেই কি কেবল ভূদান যজ্ঞের কর্মীরা শান্তিময় উপায়ে ভূমির উপর থেকে ব্যক্তিগত মালিকানা অবসানের জন্যে এই আন্দোলনে নেমেছেন? একদল সৎ প্রকৃতির মানুষের বিশ্বাসে আঘাত লাগবে বলেই কি ভূদান যজ্ঞ হৃদয়ের পরিবর্তনের উপর জোর দেয়? অহিংসার পরিধি এত সংকুচিত নয়। দ্রুততম গতিতে নিশ্চিতভাবে সমাজবিপ্লব সাধনের ক্ষমতা একমাত্র অহিংসারই আছে বলে গান্ধীজী এবং তাঁর অনুগামীরা অহিংসার পূজারী। গান্ধীশিষ্যদের কাছে অহিংসা কোন লৌকিক আচার বা আনুষ্ঠানিক ধর্মের বাহ্য অভিব্যক্তি নয়। সমাজে পরিবর্তন আনার শ্রেষ্ঠতম পন্থা হিসাবেই গান্ধীজীর অনুবর্তীরা ভূদান যজ্ঞে অহিংস প্রক্রিয়ার শরণ নিয়েছেন। এবার একটু বিস্তৃতভাবে অহিংসার অন্তর্নিহিত শক্তির কথা আলোচনা করা যাক।

এ যাবত সমাজবিপ্লব সাধনের জন্যে তিনটি উপায়ের খোঁজ পাওয়া গেছে। প্রথমটি হচ্ছে সশস্ত্র অভ্যুত্থান, দ্বিতীয়টি আইন, এবং তৃতীয়টি ভূদান যজ্ঞের পথ বা অহিংস গণ-আন্দোলনের পথ। ভারতবর্ষের জমির উপর থেকে অনুৎপাদক ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ করে চাষীর পরিশ্রমের ফল ষোলআনা তাকে দিতে হলে পূর্বোক্ত তিনটি পন্থার যে কোন একটি গ্রহণ করতে হবে।

একটু গভীরভাবে বিবেচনা করলেই বোঝা যাবে যে, বর্তমান ভারতে সশস্ত্র

গণ-অভ্যুত্থানের কোন ভবিষ্যতই নেই। কেবল ভারতে নয়, যে কোন আধুনিক সুসংগঠিত রাষ্ট্রেই এর সাফল্যের কথা কল্পনা করা বাতুলতা মাত্র। রাষ্ট্রশক্তির করায়ত্ত আধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত পুলিশ ও সেনাবাহিনী ইত্যাদির সামনে কোন ব্যাপক সশস্ত্র গণ-আন্দোলন মাথা তুলতে পারবে না। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের রাশিয়া, দুর্নীতি ও আত্মকলহে শতধা-বিভক্ত চ্যাংকাই-শেকের চীন বা ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ ভিয়েৎনামে যে-পদ্ধতি সফল হয়েছে, গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার আওতায় বিকশিত ভারতে সে-পদ্ধতি কার্যকর হবে না। এখানে কেন্দ্রীয় সরকার যথেষ্ট শক্তিশালী। এই একই কারণে ১৯৪৯ সনে ব্রহ্মদেশ এবং ফিলিপাইন্‌স ইত্যাদি দেশে যে সশস্ত্র আন্দোলন মাথা তুলেছিল, সরকারী দমননীতির সামনে তা নির্মূল হয়ে গেছে। আমাদের দেশে ওই সময় তেলেঙ্গানার ভূমিহীন কৃষকদের আন্দোলন কি শোচনীয়ভাবে পর্যুদস্ত হয়—তার কথা দেশবাসী নিশ্চয় ভুলে যান নি।* আধুনিক রাষ্ট্রে পরিবহণ, ডাক-তার, জনসম্ভরণ ব্যবস্থা ইত্যাদি সব-কিছু কোন-না-কোন উপায়ে সরকারের কবলিত। এর উপর সংবাদপত্র, বেতারযন্ত্র এবং মুদ্রাযন্ত্রের উপরও সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান। সুতরাং সশস্ত্র গণ-বিদ্রোহ কি অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ, কি প্রচারযন্ত্র—কোন দিক থেকেই দৃঢ়মূল সরকারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা চিন্তা করতে পারে না। এ রকম কোন পরিকল্পনা দানা বাঁধার পূর্বেই সরকার তাকে অঙ্কুরে বিনাশ করে দেবে।

তবে না-হয় ধরেই নেওয়া যাক যে কোন যাদুমন্ত্র প্রভাবে সশস্ত্র গণ-আন্দোলনকারীরা সংগঠিত হয়ে ক্ষমতা দখল করলেন। কিন্তু এর পর যে সমাজ-ব্যবস্থা রচিত হবে, তাতে বিপ্লবের আদর্শ কতটুকু বজায় থাকবে? সশস্ত্র আন্দোলনের সংগঠন গুপ্তভাবে করতে হবে বলে এর পরিচালনার মধ্যে গণতন্ত্রের নামগন্ধ থাকবে না। গোপন ষড়যন্ত্র এবং হিংসা, বিদ্বেষ ও ঘৃণা প্রচারের সহায়তায় যাঁরা একবার ক্ষমতাধিষ্ঠিত হবেন, তাঁরা তার পর কোন্ মন্ত্রবলে গণতন্ত্রের নিয়ম মেনে চলবেন? কেবল পুঁজিবাদী এক-

নায়কত্বই নয়, সর্বহারাশ্রেণীর নামে প্রারব্ধ একনায়কত্বও যে অবশেষে কী ভীষণভাবে জনস্বার্থবিরোধী স্বৈরতন্ত্রে পরিণত হয়ে ওঠে সোভিয়েট রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভ কর্তৃক উপস্থাপিত রিপোর্টই তার জলন্ত নিদর্শন। এ-কথা কেউ নিশ্চয় বলবেন না যে সমাজবাদী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে স্টালিনের আগ্রহ অন্য কারও চেয়ে কম ছিল। কিন্তু যে হিংসার পদ্ধতি রুশ বিপ্লবের সাধন হিসাবে গৃহীত হয়েছিল, তার স্বাভাবিক ও যুক্তিসিদ্ধ পরিণতিই হচ্ছে ক্রুশ্চেভ কর্তৃক নিন্দিত স্টালিনী কর্মপদ্ধতি।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, প্রথমতঃ ভারতের বর্তমান অবস্থায় সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থান সম্ভব নয় এবং দ্বিতীয়তঃ যদিও এ সম্ভব হয়, তবে তার পরিণামে বিপ্লবের মূল লক্ষ্য—স্বাধীনতা ও সাম্য আধারিত সমাজ ("এ সোসাইটি অফ দি ফ্রি এণ্ড ইকোয়ালস্") গঠন করা অসম্ভব বলে এ-পদ্ধতি সমাজবিপ্লব সংসাধনের পক্ষে অকার্যকর।

এবার আইনের শক্তি পরখ করা যাক। আইন রচনা করেন বিধানসভা ও লোকসভার সদস্যেরা। এঁদের অধিকাংশই অজ ধনিক তথা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। সমস্ত রাজনৈতিক দলেই এঁদের প্রভুত্ব। কোন কোন দল মুহুর্মুহু কৃষক শ্রমিক স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করছি বললেও তাঁদের দলীয় বিধানসভা ও লোকসভার সদস্যরা খুব বেশী হলে কৃষক-শ্রমিকদের স্বয়ং-মনোনীত প্রতিনিধি—নিজেরা কৃষক বা শ্রমিক নন। ধনিক ও মধ্যবিত্ত সমাজের অস্তিত্বই শ্রমজীবীদের শোষণের উপর আধারিত। সুতরাং গায়ে যে দলের লেবেলই থাক না কেন, ভারতের কোন রাজনৈতিক দলের বিধানসভা ও লোকসভার সদস্যরাই তাঁদের দৈব অস্তিত্বের মূলে কুঠারাঘাত করবেন না। অতএব বর্তমান বিধানসভাসমূহ ও লোকসভা যে অবিলম্বে ভূমির উপর থেকে ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদ করে একমাত্র সত্যকার চাষীকেই ফসলের সার্বভৌম অধিকারী করবে—এ আশা সুদূরপরাহত।

তবু যদি ধরে নেওয়া যায় যে কোন প্রকারে এ-জাতীয় আইন রচিত হল, তা হলেও তাতে ভূমিসমস্যার সমাধান হবে না। আইনের পিছনে জাগ্রত জনমতের সক্রিয় সমর্থন না থাকলে আইন শুধু কেতাবে লেখা থাকে,

সমাজে পরিবর্তন আনতে পারে না। সর্দা আইন বহু বৎসর যাবত প্রচলিত ছিল এবং সম্প্রতি হিন্দু বিবাহ আইনও গৃহীত হয়েছে। তবুও সবাই জানেন যে, গ্রামদেশে বাল্যবিবাহ প্রথা এখনও চলছে। বিধবা বিবাহ আইন সিদ্ধ হলেও সমাজে বহুলপ্রচলিত নয়। সরকার জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করেছেন ও কোন কোন রাজ্যে একজন ব্যক্তি সর্বাধিক কতটুকু জমি রাখতে পারবে, আইন করে তার পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু লোকমানস এ-পরিবর্তনের জন্যে প্রস্তুত নয় বলে আইনকে ফাঁকি দিয়ে ভুয়ো ফার্ম করে জমিদারী উচ্ছেদ আইনকে ব্যর্থ করা হচ্ছে এবং সম্পন্ন চাষীরা জমি বেনামী করে "সিলিং" করার আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করছেন। আইনের পরিণাম বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়াতে পরিণত হচ্ছে ও কোটি কোটি ভূমিহীন কৃষকের সমস্যার সমাধান হচ্ছে না।*

এর উপর গণতান্ত্রিক দেশে আইন দ্বারা ব্যক্তিগত মালিকানা দূর করতে হলে তার জন্যে উপযুক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া অনিবার্য। ভারতের বর্তমান আর্থিক অবস্থায় দেশ কোথা থেকে এই ক্ষতিপূরণের টাকা জোগাবে?

জনমানসকে প্রস্তুত না করে আইন দ্বারা সমাজ-সংস্কার করতে গেলে গণবিদ্রোহ হবার সম্ভাবনা। আফগানিস্তানের আমীর আমানুল্লা ও ইরাণের মোসাদ্দেক তার নিদর্শন। জনসাধারণ যতটা যেতে প্রস্তুত, কোন গণতান্ত্রিক সরকার যদি তার চেয়ে খুব বেশী বেগে চলে, তবে তার পরিণামে পরবর্তী নির্বাচনে তাদের ক্ষমতাচ্যুত হতে হয়। ইংলণ্ডের বিগত লেবার পার্টির সরকারের বহুবিধ রাষ্ট্রীয়করণের আইনকে পরবর্তী টোরী সরকার বাতিল করে দেন। আবার সরকার যদি গণতান্ত্রিক রীতিনীতির তোয়াক্কা না রেখে দণ্ডশক্তি প্রয়োগ করে (রুশ সরকারের কুলাক্ দলনের কার্যক্রমের মত) নিজ কর্মসূচী জনসাধারণের উপর চাপিয়ে দেয়, তা হলে হিংসাত্মক পন্থার অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ স্ট্যালিনরাজ হওয়া অপরিহার্য।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থান বা আইন—কোন পদ্ধতিতেই ভূমি সমস্যার ত্বরিৎ সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আর যদি-বা কোন প্রকারে পূর্বোক্ত দুই পদ্ধতিতে এ-সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করা হয়, তা হলে তা সমাজ-পরিবর্তনের মূল লক্ষ্যকেই বিকৃত করে দেবে। এমতাবস্থায় বাস্তবদৃষ্টিসম্পন্ন সমাজবিপ্লবীকে সমাজ-পরিবর্তনের জন্যে হৃদয়পরিবর্তনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির শরণ নিতেই হয়। ভূদান যজ্ঞ আন্দোলন এরই মূর্ত রূপ। সশস্ত্র অভ্যুত্থান বা বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের পরিকল্পনা কোন এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতে সাফল্যলাভ করবে—এই আশায় অহিংস সমাজবিপ্লবী দিন গোনে না। তার সমাজ-পরিবর্তন এখনই এই মুহূর্তে ("হিয়ার এণ্ড নাউ") রূপ পরিগ্রহ করে। কোন এক ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রথার কুফল সম্যক্‌ভাবে বোঝানো মাত্র সে ভূমিহীনের জন্যে নিজ ভূমির একাংশ দিয়ে ব্যক্তিগত মালিকানা বিনাশের পথে এক ধাপ এগিয়ে গেল। ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগতভাবে বোঝানোর এই প্রক্রিয়ায় অহিংস সত্যাগ্রহের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে থাকা উচিতও। যাই হোক একদিকে এই ভাবে স্বেচ্ছায় তার শ্রেণী-পরিবর্তনের কাজ শুরু হয়ে যায় এবং অন্যদিকে তৎক্ষণাৎ একজন ভূমিহীনের সমস্যারও সমাধান হয়।

সমাজ-বিপ্লবের জন্যে এইভাবে শ্রেণী-পরিবর্তন অপরিহার্য। নচেৎ অন্য কোন উপায়ে বিপ্লবীরা ক্ষমতা হাতে পেলেও তা শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের অনুকূলে প্রযুক্ত হবে না। কারণ অনুৎপাদক শ্রেণী হতে আগত এই সব বিপ্লবের নেতৃবৃন্দ নিজেদের পেট চালাবেন কি করে? তাই নিজেদের জৈব অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যে উৎপাদক শ্রেণীর শ্রম শোষণ করার ব্যবস্থা কোন-না-কোন উপায়ে তাঁরা বজায় রাখবেন-ই। কেবল বাইরের লেবেলটুকু বদলে যাবে।

যাই হোক, তারপর এই রকম ব্যক্তির সমষ্টি—সমগ্র গ্রামবাসীদের ভূমির সামাজিক মালিকানার সুফল বোঝাতে পারলে গ্রামদান হয় এবং সেই গ্রামে স্বাধীনতা ও সাম্য আধারিত সমাজ-ব্যবস্থা রচনার সূত্রপাত হয়। ভূদানে প্রাপ্ত জমির জন্যে ক্ষতিপূরণ দেবার কথাই ওঠে না। বরং অহিংস

আন্দোলনে শুভেচ্ছা ও প্রেমের আধারে ভূমি প্রাপ্ত হয় বলে ভূমিমালিক ভূমিহীনদের জন্যে জমি দেবার সঙ্গে সঙ্গে বলদ, লাঙ্গল ও বীজ ইত্যাদি কৃষির সাধনও দান করেন। শুধু তাই নয়, ভূমিমালিকদের হৃদয়পরিবর্তন করে এ-সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয় বলে বহুক্ষেত্রে ভূমিদান করার পর তাঁরা এই আন্দোলনের কর্মী হয়ে পড়েন। সমগ্র ক্রিয়া ভালবাসা ও প্রেমের পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় বলে ভূমির ব্যক্তিগত মালিকানা মেটার সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতের সহযোগিতামূলক ও সখ্যতাপূর্ণ সমাজ গঠনের পথে এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া যায়। সশস্ত্র বিদ্রোহ বা আইনের সাহায্যে এই প্রেমময় পরিবেশ সৃষ্টি করার কথা কল্পনাই করা যায় না।

মাত্র ছয় বৎসরের মধ্যে মুষ্টিমেয় কর্মীর প্রচেষ্টার ফলে ভূদান যজ্ঞ আন্দোলন এতটা সাফল্য অর্জন করলেও বুদ্ধিগর্বী সংশয়বাদী কিন্তু এখনও হৃদয়পরিবর্তন প্রক্রিয়ার প্রতি আস্থাশীল হতে পারেন নি। তাঁরা ভুলে যান যে, যে-কোন রকমের পরিবর্তনের জন্যে হিংসার শরণ নেওয়ার অর্থই হচ্ছে বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করা। যুক্তি ব্যর্থ হলেই মানুষ তার প্রতিপক্ষকে বল দ্বারা অভিভূত করার কথা ভাবে। হিংসা বুদ্ধির প্রত্যক্ষ অস্বীকৃতি।

অপর যে-শ্রেণীর সমাজ-বিপ্লবী হৃদয়পরিবর্তনের সার্থকতা অস্বীকার করেন, তাঁদের কাছে হৃদয়পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার সাফল্যের নিদর্শন হিসাবে মার্কস ও ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির উদাহরণ উপস্থাপিত করা হবে। মার্কসের বুকের উপর বেয়নেট উদ্যত করে কি কেউ তাঁকে কৃষক শ্রমিকদের স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন হতে বলেছিল? এঙ্গেলস ধনীর সন্তান। সাম্য তাঁর শ্রেণীস্বার্থবিরোধী হওয়া সত্ত্বেও তিনি কেন সমাজবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন? অনেকের আত্মীয় স্বজনই তো জারের দমননীতির শিকার হয়েছিলেন কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেবল লেনিন-ই কেন মার্কসের আদর্শকে বাস্তবে রূপায়ণের জন্যে জীবন পণ করলেন? ভারতীয় কমিউনিস্টদের ক্ষেত্রেও হৃদয়পরিবর্তনের নীতি সমভাবে প্রযোজ্য। গোঁড়া কমিউনিস্ট মতবাদ অনুযায়ী প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থা শোষকশ্রেণীর শোষণ ব্যবস্থা বজায় রাখার উপায় ছাড়া আর কিছু নয়। তাই ভারতের কমিউনিস্টগণ ভারতীয় গণতন্ত্র বা সংবিধান দ্বারা জনসাধারণের কোনরূপ কল্যাণ হওয়া সম্ভবপর বলে বিশ্বাস করতেন না।

১৯৫২ সনে তাঁরা এই বলে সাধারণ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করাকে সমর্থন করেন যে, তাঁরা বিধানসভা ও লোকসভাকে সশস্ত্র গণসংগ্রামের পরিপূরক বলেই মনে করেন। আর মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে তাঁদের দ্বিতীয়বার মত পরিবর্তন হয়েছে। আজ তাঁরা সংবিধানের প্রতি আনুগত্য জানিয়ে গণতান্ত্রিক পথে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করার কথা বলছেন।*

কমিউনিস্ট দলের প্রতি কোনরূপ অভিসন্ধি আরোপ করা বর্তমান লেখকের উদ্দেশ্য নয়। বরং ভারতীয় কমিউনিস্টরা পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কেতাবী গোঁড়ামি বর্জন করে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার যে-ক্ষমতা দেখিয়েছেন, প্রবন্ধলেখক তাকে তাঁদের প্রশংসনীয় প্রাণবন্ত চারিত্র-ধর্ম বলেই মনে করেন। কিন্তু তবুও এ-কথা বলতেই হয় যে, রাষ্ট্রযন্ত্র ও পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের প্রতি তাঁদের দৃষ্টিকোণের মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে। এ-ছাড়া গণতান্ত্রিক নির্বাচনপ্রথা বা ভোটের উপর আস্থা স্থাপন করার অর্থই এক-প্রকার হৃদয়ের পরিবর্তনে বিশ্বাসী হওয়া। নির্বাচনকালে প্রত্যেক দল ভোটারদের হৃদয় পরিবর্তন করে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা ছাড়া আর কি করে থাকেন?

অতএব অহিংস পন্থায় বিশ্বাসী ভূদান যজ্ঞের বক্তব্য হচ্ছে এই যে, মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্ট্যালিন এবং ভারতীয় কমিউনিস্টদের যদি হৃদয় পরিবর্তন হওয়া সম্ভব হয়, তা হলে ভারতীয় পুঁজিপতি বা ভূমির মালিকদের হৃদয় পরিবর্তিত হবে না কেন? স্বভাবতই এদের ক্ষেত্রে হৃদয়পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় আস্থা হারানোর কোন কারণই দেখা যায় না। ভূদান যজ্ঞ আন্দোলনের কর্মীরা তাই হৃদয়পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার যুক্তিসিদ্ধ চরম বিকাশ সাধন করতে চান। দ্রুততম গতিতে সমাজ-বিপ্লব সাধনের সার্থকতম ও বৈজ্ঞানিক

প্রক্রিয়ারূপে হৃদয়পরিবর্তনের অহিংস পদ্ধতির সর্বাঙ্গীণ রূপায়ণ তাঁদের কাম্য। এই পন্থায় বিশ্বাসীর কাছে হিংস গণ-আন্দোলন সর্বথা পরিত্যাজ্য হলেও আইন সর্বাবস্থায় অপাঙ্‌ক্তেয় নয়। তবে অহিংসবিপ্লবে আইনের ভূমিকা গৌণ। প্রথমে জাগ্রত জনমত হৃদয় পরিবর্তনের দ্বারা সমাজ পরিবর্তনের অভিমুখে সক্রিয়ভাবে অগ্রসর হবে এবং আইনের যদি প্রয়োজন হয় তবে তা আসবে এর পিছনে। আইন তখন সমাজে গৃহীত নব মূল্যবোধকে বৈধানিক স্বীকৃতি দেবে মাত্র।

৩

গ্রামদান হচ্ছে ভূদান যজ্ঞ আন্দোলনের পূর্ণ-বিকশিত রূপ। ভূদান যজ্ঞের সূত্রপাত হয়েছিল ভূমিহীনদের কিছু জমি দেবার মারফত। তার পর দেশ থেকে ভূমিহীনতা মেটানো ভূদান যজ্ঞের লক্ষ্য হল। অবশেষে উড়িষ্যায় বিনোবাজী ঘোষণা করলেন, "আম্ভর গাঁয়ে ভূমির মালিক রহিবে নাহি, রহিবে নহি" অর্থাৎ আমাদের গ্রামে কেউ ভূমির মালিক থাকবে না। এই সংকল্পের সার্থক রূপায়ণ হচ্ছে গ্রামদান। গ্রামদানী গ্রামে ভূমির কোন ব্যক্তিগত মালিকানা থাকবে না, প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী কর্তৃক নির্বিরোধে নির্বাচিত গ্রাম-সভা সমস্ত জমির অছি হয়। প্রত্যেক পরিবারের পোষ্যসংখ্যা ও চাষ করার ক্ষমতা বিচার করে গ্রাম-সভা গ্রামের জমির পুনর্বণ্টন করে। এ জমি দান বিক্রয় বা বর্গা দেবার অধিকার কোন পরিবারের থাকে না। নিজেদের পরিবার-পরিজনের সহায়তায় প্রত্যক্ষভাবে কৃষিকর্ম করার জন্যই গ্রাম-সভার কাছ থেকে পরিবারগুলি জমি পেয়ে থাকে। অনাথ বিধবা ও অক্ষমদের জমি চাষ করার ব্যবস্থা গ্রাম-সভা করে। কিছুটা জমি সমবায়-মূলক কৃষির জন্য পৃথক রেখে দেওয়া হয়, এই জমির ফসলে গ্রামের খাজনা দেওয়া হয় এবং শিক্ষা, চিকিৎসা ও অনুবিধ উন্নয়নমূলক কাজের ব্যয় নির্বাহ করা হয়।

কৃষকরা ইচ্ছা করলে ব্যক্তিগত পরিবারের ভিত্তিতে বা কয়েকটি পরিবার সম্মিলিত হয়ে কৃষিকর্ম করতে পারে। সামুদায়িক (collective) বা সমবায়ভিত্তিক (cc-operative) কোন বিশেষ ধরনের কৃষিপদ্ধতি গ্রহণ

করার জন্য গ্রামবাসীদের উপর চাপ দেওয়া হয় না। কারণ চাপ দেওয়া অহিংসা নীতি বিরোধী এবং সুস্থ গণতন্ত্র বাহ্য চাপের আওতায় গড়ে উঠতে পারে না। আর সমবায় বা সহযোগিতা জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতার নামই সমবায়। অতএব গ্রামদানী গ্রামে অল্প পরিমাণ জমিতে সমবায়মূলক পদ্ধতিতে চাষ করে সর্বসাধারণের হিতার্থে ফসল উৎপাদন করার মারফত স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতার শিক্ষা দেওয়া হয়।

প্রয়োজন দেখা দিলে গ্রামদানী গ্রামে কয়েক বৎসর অন্তর জমির পুনর্বণ্টন করা হবে। কোন পরিবার তাদের বৃত্তির পরিবর্তন করলে বা কোন পরিবারে লোকসংখ্যার তারতম্য ঘটলে এর প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। সংক্ষেপে বলতে গেলে গ্রামদানী গ্রাম একটি পরিবারের রূপ ধারণ করে। গ্রামের উৎসব, আনন্দানুষ্ঠান সবই সামুহিক হয়। এমন কি কোন পরিবারের পুত্র কন্যাদের বিবাহও সমগ্র গ্রামের কর্তব্য বলে বিবেচনা করা হয় এবং সকলে যথাযথভাবে নিজ দায়িত্ব পালন করে।

জমির পুনর্বণ্টনের পর গ্রাম-সমিতি গ্রামের প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে কৃষি ও শ্রম শিল্পের (industry) পরিকল্পনা রচনা করবে। গ্রামীণ পরিকল্পনা বর্তমানের মত পুঁজি (capital) বা বৃহৎ যন্ত্রশিল্প আধারিত না হয়ে শ্রমকেন্দ্রিক হবে। অর্থাৎ প্রতিটি কর্মক্ষম ব্যক্তিকে সামাজিক দৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় উৎপাদনমূলক কর্মে নিয়োগ করা গ্রামীণ পরিকল্পনার মূলাধার হবে। গ্রাম-স্বরাজে কোন দেশবাসী বেকার থাকবে না। এইজন্য স্বভাবতই দেশের নিত্যব্যবহার্য পণ্যরাজি কুটিরশিল্পের দ্বারা উৎপাদন করতে হবে। এতে একদিকে যেমন সকলকে কাজ দেওয়া যাবে, অন্যদিকে সেইভাবে দেশের শিল্পীকরণের জন্য অর্থাৎ বেশী পুঁজির জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। অর্থশাস্ত্রের ছাত্র মাত্রেই জানেন যে, যন্ত্রকৌশলের (technology) বর্তমান মান বজায় রেখে একজন কর্মহীনকে কর্মে নিযুক্ত করার জন্য গড়ে ৭৬,০০০ টাকা নিয়োগ করা প্রয়োজন। আর র‍্যাশনালাইজেশনের শরণ নিলে তো এর জন্যে আরও বহুগুণ অর্থের প্রয়োজন। অথচ কুটির-শিল্প মারফত একজনের কর্মসংস্থানের জন্য এর এক-শতাংশ অর্থও লাগে না। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, চরখা, খদ্দর, ঢেঁকি, ঘানি ইত্যাদি গান্ধীজীর

বাতুলতার নিদর্শন নয় বা ঘড়ির কাঁটাকে পিছিয়ে দেবার পরিকল্পনাও নয়। অত্যন্ত সুদৃঢ় আর্থিক বনিয়াদের উপর কুটিরশিল্পের অধিষ্ঠান। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই কারণেই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল নীতি নির্ধারণ কালে অধ্যাপক প্রশান্তকুমার মহলানবিশ কুটিরশিল্পের প্রয়োজনীয়তার উপর এত জোর দেন।

তবে কুটিরশিল্পের প্রতিকূল শক্তি খর্ব না করে কেবল কুটিরশিল্প মারফত উৎপাদন করার পরিকল্পনা রচনা করলে বাঞ্ছিত সুফল পাওয়া যাবে না। কুটিরশিল্পের মাধ্যমে নিত্যব্যবহার্য পণ্য উৎপাদন করার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রিত পদ্ধতিতে ওই সব পণ্য উৎপাদন বন্ধ করতে হবে। দেশের বর্তমান অবস্থায় সরকার হয়তো এখনই এতে সম্মত হবেন না। তাই গ্রামদানী গ্রামের অধিবাসীরা গ্রাম-সংকল্প গ্রহণ করবেন। অর্থাৎ নিত্যব্যবহার্য পণ্যের ক্ষেত্রে তাঁরা মিলজাত দ্রব্য বয়কট করবেন। গ্রামীণ অর্থনীতির বনিয়াদ হবে গ্রাম-একককে (unit) যথাসম্ভব স্বাবলম্বী করে তোলা। অর্থাৎ গ্রামের শ্রম-শক্তিকে পূর্ণ মাত্রায় কর্মে নিয়োজিত করে গ্রামের কাঁচা মালকে গ্রামেই পাকা মালে (finished product) রূপান্তরিত করা।

গ্রামদানী গ্রামের বর্তমান স্বরূপ ও ভবিষ্যৎ প্রগতির রূপ-রেখা সংক্ষেপে বিবৃত করা হল। ১৯৫২ সনে বিনোবাজীর উত্তর প্রদেশ পরিক্রমার সময় প্রথম গ্রামদান পাওয়া যায়। হামিরপুর জেলার মংরোঠ গ্রাম বিশ্বের সর্বপ্রথম অহিংস পন্থায় নব সমাজ নির্মাণের মর্যাদার অধিকারী হয়। তারপর থেকে এ পর্যন্ত (সেপ্টেম্বর ৫৭) প্রায় ৩২০০ গ্রাম এইভাবে গ্রাম স্বরাজ্য স্থাপনার জন্য গ্রামদান করেছে ও প্রতিদিনই এ সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।* এর ভিতর আবার ১৩০০ গ্রামই উড়িষ্যার কোরাপুট জেলায় পাওয়া গেছে। গ্রামদানের ভিতর সর্বোদয় সমাজ-ব্যবস্থা মূর্ত হবার বীজ রয়েছে বলে এ বছরের সর্বোদয় সম্মেলনে (কেরলের কালাডি গ্রামে ৯ই ও ১০ই মে তারিখে অনুষ্ঠিত) ভূদান কর্মীরা গ্রামদানের জন্য সবশক্তি নিয়োগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। গ্রামদানের আদর্শ এতই মহান্‌ ও কার্যকারী যে গত ২১শে ও ২২শে সেপ্টেম্বর

মহিশূর শহরের নিকটবর্তী এলওয়াল নামক জনপদে অখিল ভারত সর্বসেবা সঙ্ঘের আমন্ত্রণক্রমে দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এক সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে দেশবাসীকে সর্বপ্রকারে গ্রামদান আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানিয়ে এক রাষ্ট্রীয় সংকল্প গ্রহণ করেন। সম্মেলনে রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, প্রধানমন্ত্রী জওহরলালজী এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও কংগ্রেস সভাপতি, প্রজা-সমাজবাদী দলের চেয়ারম্যান এবং কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবর্গ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গ্রামদানের সঙ্গে সঙ্গে সম্পত্তি দান, শ্রম দান ও বুদ্ধি দান ইত্যাদি যে কর্মসূচী চলেছে, এবার তার কথা আলোচনা করা যেতে পারে। ভূদানের তত্ত্বদর্শনের বীজ উপনিষদের একটি শ্লোকে পাওয়া যায়: ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাম জগৎ। অর্থাৎ এই বিশ্ব-চরাচরের সবকিছুই ঈশ্বরের। এরই উপর আধার করে বিনোবাজী ঘোষণা করেন যে, বায়ু জল ও সূর্যকিরণের মত ভূমিও ঈশ্বর বা সমাজের—"সবৈ ভূমি গোপালকী।" সম্পত্তি দান শ্রম দান ও বুদ্ধি দানের পিছনেও ওই একই প্রেরণা বিদ্যমান। এ ক্ষেত্রেও ওই "সমাজায় ইদং, ন মম" বা এ সমাজের, আমার নয়—এই বিশ্বাস ক্রিয়ারত। সম্পত্তির সৃষ্টি হয় প্রাকৃতিক সম্পদ ও শ্রমের সংযুক্তিকরণে, এতদুভয়ের কোনটিই আমাদের কৃতি নয়। প্রাকৃতিক সম্পদ তো সমাজের বটেই, আমাদের শ্রমশক্তিও সমাজের। সমাজের ভিতর আমরা থাকি ও কাজ করি বলেই আমাদের শ্রমশক্তি ও বুদ্ধি বিকশিত হয়। সমাজ থেকে দূরে একলা কোন নির্জন স্থানে থাকলে আমাদের শ্রমশক্তি বা বুদ্ধিবৃত্তি—কোনটিরই বিকাশ সম্ভবপর হত না। আর বুদ্ধিবৃত্তির প্রাথমিক খোরাকও আমরা সমাজের কাছ থেকে পাই। মানুষের সাহচর্য, গ্রন্থ, বিদ্যালয় ইত্যাদি যে সব ব্যবস্থার কারণে আমরা জ্ঞান আহরণ করি, তা সমাজেরই অবদান। এই ভাবে সমাজে থেকে ব্যবহার না করলে অর্থাৎ অন্য মানুষের সম্পর্কে না এলে ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারাও সম্পদ সৃষ্টি করা যেত না। এইজন্য আমাদের সম্পত্তি শারীরিক শ্রমশক্তি বা বুদ্ধি—এ সবের উপরই সমাজের পূর্ণ অধিকার আছে। অতএব সর্বোদয় আদর্শের অন্তিম লক্ষ্য হচ্ছে এ সবেরই সমাজীকরণ। সমাজীকরণ ও রাষ্ট্রীয়করণের মধ্যে পার্থক্য আছে। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-ব্যবসায়

শেষ অবধি আমলাতন্ত্রের একনায়কত্বে পরিণত হয়। সাধারণ মানুষ রাষ্ট্রের মত একা নির্গুণ (abstract) আইডিয়া দ্বারা অনুপ্রেরিতও হয় না। সমাজ সাধারণ মানুষের ধরা-ছোঁয়ার ভিতর। এর পরিচালন এবং সঞ্চালনও সাধারণ মানুষ করতে পারে। তাই অহিংস সমাজে রাষ্ট্রীয়করণের পরিবর্তে যথাসম্ভব সমাজীকরণ হবে।

ভূদান আন্দোলনের কর্মীরা সমাজীকরণের এই আদর্শ সকলকে বুঝিয়ে তাঁদের নিজ নিজ সম্পত্তি বুদ্ধি ও শ্রমশক্তির সমাজীকরণের প্রেরণা দেন। অন্তর্বর্তীকালের জন্য এ সবের মালিকেরা সমাজের হয়ে এগুলির অছিস্বরূপ থাকতে পারেন এবং অন্তিম লক্ষ্যে উপনীত হবার প্রথম পদক্ষেপস্বরূপ নিজ উপার্জন, শ্রমশক্তি ও বুদ্ধির একাংশ সমাজকে দেবেন। সম্পত্তিদান চাঁদা সংগ্রহের নবরূপ নয়। সম্পত্তিদানের অর্থ ভূদান কর্মীরা সংগ্রহ করেন না। দাতা স্বয়ং নিজ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রদেয় অর্থ সমাজহিতকর কার্যে ব্যয় করেন এবং বৎসরান্তে এর হিসাব বিনোবাজীকে পাঠান। এর ফলে কোন অর্থকোষ সংগ্রহরূপী অনিবার্য কেন্দ্রীকরণের দোষ থেকে যেমন মুক্তি পাওয়া যায় তেমনই দাতাকেও ক্রমশঃ কর্মীতে রূপান্তরিত করা হয়। কেবল অর্থ দিয়ে তাঁর নিষ্কৃতি নেই, সমাজ-কল্যাণের জন্য তার সদ্ব্যয় করার দায়িত্বও তাঁর। যাঁর সম্পত্তি নেই, তিনি সমাজের জন্য নিয়মিতভাবে কিছু বৌদ্ধিক সেবা দেবেন এবং তাও যাঁর নেই তিনি শ্রমদান করবেন। অর্থাৎ সর্বোদয় বিচারানুযায়ী সমাজে বিত্তবান (haves) এবং সর্বহারা (have-nots) রূপী কোন কাল্পনিক শ্রেণীবিভাগের অস্তিত্ব নেই। সমাজে সকলেরই ভূমি, সম্পত্তি, শ্রম বা বুদ্ধি ইত্যাদি কোন না কোন প্রকারের বিত্ত আছে এবং তাই তার ব্যক্তিগত উপভোগের পরিবর্তে সমাজীকরণ করতে হবে।

তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, সর্বোদয়-দর্শন-আধারিত ভূদান যজ্ঞ আন্দোলন সমাজের সর্বস্তরব্যাপী দানের এক আন্দোলন। সকলেরই সমাজের জন্য কিছু না কিছু দান করা কর্তব্য—এই এর শিক্ষা। এই দিক থেকে দেখতে গেলে পুঁজিবাদী দর্শন ও সাম্যবাদী দর্শনে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। কারণ উভয় মতবাদেই অধিকাধিক প্রাপ্তির উপর সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রিত করা হয়েছে। পুঁজিবাদ এবং সাম্যবাদের ভিতর মৌলিক পার্থক্য কেবল

প্রাপকের, অর্থাৎ কে পাবে—পুঁজিপতি না শ্রমিক? নচেৎ উভয়েই কার্যতঃ সমগোত্রীয়। ভূদান যজ্ঞ আন্দোলন মানুষের মনোবৃত্তির মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে সমাজ থেকে অধিক পরিমাণে নেওয়া নয়, সমাজকে অধিকাধিক মাত্রায় দেওয়াকেই নব মূল্যবোধ রূপে স্থাপনা করার প্রয়াস করছে। সমাজের সুস্থ বিকাশের পক্ষে এই মনোবৃত্তি যে কত প্রয়োজনীয় এ কথা উল্লেখ করাই বাহুল্য।

কিন্তু কে করবে এই কাজ? গ্রামময় ভারতের সাড়ে পাঁচ লক্ষ কেন্দ্রে কে নিয়ে যাবে এই অহিংস বিপ্লবের বার্তা। জাতীয় জীবনের নব রূপায়ণ-রূপী যজ্ঞকর্মে পূর্ণাহুতি দেবার জন্য কে করবে সেই সুকঠোর তপশ্চর্যা? এর উত্তর হচ্ছে জীবনদান। একদা দেশমাতৃকার বন্ধন মোচনের জন্য যেমন লক্ষ লক্ষ তরুণ যুবক-যুবতীর প্রাণের ডালির প্রয়োজন হয়েছিল, আজও আর্থিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে বিপ্লব সংসাধনের জন্য তেমনই অগণিত তরুণ-তরুণীর অবিচল নিষ্ঠাযুক্ত অক্লান্ত সেবা চাই। এরা জনগণের একজন হয়ে তাদের সেবক হিসাবে তাদের মধ্যে বসবাস করবে। কোন পদ বা প্রাপ্তির সম্ভাবনা তাদের ধ্যেয় হবে না, নিষ্কাম সেবাই তাদের ধ্রুবতারা হয়ে পরিচালনা করবে। কোন ব্যক্তি, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী অথবা নেতা বা দলের স্বার্থসিদ্ধি তাদের লক্ষ্য হবে না, সমগ্র সমাজের অবিভাজ্য সেবা হবে এই সব "সত্যাগ্রহী লোক-সেবকদের" ব্রত। এই রকম লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণীর নিষ্কাম সত্যাগ্রহী লোক-সেবক দল নব সমাজের আধার-শিলা স্বরূপ হবে। শিব যেমন দেবতা হয়েও কখনও তাঁর অনুগামী "গণকে" ছেড়ে দূরে যান না, তাঁদের মাঝেই থাকেন, তেমনই শিব-শক্তির ধারক এইসব লোকসেবক উচ্চ পদের চাকুরী নিয়ে বা পরিষদ ও লোকসভার সদস্য হয়ে জনগণের সান্নিধ্য থেকে দূরে সরে যাবেন না। এঁরা জনসাধারণের মাঝে থেকেই তাঁদের সেবা করবেন এবং জনগণের উপর কোন অন্যায় অনুষ্ঠিত হলে অহিংস তাণ্ডবের সৃষ্টি করে অর্থাৎ সত্যাগ্রহ-রূপী অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলনের শরণ নিয়ে অন্যায়ের প্রতিকার করবেন।

প্রত্যুত এ বিচারধারা কিছু নূতন নয়। পাশ্চাত্যেও চিরন্তন প্রহরাকে স্বাধীনতার মূল্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তাই পাঁচবছরে একবার ভোট দিয়ে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করলেই স্বাধীনতাকামীর কাজ শেষ হয় না।

অথবা সাম্যবাদী শাসন-ব্যবস্থা কায়েম করলেই তা সর্বজ্বরহর বটিকা বলে প্রমাণিত হয় না। বস্তুতঃ মানব কর্তৃক আবিষ্কৃত কোন সমাধানই শেষ মীমাংসা নয়; গণতন্ত্র বা সাম্যবাদ সবই এই পর্যায়ভুক্ত। তাই সর্বোদয় মনে করে যে, বিশেষ এক ধরনের শাসন-ব্যবস্থা কায়েম করলেই চিরকালের মত সকল সমস্যার সমাধান হয়ে গেল ভাবা ভুল। সুস্থ গণতান্ত্রিক সমাজের জন্য সরকারী ও বিরোধী দলের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতালাভের আকাঙ্ক্ষাবিহীন এক দল নিঃস্বার্থ "লোকসেবক"ও সমাজে থাকা চাই। এঁরা নিজেরা কখনও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে চাইবেন না। সমাজসেবার দ্বারা যে শক্তি সঞ্চয় করবেন, তাতে সরকারী ও বিরোধী দল উভয় পক্ষকেই প্রয়োজনমত সংযত রেখে তাদের জনস্বার্থের অনুকূল হবার জন্য বাধ্য করবেন। দেশে নিষ্কাম সেবকদের এইরকম এক বাহিনী সৃষ্টির জন্য বিনোবাজী জীবনদানের আহ্বান জানাচ্ছেন।

৪

গ্রামদানের অন্তিম লক্ষ্য হচ্ছে সর্বোদয় সমাজ স্থাপন করা। সর্বোদয় অর্থাৎ সকলের উদয় বা মঙ্গল। "অধিকতম সংখ্যক ব্যক্তির জন্য সর্বাধিক হিতসাধন" (greatest good of the greatest number)—এই সংকুচিত আদর্শের পরিধির মধ্যে মানবের আশা-আকাঙ্ক্ষা আজ আর সীমাবদ্ধ নেই। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে হিতসাধনের ক্ষেত্রকে ব্যাপকতর করে সর্ব-মানবকে তার এলাকার অন্তর্ভুক্ত করে সর্বোদয়ের বিচারধারার প্রবর্তন করা হয়েছে। ইংরেজ মনীষী জন রাস্কিনের 'আনটু দিস লাস্ট' গ্রন্থ থেকে গান্ধীজী এই বিচারধারার বীজ আহরণ করেন। টলস্টয় এবং ভারতীয় দর্শনের প্রভাবে এই বীজ এক মহান্ আদর্শের মহীরুহ রূপে বিশ্বের সম্মুখে প্রকট হয়।

অন্ত্যোদয় থেকে সর্বোদয়ের প্রারম্ভ। অর্থাৎ "সবার পিছে, সবার নিচে, সবহারাদে মাঝে" সর্বপ্রথম এর ঘট-স্থাপন করা হয়। ভূদান যজ্ঞ আন্দোলন এর জ্বলন্ত নিদর্শন। ভূমির উৎপাদিকা শক্তি কমবে কি না, ভূমি বণ্টিত হলে তা অলাভজনক টুকরায় (uneconomic holding) পরিণত হবে কি না,

ভূদান আসলে দারিদ্র্য-বণ্টনের কার্যক্রম কি না—এ সব প্রশ্ন আর্থিক দৃষ্টি থেকে গুরুত্বপূর্ণ হলেও ভূদান যজ্ঞের তত্ত্বদর্শন এর প্রতি প্রধানতঃ জোর দেয় না। দীনতম ব্যক্তিটির উপকার সাধন করার ক্ষমতা রাখে কি না—এই দিয়ে সর্বোদয় কোন কার্যক্রমের গুণাগুণ বিচার করে। এ সম্পর্কে গান্ধীজীর একটি উক্তি স্মরণীয়। তিনি বলতেন, "তোমাদের আমি একটি মন্ত্র দেব। যখনই কোন কর্তব্য-সংকটে পতিত হবে, অর্থাৎ কোন কাজ করা উচিত কি অনুচিত —এই রকম প্রশ্ন জাগবে, তখনই বিচার করবে যে তোমার সে কার্য কি দেশের দীনতম ব্যক্তিটির হিতসাধন করবে?" সমাজের বর্তমান অবস্থা এই যে, ধনী ও নির্ধন উভয়েই রোগাক্রান্ত। ধনীরা প্রয়োজনাতিরিক্ত আহার করার কারণে অজীর্ণ ও মেদবৃদ্ধি রোগে ভুগছে এবং দরিদ্রদের শরীরের ন্যূনতম পুষ্টির অভাব হওয়ায় তাদের ভিতর ক্ষয়রোগ বাসা বেঁধেছে। সর্বোদয় উভয় শ্রেণীর হিতসাধন করতে চায় বলে ধনীকে দরিদ্রদের জন্য স্বেচ্ছায় দান করতে বলে। এতে ধনীরা অতি-আহার জনিত রোগের হাত থেকে মুক্তি পাবে এবং দরিদ্ররা প্রয়োজনীয় আহার্য পেয়ে সুস্থ হয়ে উঠবে। এই ভাবে স্বার্থ-সংঘর্ষ বা শ্রেণী-সংঘর্ষ সর্বোদয়ের লক্ষ্য নয়। "শ্রেণীর" পরিভাষাতেই যদি বলতে হয়, তাহলে বলা যায় যে শ্রেণী-বিলীনীকরণ বা ধনিক সম্প্রদায়ের শ্রেণী-পরিবর্তনই হচ্ছে সর্বোদয়ের পন্থা।

মানব-সমাজের প্রগতির তিনটি সুস্পষ্ট যুগ চোখে পড়ে। প্রথম যুগ দাঁতের বদলে দাঁত এবং চোখের বদলে চোখ, অর্থাৎ জঙ্গলের নিয়মে চলত। জোর যার মুলুক তার—এই-ই ছিল সে যুগের ধর্ম। সভ্যতা এবং সংস্কৃতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় অবস্থা অর্থাৎ ন্যায়-বিচার ও নিয়ম-কানুনের রাজত্ব স্থাপিত হয়। এখন কোন দুষ্কৃতি সাধিত হলে মানুষ নিজের হাতে আইন তুলে নেয় না। শাসনশক্তি অর্থাৎ হিংসা প্রয়োগ করার অধিকার এই অবস্থায় ব্যক্তির হাত থেকে সমাজের প্রতিনিধিদের হাতে চলে যায়। আইন-পরিষদ, লোকসভা এবং আদালত, কাছারি, পুলিস ও সেনা-বাহিনী ইত্যাদি এই যুগের সামাজিক সুরক্ষার ধারক ও বাহক হয়। মানবেতিহাসের তৃতীয় বা আদর্শ স্থিতিতে এ সবেরও প্রয়োজন থাকবে না। হিংসা প্রয়োগের অধিকার ব্যক্তির হাত থেকে সমাজের প্রতিনিধিদের হাতে গেলেই তার

আপত্তিকর রূপ পবিত্র হয়ে ওঠে না। তাই তৃতীয় অবস্থায় হিংসা-শক্তির শরণ নেবার প্রথাই রদ হবে। প্রেম বা ভালবাসা হবে মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধের নির্ণায়ক। এরই নাম সর্বোদয় সমাজ।

সর্বোদয় মানবীয় বিপ্লবের সর্বশেষ পরিণতি। এ যুগে কার্ল মার্কস সর্বপ্রথম তাঁর মনীষী-দৃষ্টি দ্বারা মানব-সমাজের অসাম্য ও শোষণের কারণ আবিষ্কারের বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার সূত্রপাত করেন। তাই তাঁকে এ যুগের প্রথম বিপ্লবী বলা যায়। গান্ধীজী বিপ্লবসাধনের পন্থাতেও বিপ্লব সংসাধন করেন অর্থাৎ যে মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠার জন্য বিপ্লবের প্রয়োজন, বিপ্লবের আবাহনের পন্থাতেও গান্ধীজী সেই মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা করলেন। তাই গান্ধীজীর পদ্ধতি মানবীয় বিপ্লব বা সুসংস্কৃত বিপ্লবের দ্যোতক। মহান লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য পন্থাও সমরূপে মহান্ হওয়া চাই—এই হচ্ছে সর্বোদয়ের বক্তব্য। জ্যামিতির সরলরেখার সংজ্ঞার্থ অনুযায়ী যেমন কিছুতেই কোন সরলরেখা অঙ্কন করা যায় না, তেমনই কোনদিন কোন শুদ্ধ আদর্শে মানব-সমাজ উপনীত হতে পারে না। ঘোষিত আদর্শের পথে মানব-সমাজ যতটা অগ্রসর হতে পারে, তাদের প্রগতিও ততটুকু হয়। তাই লক্ষ্য মহান্ হলেও পন্থা যদি অশুদ্ধ হয়, তা হলে সমগ্র বিপ্লবের প্রক্রিয়ার শেষে লাভ-লোকসান খতালে জমার ঘরে অশুদ্ধ পন্থা ছাড়া আর কিছু থাকে না। এইজন্য গান্ধীজী শুদ্ধ পন্থার উপর এত জোর দিতেন।

সর্বোদয় মনে করে যে "রাষ্ট্র শোষণের যন্ত্র।' তাই কোন বিশেষ ধরনের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা স্থাপন করা সর্বোদয়ের লক্ষ্য নয়, শোষণ ও শাসনহীন এক সমাজ প্রতিষ্ঠা করাই সর্বোদয়ের কাম্য। শোষণের সঙ্গে শাসনের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রয়েছে। শোষণ করার জন্য শাসন এবং শাসন দ্বারা শোষণ—এই দুষ্টচক্র পৃথিবী জুড়ে চলেছে। সর্বোদয় শোষণের অবসান চায় বলে শাসনেরও অবসানকামী। তবে শাসনবিহীন সমাজ মানে উচ্ছৃঙ্খল সমাজ নয়। শাসনবিহীন সমাজে জনসাধারণ এতখানি সাংস্কৃতিক গুণের অধিকারী হবে যে কোন বাহ্যতন্ত্র ব্যতিরেকেই তারা সমাজহিতার্থে স্বতঃ-আরোপিত বিধিনিষেধ দ্বারা চালিত হবে। এর জন্য জনসাধারণকে সমাজের যথাসম্ভব অধিকাধিক ক্রিয়াকলাপ স্বাবলম্বী পদ্ধতিতে সঞ্চালিত করতে হবে। এইবার আর্থিক

সাম্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য কেন যে সর্বোদয়ে বিশ্বাসীরা রাষ্ট্রযন্ত্রের সহায়তা না নেবার উপর এত জোর দেন, তার কারণ বোঝা যাবে। রাষ্ট্রের অবলুপ্তিই যদি অন্তিম লক্ষ্য হয়, তা হলে সমাজ থেকে তার প্রয়োজনীয়তা যথাসম্ভব হ্রাস করতে হবে। ভূমির সমবণ্টনের জন্য বা নিত্যব্যবহার্য ভোগ্যোপকরণ উৎপাদন ও বণ্টনের জন্য যদি আমাদের রাষ্ট্র বা কোন কেন্দ্রিত ব্যবস্থার শরণ নিতে হয়, তবে স্বভাবতই তার অস্তিত্ব অপরিহার্য হয়ে পড়বে। এইজন্য সর্বোদয় সমাজের আদর্শে বিশ্বাসী কর্মীরা জনসাধারণের জাগ্রত চেতনার উপর নির্ভর করে ভূমির সমবণ্টন ও আর্থিক সাম্য প্রতিষ্ঠাব চেষ্টা করছেন। এইজন্য তাঁরা বিকেন্দ্রিত উৎপাদন ব্যবস্থা অর্থাৎ চরখা ঢেঁকি ঘানি ইত্যাদির শরণ নিয়ে কেন্দ্রিত অর্থব্যবস্থা ও তৎসংশ্লিষ্ট কেন্দ্রিত রাজ্যব্যবস্থাব অবসান-প্রয়াসী। যাঁরা মনে করেন যে, যেন-তেন-প্রকারেণ একবার রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করে তার মারফত রাষ্ট্রের বিলীনীকরণ (withering away) করবেন, তাঁদের যুক্তির ত্রুটি এবার চোখে পড়বে। সমাজে কোন জিনিসের চাহিদা বজায় রেখে তার বিলুপ্তি সাধন করা যায় না এবং ক্ষমতার স্বধর্ম হচ্ছে অধিকতর কেন্দ্রীকরণ—এই দুটি নিয়মের কথা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। ইতিহাসের শিক্ষা হচ্ছে এই যে, সুদীর্ঘ অর্ধশতাব্দী কাল একচ্ছত্র আধিপত্য-যুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালন সত্ত্বেও সোভিয়েট রাশিয়ার রাষ্ট্রযন্ত্র বিলীনীকরণের দিকে তিলমাত্র না গিয়ে তার বিপরীত দিকেই গেছে, অর্থাৎ সেখানে জন-জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র রাষ্ট্রব্যবস্থার করায়ত্ত।

এইখানে আর একবার সাধ্য ও সাধনেব (ends and means) প্রশ্ন এসে পড়ে। যে লক্ষ্যে আমরা উপনীত হতে চাই, আমাদের বর্তমান কার্যক্রমে তার সুস্পষ্ট অভিপ্রকাশ থাকা চাই। হিমালয়ের শিখরে আরোহণ যদি আমার লক্ষ্য হয়, তবে আমাকে এখনই উত্তর দিক লক্ষ্য করে চলতে হবে। যেহেতু পৃথিবী বর্তুলাকার, অতএব এখন দক্ষিণ দিকে চলা আরম্ভ করা যাক এবং অবশেষে কোন না কোন দিন দক্ষিণ মেরু ঘুরে হিমালয়ের শীর্ষে উপনীত হব—এই কথা বলার মধ্যে তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের সমর্থন যতই থাক না কেন, কোন বাস্তববাদী এ পন্থা গ্রহণ করবেন না। এইরূপ কোন বাস্তবদৃষ্টিসম্পন্ন বিপ্লবী নিশ্চয় এ কথা মেনে নেবেন না যে, এখনকার মত রাষ্ট্রযন্ত্রকে অধিকাধিক

শক্তিশালী করা যাক এবং বিজ্ঞানের নিয়মানুসারে যখন আপনিই পূর্ণতার পর পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে, তখন রাষ্ট্রও একদিন বিলীন হয়ে যাবে। এ মনোভাবের সঙ্গে প্রাচীন কালের স্বর্গপ্রাপ্তির কল্পনার যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই, এ কথা একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে। প্রাচীনকালে বিশ্বাস করা হত যে, এই জীবনে খুব দুঃখ কষ্ট সহ্য করা যাক, তা হলে পরিণামে স্বর্গে অসীম সুখ ভোগ করা যাবে। এ যুগের নব্য স্বর্গবাদীরাও মনে করেন যে, এখনকার মত রাষ্ট্রযন্ত্রের শতবিধ দমননীতি ও স্বাধীনতার পরিপন্থী দাপট সহ্য করা যাক এবং এর পরিণামে কোন এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতে রাষ্ট্রহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। এ যুক্তির অসারতা সহজেই চোখে পড়ে। রাষ্ট্রহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা যদি কাম্য হয়, তবে এখনই এইখানে (here and now) তার সূত্রপাত করতে হবে। সাধন যে সাধ্যের মতই গুরুত্বপূর্ণ এ কথা এবার স্পষ্ট হবে।

বর্তমান অবস্থায় রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতি সর্বোদয়-বিশ্বাসীর দৃষ্টিভঙ্গী কিরূপ হবে? এ কথা স্পষ্ট যে রাষ্ট্রযন্ত্রের ভিতরে থেকে, তার অঙ্গ হয়ে রাষ্ট্রব্যবস্থার বিলুপ্তি সাধন করা যায় না। গাছের ডালে বসে আছি, সেই ডাল কাটার পরিণতি কী হতে পারে, তার প্রমাণ কালিদাস অতীত কালে দিয়ে গেছেন। নূতন করে কালিদাস সেজে আর লাভ নেই।

সুতরাং রাষ্ট্রের বিলুপ্তি সাধন বা এমনকি শাসনব্যবস্থার উন্নতিসাধন মানসেও সর্বোদয়-বিশ্বাসী রাষ্ট্রযন্ত্রের অঙ্গ হবে না। বিরোধী দলকে প্রয়োজন হলে শাসনযন্ত্রের কর্ণধার হতে হয়, অর্থাৎ সরকারী দলে পরিণত হতে হয়। (আর পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রে প্রত্যেকটি বিরোধী দলের আকাঙ্ক্ষাও তাই থাকে।) তা ছাড়া পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থায় বিরোধী দলও শাসনযন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাঁরা সুষ্ঠুভাবে শাসনদণ্ড প্রয়োগের সতর্ক প্রহরী ("watch-dogs of democracy")। অর্থাৎ তাঁদের পরোক্ষ সহায়তায় রাষ্ট্রযন্ত্র সঞ্চালিত হয়। তাঁরা বড জোর শাসনরূপী তিক্ত বটিকার উপর মধুর প্রলেপ অবলেপন করেন। তাই অন্তিমে সর্বপ্রকার শাসনব্যবস্থার বিলোপসাধনকামী সর্বোদয়-বিশ্বাসীর বর্তমান নীতি হচ্ছে রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রভাব হ্রাস করা। গণতান্ত্রিক বা একনায়কত্ব-বাদী—যে কোন দেশের এবং কল্যাণধর্মী (welfare) বা কমিউনিস্ট—যে

কোন ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থাতেই শাসনযন্ত্র ও রাষ্ট্রব্যবস্থা আজ প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্যভাবেই সর্বশক্তিমান এবং তার মর্যাদাও সর্বাধিক। রাষ্ট্রহীন সমাজের প্রথম ধাপ হচ্ছে জনসাধারণের মন থেকে রাষ্ট্রের এই অলীক উচ্চ মর্যাদা দূর করা। সুস্থ গণতান্ত্রিক সমাজে রাষ্ট্রযন্ত্র সমাজের সেবায় নিয়োজিত বহুবিধ তন্ত্রের (nstitution) মধ্যে একটি ছাড়া আর কিছু নয়। পূর্বোক্ত ধারণা জনসাধারণের মনে জনপ্রিয় করে ক্রমশঃ জনজীবনের এক একটি ক্ষেত্রকে রাষ্ট্রযন্ত্রের কবলমুক্ত করতে হবে। নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রিত করে এবং স্বাবলম্বী গ্রামপঞ্চায়েত স্থাপনা মারফত জনগণের আর্থিক স্বাধীনতা-লাভের সঙ্গে সঙ্গে শাসন ও বিচার ব্যবস্থাকেও বিকেন্দ্রিত করতে হবে। এর সঙ্গে সঙ্গে ভূদান যজ্ঞ, গ্রামদান ইত্যাদি আন্দোলন দ্বারা সমাজে নব মূল্যবোধ স্থাপনার কার্যক্রমের নেতৃত্বশক্তিকে জন-আধারিত করা প্রয়োজন। অতঃপর জনসাধারণ যে যে ক্ষেত্রের কাজ স্বয়ং করে নিতে পারবে, সেই সব খাতে প্রদেয় সরকারী খাজনাও সরকারকে দেওয়া বন্ধ করবে। এইভাবে শাসনযন্ত্রের এক একটি বিভাগ বন্ধ হয়ে যাবে।

এই পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিবেচনা করলে নির্বাচনের প্রতি সর্বোদয় সমাজ-প্রতিষ্ঠাকামীদের দৃষ্টিকোণ কি রকম হবে এবার সে কথা আলোচনা করা যেতে পারে। এ কথা বলা বাহুল্য যে, সবার উদয় বা কল্যাণ যাঁর কাম্য তিনি কোন দল বিশেষে যোগ দিতে পারেন না। কারণ রাজনৈতিক দল খণ্ডের উপাসক—তাঁদের বিশেষ মতবাদের উপর যাঁদের আস্থা নেই তাঁদের কল্যাণ সাধন সেই রাজনৈতিক দলের কাম্য হয় না। রাজনৈতিক দলগুলি পক্ষান্তরে নিজ নিজ বিরোধীদের বিনষ্ট করার কাজে আত্মনিয়োগ করে। এর ফলে সমাজে চিরকালই সংঘর্ষের অবকাশ রয়ে যায়।

নির্বাচন ও সর্বোদয়ের ভূমিকা সম্বন্ধীয় এই মূলগত সত্য ঘোষণা করার পর এ বিষয়ে বাস্তব দৃষ্টি থেকেও বিচার করা উচিত। কারণ আমরা চাই বা না চাই, আগামী বহু বৎসর ধরে সংসদীয় নির্বাচন সমূহ জনমতকে যথেষ্ট মাত্রায় প্রভাবিত করবে এবং এ বিষয়ে সর্বোদয়ের ভূমিকা কি হবে তা স্থির করতে না পারলে সর্বোদয় আদর্শের কেবল তত্ত্বীয় গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থেকে যাবার আশঙ্কা আছে। আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, আদর্শ গণতন্ত্রের দৃষ্টিকোণ

থেকে বিচার করলে বর্তমানের নির্বাচন-পদ্ধতি নিতান্ত অপূর্ণ প্রতীয়মান হবে। কারণ যাঁরা জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হন প্রথমতঃ তাঁদের কোন রাজনৈতিক দলের মনোনয়ন লাভ করতে হয়। রাজনৈতিক দল কোন অবস্থাতেই সমগ্র জনসাধারণের প্রতিনিধি হতে পারে না। আর সংসদীয় নির্বাচনের প্রার্থী-মনোনয়ন কার্যের আসল দায়িত্ব থাকে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের পার্লামেন্টারী বোর্ড অর্থাৎ ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠীর হাতে। অর্থাৎ মুষ্টিমেয় ব্যক্তিদের দ্বারা মনোনীত প্রার্থী ভোটারদের ভোট প্রার্থী হন। ভোটযুদ্ধে যদি তিন জন প্রার্থী থাকেন তাহলে মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৩৪ ভাগ মাত্র কোন এক জন প্রার্থী পেলেই তিনি ওই নির্বাচনী ক্ষেত্রের প্রতিনিধি বলে স্বীকৃত হবেন। যেহেতু সব ভোটদাতা ভোট দেন না সেই জন্য সেই ক্ষেত্রের পঁচিশ থেকে ত্রিশ ভাগ ভোটারের দ্বারা নির্বাচিত ব্যক্তিই জনপ্রতিনিধির সম্মান লাভ করতে পারেন। অর্থাৎ সংসদীয় নির্বাচনপ্রথার যে প্রধান দাবি—অধিকাংশের মতানুসারে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শাসনব্যবস্থা—এর কোন বাস্তব আধার নেই। পূর্বোক্ত বক্তব্য যে কোন কাল্পনিক স্থিতির বর্ণন নয় এর প্রমাণ পাওয়া যাবে বিগত সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে। ১৯৫৭ সনের নির্বাচনে নিম্নলিখিত রাজ্যগুলিতে সংখ্যালঘুদের সরকার গঠিত হয়—বিহার (কংগ্রেস ৪৪·৭%), বোম্বাই (কংগ্রেস ৪৮·৬৬%), কেরল (কমিউনিস্ট ৩৭·৪৮%), মাদ্রাজ (কংগ্রেস ৪৬·৫২%), উড়িষ্যা (কংগ্রেস ৪০·০১%), উত্তর প্রদেশ (কংগ্রেস ৪৬·২৯%), পশ্চিমবঙ্গ (কংগ্রেস ৪৯·২০%)। ১৯৬৭ সনের নির্বাচনেও এরকম বহু সংখ্যালঘুদের সরকারের নিদর্শন আছে। কেবল ভারতবর্ষই নয়, পৃথিবীর যে সমস্ত দেশে বহুদলভিত্তিক সংসদীয় গণতন্ত্র চলে সেখানে এই রকম অবস্থা পরিদৃষ্ট হয়।

অতএব এ কথা যদিও স্পষ্ট যে সংসদীয় কার্যকলাপের দ্বারা সর্বোদয় সমাজ মূর্ত হবে না এবং সর্বোদয় সমাজ প্রতিষ্ঠাকামী স্বয়ং কোন রকম সংসদীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবেন না, তবুও জনজীবনে নির্বাচনের গুরুত্বের কথা স্মরণ রেখে সর্বোদয় সমাজ প্রতিষ্ঠাকামী একে যথাসম্ভব নিজ আদর্শের পরিপূর্তির কাজে লাগাবার প্রয়াস করবেন। আদর্শ গণতন্ত্রের বিকাশ ও রাজনৈতিক দল-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র জনশক্তির সংগঠনের জন্য সর্বোদয়কর্মীরা জন-

সাধারণ দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নিজ প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করবেন। প্রতি এলাকার ভোটারদের সংগঠিত করে যুগোশ্লাভিয়ার ধরনে ভোটারদের সমিতি গঠন করা হবে। একটি নির্বাচন ক্ষেত্রের বিভিন্ন এলাকার এই সব ভোটারদের প্রতিনিধিরা মিলে নিজেদের ভিতর থেকে এক বা একাধিক প্রার্থী মনোনয়ন করতে পারেন। শতকরা ত্রিশ চল্লিশ বা ওই রকম ভোট যে সব প্রার্থী প্রাথমিক নির্বাচনে পাবেন, তাঁরা সবাই সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। ভোটাররা স্বয়ং যদি এইভাবে প্রার্থী মনোনয়ন করতে পারেন তা হলে নির্বূঢ় স্বাধীনতার পথের অন্যতম বাধা অর্থাৎ রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বের প্রয়োজন থাকবে না।

গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে লোকসভা পর্যন্ত যদি এইভাবে জনসাধারণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করানো যায় তা হলে যে জনশক্তির উদ্গম ও বিকাশ হবে তার সহায়তায় অর্থব্যবস্থা থেকে আরম্ভ করে দেশরক্ষা পর্যন্ত সর্ব ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে মধ্যবর্তী ব্যবস্থাপক শ্রেণীব চালিত যাবতীয় ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা খর্ব করা সম্ভব হবে। আর ব্যবস্থাপক শ্রেণী কর্তৃক সঞ্চালিত বিধিব্যবস্থার পরিবর্তে প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণ দ্বারা চালিত ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে না পারলে শাসনমুক্ত সমাজ বা আদর্শ গণতন্ত্র কোনদিনই সাকার হতে পারবে না।

লোককল্যাণের জন্য যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে মহাপ্রাণ ব্যক্তিরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে গেছেন। এক যুগের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে অপর যুগের মনীষী এগিয়ে চলেছেন। এ যাত্রার শেষ হয় নি, কোনদিন হবেও না। একজন যেখানে শেষ করে যান, অপরজন সেখান থেকে শুরু করেন। একজনের ভুল ত্রুটি এবং অপূর্ণতা থেকে উত্তরকালে অপর একজন শিক্ষা গ্রহণ করে মানবহিতের নূতন পথ আবিষ্কার করেন। তাই সমাজ-বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের পথে এক যুগের কোন এক মনীষীর কথাকে বা তাঁর পুঁথিকে শেষ কথা মনে করা নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক এবং গোঁড়ামিপ্রসূত দৃষ্টিকোণ। এই-জাতের মনোভাবের সঙ্গে মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতার কোনরূপ গুণগত পার্থক্য নেই। ভারত তথা বিশ্বের সম্মুখে আজ হিংসা এবং তার অন্যতম বাহ্যরূপ—অসাম্যের যে জ্বলন্ত সমস্যা বিদ্যমান, গান্ধীশিষ্য বিনোবা তাঁর গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে

তার এক যুগোপযোগী সমাধানসূত্র দেবার প্রয়াস করছেন। আমরা যেন বিষয়মুখ দৃষ্টিকোণ থেকে এর অন্তর্নিহিত বৈপ্লবিক সম্ভাবনাকে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করি। নচেৎ ১৯৫৩ সনের চাণ্ডিল সর্বোদয় সম্মেলনে শ্রদ্ধেয় জয়প্রকাশ নারায়ণ যা বলেছিলেন, তা-ই হবে। তাঁর মতে, "আমরা 'বিপ্লব চাই, বিপ্লব চাই' বলে চিৎকার করছি ; কিন্তু বিপ্লব যে আমাদের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে তা লক্ষ্য করছি না।"

৫

গ্রামদানী গ্রামের নির্মাণ বা পুনর্গঠন কার্য সম্বন্ধে একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে এ প্রসঙ্গের ইতি করা হবে। পূর্বেই আমরা দেখেছি যে, সর্বোদয় আদর্শ অনুযায়ী শাসনমুক্ত সমাজ গঠন করাই গ্রামদানের লক্ষ্য। আমরা এও বুঝতে পেরেছি, বর্তমানে উপরের হুকুমে অর্থাৎ শাসনবলে যে সমাজ-ব্যবস্থা চলে তার পরিবর্তে স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতা আধারিত সমাজ-ব্যবস্থা স্থাপিত হলেই শাসনমুক্ত সমাজের এই আদর্শে উপনীত হওয়া সম্ভব। এখন বিচার করতে হবে যে স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতার এই লক্ষ্যকে গ্রামদানী গ্রামে কার্যকর করার উপায় কি ?

অন্যান্য গ্রামের তুলনায় গ্রামদানী গ্রামসমূহে শুরু থেকেই একট অনুকূল ভূমি প্রস্তুত থাকে। গ্রামের সবাই দুঃখ ও সুখ সমানভাবে বণ্টন করে নিতে রাজী হয় বলেই গ্রাম দান করে এবং গ্রামদানের পর পরিবারের প্রয়োজনীয়তা ও কৃষি করার ক্ষমতার কথা বিচার করে জমির পুনর্বণ্টন হয়। অর্থাৎ গোড়াতে আর সকলের প্রতি সহযোগিতার যে বৃত্তি থাকে জমির সমবণ্টন ও তার ফলে সৃষ্ট আর্থিক সাম্য ওই সহযোগিতার ভাবকে আরও বাড়ায়। সুতরাং সব দিক থেকে দেখতে গেলে গ্রামদানী গ্রামে একটা সাধারণ স্বার্থ (common interest) গড়ে ওঠে। এর আধারে গ্রামসেবার দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মীর পক্ষে গ্রামবাসীদের এ কথা বোঝানো সহজ হয় যে, গ্রামদানী গ্রামে অতঃপর প্রত্যেকের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসগৃহ—মানুষের ভৌতিক প্রয়োজনীয়তার এই পাঁচটি অঙ্গ গ্রামেরই যৌথ দায়িত্ব। অর্থাৎ গ্রামে যাতে কেউ অন্নবস্ত্রহীন না থাকে, সকলের যাতে শিক্ষার ব্যবস্থা ও

সাধ্যমত চিকিৎসার বন্দোবস্ত হয় এবং সবার যাতে মাথা গুঁজবার জন্য একটি আশ্রয়স্থল হয়, তার দায়িত্ব গ্রামস্থ গ্রামসভার। সুতরাং এর পর গ্রামসভাকে চিন্তা করতে হয় যে কিভাবে এই দায়িত্ব পালন করা যায়।

স্বভাবতই গ্রামসভা এর জন্য সর্বপ্রথম গ্রামের সঙ্গতি বা সংস্থানের হিসাব নেয়। গ্রামে কতটা জমি এবং তাতে কি কি শস্য উৎপন্ন হতে পারে এবং কোন্ উপায়ে বেকার গ্রামবাসীদের কাজ দেবার জন্য ও গ্রামবাসীদের জন্য অধিক পরিমাণে খাদ্যের সংস্থান করার উদ্দেশ্যে জমির ফসল বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এইসব গ্রামসভাকে খতিয়ে দেখতে হয় যে-ক্ষেতে একটি মাত্র ফসল হয় সেখানে কমপক্ষে তিনটি ফসল করে বাড়তি লোকদের কাজ দেবার উপায় কি? এর জন্য সেচ বীজ ও সারের ব্যবস্থা করতে হলে কি কি আনুষঙ্গিক প্রস্তুতি চাই ইত্যাদি গ্রামের সকলের চিন্তনীয় বিষয় হয়। তারপর খাদ্যশস্য ছাড়া কুটিরশিল্পের উপযোগী কি কি কাঁচা মাল (যথা কার্পাস, তৈলবীজ ইত্যাদি) গ্রামে উৎপন্ন হতে পারে এবং ওই সব কাঁচা মালকে পাকা মালে রূপান্তরিত করার কাজে কতজনকে নিযুক্ত করা যেতে পারে—এরও হিসাব-নিকাশ করতে হয়। অর্থাৎ এইভাবে গ্রামের সংস্থান ও মনুষ্যশক্তির (man-power) আধারে একটা সামগ্রিক পরিকল্পনা রচনা করতে হয় যার লক্ষ্য হয় গ্রামের প্রত্যেককে কাজ দিয়ে তাদের পঞ্চবিধ মৌলিক প্রয়োজনীয়তার পরিপূর্তির ব্যবস্থা করে দেওয়া।

এমনও হতে পারে যে কোন গ্রামদানী গ্রামে লব্ধ সঙ্গতি বা সংস্থান গ্রামের সমস্যা সমাধানের পক্ষে যথেষ্ট নয়। আর নিত্যকার চাহিদা পরিপূর্তি করার পর গ্রামবাসীদের পক্ষে এতটা শ্রমদান করা সম্ভব হয় না যার দ্বারা গ্রামোন্নয়নের জন্য প্রাথমিক পুঁজির প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ হতে পারে। এরকম অবস্থায় বাইরের সাহায্য নেওয়া অন্যায় নয়। এই সাহায্য সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণকর বিভাগ, খাদি গ্রামোদ্যোগ কমিশন বা গান্ধী নিধি ইত্যাদির মত জনহিতকারী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে নেওয়া যেতে পারে। গ্রামে সমবায় সমিতি গঠন করতে পারলে সরকারের কাছ থেকে গ্রামবাসীদের দ্বারা সংগৃহীত পুঁজির অনুপাতে সহায়তা পাওয়া যায়। গ্রামে খাদ্যশস্য মজুত করার জন্য বা কুটিরশিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহ করার জন্য

অথবা কৃষি করার সময় কৃষিঋণ ইত্যাদি দেবার জন্য এই সমবায় সমিতির অর্থকে কাজে লাগানো যেতে পারে। তবে এই সব বাইরের সাহায্য যথাসম্ভব ঋণের আকারে নেওয়াই শ্রেয়। কারণ একবার ফিরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব বিমুক্ত দান নেবার অভ্যাস গ্রামবাসীদের মধ্যে শিকড় গাড়লে তারা নিজেদের পরিশ্রমে ও উত্তমে নিজেদের উন্নতি করার প্রচেষ্টায় জলাঞ্জলি দিয়ে সরকার ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াবে। গ্রামবাসীদের আত্মসম্মান বিনষ্টকারী এই পদ্ধতি শাসনমুক্ত সমাজের লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত কর্মীদের গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এইভাবে কর্মী গ্রামবাসীদের আভাসে ইঙ্গিতেও এমন প্রতিশ্রুতি দেবেন না যে তিনি বা তাঁর প্রতিষ্ঠান গ্রামবাসীদের সকল সমস্যার সমাধান করে দেবেন। যাবতীয় কাজের উদ্যোগ-আয়োজন ও ব্যবস্থা গ্রামবাসীদেরই করতে হবে; কর্মী কেবল তাঁদের প্রয়োজনমত বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে বা অন্যভাবে সাহায্য করবেন যাতে হতোদ্যম হয়ে তাঁরা বসে না পড়েন।

পূর্বোক্ত প্রকারে গ্রামীণ পরিকল্পনা রচিত হলে স্বভাবতই গ্রামের কৃষি ও কুটিরশিল্পের পক্ষে ঘাতক অর্থাৎ গ্রামবাসীদের বেকার করে দেবার উপায়—কলে ছাঁটা চাল, কলে পেষা আটা, কলের তেল, কলের চিনি ইত্যাদি এবং মিলের কাপড় গ্রামে আমদানী করা বন্ধ করার প্রয়োজনীয়তা গ্রামসভা অর্থাৎ গ্রামের প্রতিটি অধিবাসী বুঝতে পারবে। তখন দাম অল্প একটু বেশী হলেও গ্রামের প্রতিটি ভাইকে কাজ দেবার জন্য তারা ঢেঁকি-ছাঁটা চাল, ঘানীর তেল বা খদ্দর ব্যবহার করবে। অল্প একটু সস্তার মোহে সংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদনে নিযুক্ত গ্রামের ভাইগুলিকে কর্মচ্যুত করে তাদের গ্রামসমাজের পক্ষে বোঝা স্বরূপ করে তুলবে না। গ্রামদানী গ্রামে তাই একদিকে গ্রামবাসীরা যেমন গ্রামসংকল্পের ব্রত গ্রহণ করে গ্রামেরই পণ্য ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, তেমনি ওই সব ক্ষেত্রে মিলের জিনিস বহিষ্কার করে গ্রামে তার আমদানী নিষিদ্ধ করে দিয়ে গ্রামের কারিগরদের অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতার হাত থেকে বাঁচাবে।

এই প্রসঙ্গে গ্রামদানী গ্রামে বিদ্যুৎ বা অপরাপর যন্ত্রশক্তির স্থান সম্বন্ধে আলোচনা করা অনুচিত হবে না। ভারতের গ্রামগুলির বর্তমান দীন দরিদ্র

হতশ্রী অবস্থা কারও কাম্য নয়। মানুষের বেঁচে থাকার একটা ন্যূনতম ব্যবস্থা করার জন্য এবং পূর্বোক্ত পঞ্চবিধ প্রয়োজনের পরিপূর্তির জন্য যদি দেখা যায় যে, গ্রামের মনুষ্যশক্তি ও পশুশক্তি ইত্যাদিকে পূর্ণ মাত্রায় নিয়োগ করেও কাজ হচ্ছে না তবে অপর যে কোন শক্তির সহায়তা নেওয়া যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে কেবল এইটুকু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যে এমন কোন শক্তির উপর ভরসা করা উচিত হবে না যার আধার অপরের শোষণ এবং যার উৎস কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষেব হাতে থাকায় পাকে-প্রকারে গ্রামের শিল্প-ব্যবসায় শক্তির উৎস নিয়ন্ত্রণকারী কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের করায়ত্ত হয়ে যায়, অর্থাৎ গ্রামবাসীর নিব্যূঢ় স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়। যন্ত্র সম্বন্ধেও এই একই কথা প্রযোজ্য। অপর কাউকে বেকার করে না বা গ্রামবাসীদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় না এমন প্রতিটি যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে গ্রামদানী গ্রামের অধিবাসীদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন করা যেতে পারে। গান্ধীজী যন্ত্রবিরোধী ছিলেন না। তা হলে তো চরখাই একটি যন্ত্র বলে তা বর্জন করতে হয়। গান্ধীজী ছিলেন যন্ত্রের বিবেকবিহীন প্রয়োগের বিরোধী।

গ্রামদানী গ্রামে পল্লী-পুনর্গঠনের কোন্ কর্মসূচীটি প্রথমে হাতে নেওয়া হবে বা কার উপর সবচেয়ে বেশী জোর দেওয়া হবে—এটা পূর্বেই কেউ বলে দিতে পারে না। গ্রামের পরিস্থিতি, গ্রামবাসীর প্রয়োজনীয়তা ও প্রস্তুতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হওয়াই স্বাভাবিক। তাই কর্মসূচীও ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। কর্মীকে খালি এইদিকে খেয়াল রাখতে হবে যে, যে কর্মসূচীই গ্রামবাসী গ্রহণ করুন না কেন, তাকে গ্রামস্বরাজ-অভিমুখী করতে হবে। অর্থাৎ সকল কর্মের ভিতর দিয়েই গ্রামবাসীদের স্বাধীন প্রেরণা ও সংগঠনী শক্তির বিকাশ হয়ে তারা যেন বর্তমানের সরকার নিরপেক্ষ সমাজ গঠনের অভিমুখে ধীরে হলেও সুনিশ্চিত গতিতে অগ্রসর হন।

যে কোন গ্রামেই আজ গ্রামসেবার উদ্দেশ্যে কর্মরত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পারস্পরিক সংযোগ ও সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা পূর্বের তুলনায় অধিক মাত্রায় দেখা দিয়েছে। গ্রামদানী গ্রামের বিশেষ প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব উল্লেখ করাই বাহুল্য। স্বাধীনতার পূর্বে প্রধানতঃ গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত কর্মী ও প্রতিষ্ঠান গ্রামে কাজ করতেন। এছাড়া

অন্যাধিক স্থানীয় প্রতিষ্ঠানও কোন কোন ক্ষেত্রে কর্মরত ছিল। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণকারী বিভাগ, সমাজ কল্যাণ বিভাগ, কমিউনিটি প্রজেক্ট এবং ন্যাশনাল এক্সটেনশান ব্লক ইত্যাদির কর্মী গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছেন। সরকার বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সকলের অর্থই জনসাধারণের, এবং দরিদ্র দেশের একটি পয়সারও যাতে অপব্যয় না হয় তার জন্য বর্তমানে গ্রামদানী গ্রামগুলিতে এই পারস্পরিক সংযোগ ও সহযোগিতার বিশেষ প্রয়োজন পড়েছে। একই কাজের পিছনে একাধিক প্রতিষ্ঠান যাতে অর্থ ও উদ্যম ব্যয় না করেন এবং একটি গ্রামে কর্মরত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা যাতে পরস্পরের পূরক হয় তাই সকলের কাম্য হওয়া উচিত। নচেৎ সেবা করার অবাঞ্ছিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গ্রামের লোককে অনেক সময় লোভী করে তোলা হয় ও এইভাবে তাদের ভিতর থেকে স্বাবলম্বনের বৃত্তি নষ্ট হয়ে যায়। সৌভাগ্যক্রমে ইদানিং কমিউনিটি প্রজেক্ট ইত্যাদি সরকারী বিভাগের কর্তৃপক্ষ বহু অর্থব্যয় সত্ত্বেও তাঁদের কাজে গ্রামবাসীদের উৎসাহ জাগাতে পারেন নি এ কথা বুঝে গ্রামদানের জনশক্তি জাগ্রত করার পন্থাকে তাঁদের লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু গ্রামীণ স্তরের সব কর্মীই যে জনশক্তি জাগানোর কথা যথোচিতভাবে বুঝতে পেরে তদনুযায়ী আচরণ করছেন—এর নিশ্চয়তা নেই। সুতরাং গ্রামদানী গ্রামের গ্রামসেবককেই এ ব্যাপারে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে ও সেবা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গ্রাম যাতে নষ্ট হয়ে না যায় তার দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

পরিশিষ্ট—ঘ

সহায়ক পুস্তকের তালিকা

গীতার গান্ধীভাষ্য : মো. ক. গান্ধী (অনুঃ) সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত

বাঁশের চরখা ,, ,,

ভারতমে গায় (২ খণ্ড) ,, ,,

হিন্দ স্বরাজ্য : মো. ক. গান্ধী (অনুঃ) ,, ,,

শিক্ষা ও সেবা ,, ,,

স্বাস্থ্যরক্ষা : মো. ক. গান্ধী (অনুঃ) ,, ,,

আধুনিক কারবারী হিসাব ,, ,,

গৃহ ও গ্রাম্য চিকিৎসা (৪ খণ্ড) ,, ,,

মৌমাছি পালন ,, ,,

আমার ধ্যানের ভারত মো. ক. গান্ধী (অনুঃ) শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ছাত্রদের প্রতি ,, (অনুঃ) ,, ,,

শিক্ষা ,, (অনুঃ) ,, ,,

সর্বোদয় ও শাসনমুক্ত সমাজ ,, ,,

বুনিয়াদী শিক্ষার কথা (২ খণ্ড) অনিলমোহন গুপ্ত

নঈ তালিম ধীরেন্দ্র মজুমদার (অনুঃ) বিমলচন্দ্র পাল

স্বাধীনতার সংকট ,, ,, (অনুঃ) শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বরাজের আসল লড়াই ,, ,, (অনুঃ) ,, ,,

অহিংস সমাজবাদের পথে : মো. ক. গান্ধী (অনুঃ) ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

গান্ধীজীর অর্থনৈতিক দর্শন রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মহাত্মাজীর গঠনকর্ম-পদ্ধতি স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধুত

পঞ্চায়েত রাজ : মো. ক. গান্ধী (অনুঃ) সাধনা সোম

গ্রামে ও পথে রতনমণি চট্টোপাধ্যায়

যাত্রার পথে		চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী
ভূদানযজ্ঞ কি ও কেন		” ”
গ্রামদান কি ও কেন		” ”
আমাদের জাতীয় শিক্ষা		” ”
গ্রামে গ্রামে স্বরাজ : বিনোবা	(অনুঃ)	নিরুপমা দেবী
শিক্ষা বিচার ”	(অনুঃ)	রণেন্দ্রকুমার দাস
গীতা প্রবচন ”	(অনুঃ)	বীরেন্দ্রনাথ গুহ
আত্মকথা : মো. ক. গান্ধী	(অনুঃ)	” ”

———